আত্মকথার প্রকাশ-পরিচয়

ছয় মাসকাল মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভাবাসে থাকিয়া নানা বাধা-বিঘ্ন এবং প্রতিকূল অবস্থার অন্তে আজ 'দাসের আত্মকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। তাহাতে দাসের হৃদয় যে-প্রকার আনন্দিত হইয়াছে,—যাঁহাদের জন্য এই অক্লান্ত প্রয়াস—দাসের বন্ধুগণও কি আজ তদুপযুক্ত আনন্দিত হইবেন না?

"কুশদহ" মাসিকপত্র বন্ধ হইলে, "দাসের আত্মকথা"—যাহা ধারাবাহিকরূপে কুশদহে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত দেখিতে যাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ বিধাতার ইচ্ছায় যথাসময়ে তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল—এ-জন্য তাঁহারাও কি আনন্দিত হইবেন না?

"কুশদহ" পত্রিকা সম্পাদন হইতে দাসের আত্ম-কথা গ্রন্থ প্রণয়ণ পর্য্যন্ত যিনি দাসের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নাম বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী। আজ এখানে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই বন্ধুর উপকার স্বীকার করিয়া আত্মকথার পাঠক-পাঠিকা-গণের নিকট তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। ফলত ইনি যেন বিধাতা কর্ত্তৃক 'প্রেরিত' হইয়া যথাসময়ে কুশদহ-সম্পাদকের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ

হইয়াছিলেন। লেখক-লেখিকা সংগ্রহ, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে যথেষ্টই আনুকূল্য করিয়াছেন। এমন-কি কুশদহ-সমিতির প্রকাশ দেখিয়াও আনন্দ-উৎসাহে সমিতির অধিকাংশ অধিবেশন-সভায় এবং সাম্বৎসরিক উৎসবেও যোগ দিয়াছিলেন।

দাসের আত্মকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখিবার জন্য উৎসুখনেত্রে আশাপথ চাহিয়া তাঁহার মতো আর কেহ ছিলেন কি না জানি না। তাই আজ তাঁহার এতাধিক আনন্দ দেখা যাইতেছে। আত্মকথারও প্রুফ সংশোধন, সাজ-সজ্জা-সমাবেশাদি সকলবিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্যই গ্রন্থখানি এরূপ শোভন সুন্দরাকারে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল।

বিপিনবাবুর জীবন এরূপ বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ যে তাহা যথোচিতভাবে অঙ্কিত করিতে হইলে তদুপযুক্ত পরিসরের প্রয়োজন, কিন্তু এখানে স্থানাভাবে অগত্যা অতি সংক্ষেপেই কিছু বলিতে হইল।

জেলা খুলনার অন্তর্গত লখ্‌পুর গ্রামে ১২৮৭ সালের ৩০শে আষাঢ় মঙ্গলবার এক বর্দ্ধিষ্ণু অভিজাত ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সীতানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন গর্ভস্থ, তখন বিপিন-বাবুর পিতামহী ঠাকুরাণী বিধবা হইয়া শ্বশুরালয়

তিলকগ্রাম হইতে পিত্রালয় লখ্‌পুরে গমন করেন, এবং সেখানেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভূমিষ্ট হন। সেইসময় হইতে তাঁহারা লখ্‌পুরেই বাস করেন।

সীতানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আকৈশোর সংসার-বিরাগী উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন। বিপিন-বাবু দুইবৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া পিতা-মহীর ক্রোড়ে পুত্রাধিক স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

প্রথমে তিনি লখ্‌পুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন, এবং তথা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উচ্চ বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তাঁহার মাতুলালয়ে থাকিয়া, শুধু ইংরাজী ভাষায় রাংদিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুল হইতে মাইনার পরীক্ষায় খুল্‌না জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও উচ্চ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, বরিশাল বি-এম কলেজে এফ-এ পড়েন। এই পরীক্ষার সময় দুই দিন মাত্র পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় দিনে হঠাৎ তিনি মস্তকে এরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন যাহাতে আর তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না। সেই হইতে তিনি অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও পড়া ছাড়িয়া দিয়া দেশহিতৈষণা নৈতিক চরিত্র গঠন এবং

সাহিত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রয়াসী হন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র।

কিছুদিন পরে খুলনায় আসিয়া কয়েকটি সহযোগী বন্ধু পাইলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ-ভাবে [illegible] বৎসরাবধি কার্য্য করেন। তারপর তিলকগ্রামে দুইটি পুরাতন পাঠশালাকে একত্র করিয়া একটি এম-ই স্কুলে পরিণত করেন। এবং চার পাঁচ বৎসরকাল তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বিপিনবাবুর প্রথমে ইচ্ছা ছিল, বিবাহ না করিয়া সমস্ত জীবন দেশ-সেবায় অর্পণ করিবেন। কিন্তু কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁহার কিছুদিন পর্য্যন্ত তর্কযুদ্ধ চলিয়া শেষে তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটে।

বিপিনবাবুর বন্ধুদিগের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গ একজন ছিলেন; তাঁহার নাম বাবু ধরণীধর বসু। শেষে তিনিই প্রধান উদ্‌যোগী এবং যত্নবান হইয়া বিপিনবাবুর বিবাহের একটি সম্বন্ধ স্থির করেন। পাত্রী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈবাহিক মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রের বয়স্কা শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা। ফলত এখানে বিধাতার

আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধতা স্বীকার করিতে হইবে যে, শেষে এই সম্বন্ধ সত্বরই স্থিরীকৃত হইয়া ১৩১২ সালের ২৬শে শ্রাবণ বিপিনবাবুর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের মধ্যে তাঁহার আত্মীয়গণ কলিকাতায় আসিয়া অনুষ্ঠান অন্তে তাঁহারা বর-বধূ লইয়া দেশে গিয়াছিলেন।

তারপর দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য দেশ ছাড়িয়া বিপিনবাবু একপ্রকার কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। এখানে কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে সাহিত্যিকদলেও পরিচিত হন এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মবন্ধুগণের এবং অনেক ব্রাহ্ম পরিবারেরও স্নেহ-প্রীতিভাজন হইয়াছেন। বস্তুত বিপিনবাবুর মিষ্ট নম্রতার জন্য অনেক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি একসঙ্গে অধিক কথা কহিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাঁহার শান্ত-মধুর প্রকৃতি অল্পের মধ্যে অনেক-কিছু জানাইয়া দেয়।

প্রথম অবস্থায় তিনি কলিকাতা সহরে কিছুদিন নিষ্কর্ম্মা লোকের ন্যায় যদৃচ্ছাভাবে কাল কাটাইয়া তারপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক প্রবীণ প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং যত্নে বিখ্যাত ইউ, রায়ের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করেন।

এইসময়ের কিছু পূর্ব্বে দাসের সহিত তাঁহার আলাপ

হয়। তারপর "কুশদহ" পত্রিকার প্রতি তাঁহার যে কোন্ সূত্রে দৃষ্টি পড়ে তাহা বিধাতাই জানেন। ক্রমে তিনি দাসকে "দাদা" এবং তাঁহার গৃহিণীকে "বৌ-দিদি" বলিয়া অচিরাৎ সোদর-প্রতিম হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিপিনবাবুর পিতা ভক্তিভাজন সীতানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংসার-বিরাগী উদাসীন ব্যক্তি ছিলেন। তথাপি পুত্র-পুত্রবধূর প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না। তবে তিনি সাংসারিক কোনো বিষয়ে অধিক ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেন না। আমি তাঁহাকে কলিকাতায় বিপিনবাবুর শ্বশুরালয়ে দুইবার দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। কাশীধামে দেহত্যাগ করিতে চিরদিন তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভগবান তাঁহার সে কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কিছুদিন কাশীতে বাস করিয়া প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে ১৩১৯ সালে তিনি তথায় দেহত্যাগ করেন।

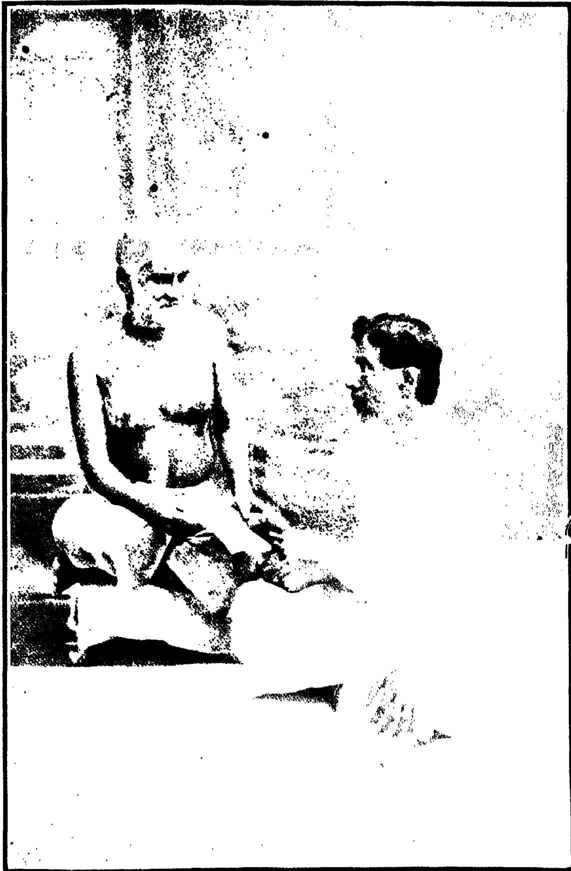
কলিকাতা
২১০।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
২৪শে আষাঢ় ১৩৩৬।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু



সূচী

চিত্রসূচী

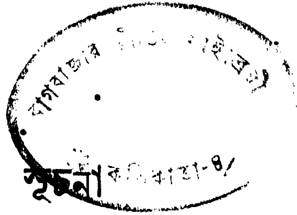


"ভাবের ভাবুক পথের পথিক সেই তো আপনার"

প্রকাশকের হস্তে গ্রন্থ সমর্পণ

Block by the I. P. E. Co.,
Calcutta

Photoby Mr. N. Ghosh,
June, 1929.



সূচনা

"দাসের কিছু নাহি বাঞ্ছা আর।
প্রভুর প্রেমানন, প্রসন্ন বদন, করে প্রাণে নবজীবন সঞ্চার।
হইল কৃতার্থ ওহে দীননাথ, এ পাপ জীবন. সেবি তব পদ
নাহি প্রয়োজন, অন্য কোনো ধন, চির দাসত্বই আমার প্রচুর পুরস্কার।
হরি বোল বোলে ও চরণতলে, তনুত্যাগ যেন হয় অন্তিমকালে,
এই হে মিনতি, ওহে বিশ্বপতি, "বেশ হ'য়েছে" মুখে বোলো একটিবার।"

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

"দাস" আখ্যা কেন প্রথমে গৃহীত হইল তাহা বলা আবশ্যক। যে বিশ্বাস আত্ম-কথার মূলে, ইহাও সেই বিশ্বাসের কথা। এ মলিন জীবনের অবসানে ধর্ম্ম-বিশ্বাস পাইয়া, সেই ধর্ম্ম প্রচার করিবার অহেতুকী প্রবৃত্তি এবং শক্তি প্রথমে নিজ স্বভাবের মধ্যেই পাইলাম। নিজ জন্মভূমি দেশের নিকট নবযুগ-ধর্ম্ম-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া—সেই সাধন-পথেই পরিত্রাণ লাভ হইবে এই বিশ্বাস এবং "আজীবন দাসত্ব-ব্রত" গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলাম, সাধন অবস্থার প্রথমেই। বাহিরে শক্তি, অন্তরে বিশ্বাস—দুয়ের মিলন হইল। এ বিশ্বাসের বল অজেয় হইল আরো অনেক পরে—যখন শত পরীক্ষায়ও এ বিশ্বাস টলিল না। আর যখন "কুশদহ" পত্রিকা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদিষ্ট হইলাম তখন। 'সাদার উপর কালী দিয়া' "সম্পাদক" নাম লিখিতে হাত যেন কাঁপিল। "জন্মভূমির দাস" প্রাণের এই গভীর বিশ্বাস লিখিয়া দিয়া—আমিত্ব-স্বামীত্ব হইতে মুক্ত হইলাম।

ধর্ম্মবার্ত্তা ঘোষণার মূল, নর-নারীর আত্মার সেবা করা। দাসকে দাসের আদর্শে গঠিত হইতেই হইবে। দেশবাসী বন্ধুগণ দাসের কার্য্যে—ভগবানের পথে—মুক্তি-সাধন-পথের সহায় হইয়া দাসের সেবা গ্রহণ করুন।

কেন দাসের আত্ম-কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম? এ-জীবনের প্রধান একটি কথা—যেটি ভগবানের নিকট হইতে পাওয়া তাহা সরলভাবে লিখিত একটি প্রণালী-বদ্ধরূপে আমার স্বদেশবাসী আত্মীয়-স্বজন প্রিয় বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছা যখন অনুভব করিলাম, অন্য-দিকে মনে হইল, আমি কি আমিত্ব-প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেছি? নিজ জীবন-কথা নিজে বলা, এ কি প্রবৃত্তি! তারপর, যখন ভগবানের মহিমা-গৌরব প্রচারের উদ্দেশ্যেই বলিতেছি মনে হইল, তখনো সন্দেহ আসিয়াছে, কি জানি, ভগবানের মহিমার কথা বলিতে বলিতে তাহার মধ্যে যদি আত্ম-গৌরব প্রচারের ভাব আসিয়া পড়ে। এইভাবে অনেক দিন চলিয়া গেল। কিন্তু প্রসঙ্গ-ক্রমে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সে কথা এই রসনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

বাংলা ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে সপরিবারে সহর ছাড়িয়া বরাহনগর-নিয়োগীপাড়া শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খালি বাড়িতে গিয়া বাস করি। মাসাধিক কাল নির্জ্জন-বাসের পর ঐ কথাটি আবার মনে এমন প্রবলভাবে উপস্থিত হইল যে, অতি সহজে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর ঐ লেখাটা "বিশ্বাস-সূত্র" নামে একফর্ম্মা পাঁচ শত কপী পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া স্বদেশবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করি।

এ জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে "বিশ্বাস-সূত্রে" নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে যে কয়টি মূল কথা বলা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া দেশের দুই একটি বন্ধু সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই ঘটনা

হইতেই "কুশদহ" মাসিকপত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা এবং শক্তি পাইলাম, "কুশদহ" বাহির করা সহজেই ঠিক হইয়া গেল। তাই নিঃসঙ্কোচে বলিয়া অসিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছাতে এই পত্রের প্রচার আরম্ভ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের "কুশদহ"তে "হিমালয়-ভ্রমণ" এবং "প্রত্যাবর্ত্তন" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও "আত্মকথা" কুশদহে ধারাবাহিক প্রকাশ-ইচ্ছা উদয় হইয়াছিল। তথাপি ঐ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ও প্রতীক্ষা করিয়াছি,—ইহা ভগবানের ঠিক অভিপ্রেত কার্য্য কি না।

তারপর অন্তরে বাণী হইল,—"আর কেন? সময় চলিয়া যাইতেছে, জীবনের প্রধান কথা মুক্তকণ্ঠে স্বদেশের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া একটি দায়ীত্বমুক্ত হইয়া থাকো—এখন হইতেই তাহা বলিয়া যাও।"

সত্য কখনই ব্যর্থ হয় না—হইবেও না, সত্য জয়যুক্ত হইবেই। এখন নিজজীবনের কথা যাহা বলিব তাহা হয় তো তেমন সুস্পষ্ট হইবে না যাহা ভবিষ্যতে অন্যে অনুভব করিবেন। তথাপি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম। যদি সত্যই অনুভব না করিতাম, কখনই তাহা বলিতে সাহসী হইতাম না।

দাসের আত্ম-কথার মধ্যে একটি প্রধান কথা 'বিবেকবাণী' —বিবেকের ভিতর দিয়া ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা বলেন —মানুষ ঈশ্বর-বাণী শুনিতে পায়; ঈশ্বর-বাণী শুনিয়াই আমার মলিন জীবনের পরিবর্ত্তন হইল। ইহার পূর্ব্বে আমি জানিতাম

না যে, স্বর্গের ঈশ্বর নরকের জীবের সঙ্গে কথা বলেন। দুই একজন বিশেষ লোকের সঙ্গেই যে বিশেষ সময় তিনি কথা বলেন তাহা নহে, সকলের সঙ্গেই বলেন—সর্ব্বদাই বলিতেছেন। সাধারণে তাহাকে বুদ্ধির ক্রিয়া মনে করে, কিন্তু সে বাণী যিনি শোনেন—যিনি শুভক্ষণে তাহা ধরিতে পারেন, তিনিই কৃতার্থ হন, ধন্য হন—নবজীবন লাভ করেন। নবজীবনদাতার নাম দাসের আত্ম-কথার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মহিমান্বিত হউক ইহাই দাসের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "দাসের তীর্থ পথের প্রসঙ্গ" পুস্তিকার ভূমিকায় পরিশেষে লিখিয়াছেন,—আমেরিকার 'প্রেসিডেণ্টের' টুপীর উপর যেমন N. S (National Servant) অর্থাৎ "জাতীয় ভৃত্য" এই দুটি কথার আদ্যক্ষর লিখিত থাকে, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু (আমাদের দাদা) মহাশয় বহুপূর্ব্ব হইতে 'দাস' উপাধি গ্রহণ করিয়া সমাজ-সেবকের কর্ত্তব্য সেইরূপ মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। দাদার কর্ত্তব্য ও সাধনা শেষ হইবে সেইদিন, যে দিন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার মাথার ভার গ্রহণ করিয়া "হরি ওঁ" বলিয়া মুক্তি দিতে পারিবেন।"



২৭.৬২

আত্ম-বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাবস্থা—প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়সে এই জীবনের এক ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাবস্থার কথা কিছু কিছু না বলিলে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে না। তবে আমার স্বদেশ-বাসী অনেকেই আমার উর্দ্ধতন পুরুষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন। সুতরাং আমি এখানে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলিব।

পৈত্রিক সম্পত্তির পরিণাম—পিতামহ হারাণচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। তাঁহার বিষয় আমার কিছুই স্মরণ নাই, কেবল একটি কথা স্মরণ আছে—আমার বয়স তখন আরো কম—চার বৎসর হইবে। আমি একদিন সকালবেলা সদর-বাড়ির 'গদীঘরের' দরজায় হুকা কল্কে নাড়িতেছিলাম। ঠাকুরদাদা মহাশয় বলেন, "দাদা, কল্কেয় হাত দিয়ো না, হাত পুড়ে যাবে।"

ঠাকুরদাদা বর্ত্তমানে উমেশচন্দ্র ও দ্বারকানাথ দুই জ্যাঠা মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মেজোজ্যাঠা দ্বারকানাথ যখন মারা যানা তাহার আরো পরে—১২৬৭ সালের আশ্বিন মাসে আমার জন্ম হয়।

শুনিয়াছিলাম ঠাকুরদাদা মৃত্যুকালীন নগদ ১৩৬ তোড়া—এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা এবং গোবরডাঙ্গার বসতবাড়ি, বড়বাজারের বাড়ি ও ঘৃত-চিনির আড়তের মূলধন ইত্যাদিতে তিন লক্ষ টাকারও অধিক বিষয় রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুই

জ্যাঠা মহাশয়ের মধ্যে কাহারো পুত্র-সন্তান বর্ত্তমান না থাকায় পিতা গিরিশচন্দ্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

পিতামহ বর্ত্তমানে পিতা কোনোদিন দোকান-পাট বিষয়-সম্পত্তির কাজ দেখেন নাই। তাই পিতামহের মৃত্যুর পর নাকি তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি শাকের কড়িও উপার্জ্জন করি নাই, বাবা এত টাকা দিয়া গেলেন, আমি তাঁহার শ্রাদ্ধে সিকি টাকা (বিষয়ের একচতুর্থাংশ) খরচ করিব।"

পিতামহের শ্রাদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, বাইশ হাজার, কেহ কেহ বলেন আঠারো হাজার,—যাহা হউক সে সম্বন্ধে অনেক রকম প্রবাদ আছে। শ্রাদ্ধের সময়ের একটি কথা আমার স্মরণ আছে,—আমি জানালা দিয়া লুচি ফেলিয়া কাঙালীদের দিতেছি।

শ্রাদ্ধের ব্যয় বাদে লক্ষাধিক টাকা, কলিকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে ইংরাজপল্লীতে পিতা কয়েকখানি বাড়ি খরিদ করিয়া আবদ্ধ করেন। শুনিয়াছিলাম তাহাতে ভাড়ার আয় মাসিক চারশত টাকার অধিক হইয়াছিল। এজন্য তৎকালীন বুদ্ধিমান বিষয়ী আত্মীয়পক্ষ পিতার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারই দ্বারা চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গেল তখন আবার অনেকেই তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন।

পিতা সাধারণত মানুষকে অবিশ্বাস করিতেন না। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন;—"আমি শাকের কড়িও উপার্জ্জন করি নাই, আর এত বিষয় পাইলাম, এ সমস্তই কি আমার? ইহাতে যাঁহাদের প্রাপ্য আছে তাহা আমাকে দিতেই হইবে।" তাঁহার নিকট কেহ টাকা ধার চাহিতে আসিলে চার পাঁচ শত টাকা

পর্য্যন্ত এককালীন দিয়া বলিতেন, এ টাকা আর ফেরত দিতে হইবে না। আপনি ইহাতে কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইবেন আমি শুনিয়াই সুখী হইব। *

যখন তিনি বাড়ি খরিদ-উপলক্ষ্যে পল্লীবাস ছাড়িয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন, তখন অনেক রকম লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইতে লাগিল।

এক জ্ঞাতি জ্যাঠা কালাচাঁদ কুণ্ডু মহাশয় বড়বাজারে ঘৃত-চিনির দোকানের অংশীদার ছিলেন। পিতা কখনো গদীতে গিয়া বসিতেন না—কিম্বা কাজ-কর্ম্ম কিছুই দেখিতেন না। জ্যাঠা মহাশয় ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। পিতা কয়েকটি নূতন কর্ম্মচারী লইয়া টালায় সোরা রিফাইনের একটি কারখানা করিলেন। তাহাতে এক বৎসরেই চোদ্দ হাজার টাকা লোকসান যায়। সেই সময়ে বেলগাছিয়ায় একখানি বাগান কেনা হয়, তাহার সংস্কারকার্য্যেও নিয়ত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল।

প্রথম উদ্যমে এতগুলি টাকা বাহির হইয়া গেল দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী একব্যক্তির পরামর্শে পিতা উল্টাডাঙায় চাউলের আড়ৎ খুলিলেন। পরামর্শদাতাই হইলেন কর্ম্মকর্ত্তা। আড়তের পশ্চাৎভাগে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খোলার বাড়ি প্রস্তুত হইল। ইতিপূর্ব্বে আমাকে এবং আমার দুইটি ছোট ভাই ভগিনীকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী বেলগাছিয়ার বাগানে বাস

---

* পিতার অয়েলপেন্টিংখানি নষ্ট হওয়াতে তাঁহার ছবি দিতে না পারায় বড়ই একটা ত্রুটী রহিয়া গেল।

করিতেছিলেন, এখন আবার আমাদের উল্টাডাঙার নূতন-বাসা-বাড়িতেও আমরা মধ্যে মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম।

উল্টাডাঙা আড়তের কার্য্য বোধহয় দুই বৎসরের অধিক চলে নাই। তাহাতেই শুনিয়াছিলাম ত্রিশ হাজার টাকার অধিক লোকসান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নূতন নূতন গাড়ি-ঘোড়া-বদল, দান-খয়রাৎ নানাবিষয়ে অর্থব্যয় হইতেছিল। এই সমস্ত টাকা বড়বাজারের দোকান হইতে লইয়াও ইংরাজটোলার বাড়িগুলি, ক্রমে বড়বাজারের বাড়ি ও বেলগাছিয়ার বাগান পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িয়া গেল।

যখন সমস্ত বিষয় নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন পিতা সমস্ত দেনা ও সম্পত্তির তালিকা শ্যামলধন দত্ত এ্যাটর্ণীর হাতে দিয়া বাংলা ১২০৮ সালের ভাদ্রমাসে গোবরডাঙ্গার বাড়িতে আসিলেন। এ্যাটর্ণী বাজার দরে বাড়িগুলি বিক্রয় করিয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি এ্যাটর্ণীর খরচাতেই প্রায় দশ হাজার টাকা গিয়াছিল।

পিতা বাড়ি আসিয়া বলিলেন, "আমার এখনো কি এমন কিছু নাই যে, দুর্গোৎসব হইতে পারে?" সদর-বাড়ির উঠান-যোড়া একখানা কার্পেটের বিছানা, শুনিয়াছিলাম তাহা আঠারো শত টাকায় খরিদ ছিল, তাহা বন্ধক রাখিয়া চার শত টাকা আনাইয়া পূজা হয়। আমাদের বাড়িতে সেই শেষ পূজা! সে বৎসর গোবরডাঙ্গায় প্রবল বন্যা হইয়াছিল। অষ্টমীপূজার দিন বরাহনগর হইতে মাতাঠাকুরাণী ও আমরা কয়েকটি ভাই-ভগিনী বাড়ি আসি। বেড়গুমের মাঠ হইতে নৌকায় আসিতে হইয়াছিল। তখন তো জল অনেক কমিয়াই গিয়াছিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরাহনগর-বাড়ি—বেলগাছিয়ার বাগানে অবস্থানকালীন এক সময় মাতাঠাকুরাণী শারীরিক কিছু অসুস্থ হইয়া পড়েন। বরাহনগরে পিতার স্ব-সম্পর্কীয়া এক খুড়ী ছিলেন। পিতা তাঁহার অনুরোধে মাতাঠাকুরাণীকে এবং আমাদিগকে তাঁহার সেই সামান্য কুটীরেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহার নিকটেই আমাদের মাতামহের ভিটা-জমি কিছু ছিল। সেই সময় ঐ জমির উপর একটি দোতালা পাকা বাড়ি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া মাত্র বাসোপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত কাজ তাহার শেষ হইল না। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি চলিয়া যাইবার শেষ সময়ে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। দাসের আত্ম-কথার সঙ্গে বরাহনগরের যে সম্বন্ধ আছে তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শিক্ষার অবস্থা—তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে নিয়ম ছিল, বালক পাঁচবৎসরে পদার্পণ করিলেই গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় তাহার হাতেখড়ি হইত। আমারও তাহাই হইয়াছিল। বাগআঁচড়া নিবাসী বিশ্বম্ভর মল্লিক মহাশয় আমাদের বাড়িতে পাঠশালা করেন। পিতা আমার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মল্লিক গুরুমহাশয়ের কথা আমার মনে চিরদিন গাঁথা আছে। তিনি এ বিষয়ে পরিপক্ক ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের শিক্ষায় ছয় সাত বৎসর বয়সেই পরিষ্কার হাতের লেখা এবং

পাঁচশত নামতা, শুভঙ্করী অঙ্কসকল মুখস্থ বলিতে পারিতাম। তাঁহার অগ্রজ পীতাম্বর মল্লিক মহাশয়ও কিছু দিন এখানে পাঠশালা করিয়াছিলেন। পরে খাঁটুরা-নিবাসী নফর সরকার নামক একব্যক্তিও কিছুদিন আমাদের বাড়ি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের নিকটও লিখিয়াছিলাম। সরকার মহাশয় চিত্র আঁকিতে জানিতেন। আমি তাহা দেখিয়া একটু-আধটুক অভ্যাস করিয়াছিলাম কিন্তু যত্নের অভাবে তাহার কোনো উন্নতি হয় নাই।

তারপর যখন আমরা কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলাম, তখন হইতে আমার স্কুলের পড়া আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে হেয়ার স্কুল, কুইন্স-কলেজ, (বর্ত্তমান স্কটীস্ চার্চ্চ) বরাহনগর-কাশীনাথ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। কিন্তু কোনো স্কুলেই ফাষ্টবুক শেষ হইত না। মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসাপরিবর্ত্তন হইত। কখনো বেলগাছিয়ার বাগানে, কখনো উল্টাডাঙার আড়ৎ-বাড়িতে, কখনো বরাহনগরে। প্রত্যেকবার স্থানান্তরের সময় আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইত। স্কুলে যাইতে না হইলেই বাঁচিতাম। পায়রা ও ছাগলের গাড়ি লইয়া খেলা, ঘোড়ায় চড়া, কোচবাক্সে উঠিয়া গাড়ি হাঁকাইতে বড়ই উৎসাহী ছিলাম। কিন্তু—পড়িয়া যাইবার ভয়ে পিতামাতা সর্ব্বদা শেষোক্ত কাজটিতে বাধা দিতেন, কেবল পুরস্কৃত কোচম্যান সহিসদিগের 'অভয়বাণী' সে-বাধা দূর করিত। একদিন টম্‌টম্ হাঁকাইয়া হেয়ার স্কুলে যাইতে এক বৃদ্ধার উপর গাড়ি ফেলিয়াছিলাম কিন্তু তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই, কয়েকঘণ্টার জন্য পুলিস

গাড়ি ঘোড়া আটক রাখিয়া, কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছিল।

এইরূপ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে বয়সের প্রায় এগারো বৎসর গত হয়। যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন বরাহনগর অবস্থানকালে নৈনান নামক পল্লীর এক পাঠশালায় আবার কিছুদিন হাতের লেখা ও শুভঙ্করী-অঙ্ক-স্মৃতির পুনরুদ্ধার করিয়া বড়বাজারে জ্যাঠামহাশয়ের দোকানে গেলাম। আমাদের ঘৃত চিনির দোকান তখন তাঁহার নিজস্ব হইয়াছে।

জ্যাঠা মহাশয়ের কর্ত্তব্য—আমাদের পৈতৃক বিষয়-বৈভব সমস্ত চলিয়া গেলে মাতা-ঠাকুরাণীর উপর সংসারের ভার পড়িল। চারিটি ভাই ও একটি ভগিনীর মধ্যে আমিই বড়। আমার বয়স তখন বারো বৎসর মাত্র। ভগিনীটি আমারই কনিষ্ঠা। পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন না বটে, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইলেন। পিতামহীর হাতে-গাঁটে যাহা-কিছু ছিল, তাহাতে সমস্ত সংসার চলে না, কাজেই মাতাঠাকুরাণী বাড়ির মধ্যে ছোট বউ—সংসার-অনভিজ্ঞা হইলেও সংসারের সমস্ত দায়ীত্ব তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল।

ঠাকুরদাদা মহাশয় জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র কালাচাঁদকে কাজ শিখাইয়া দোকানের অংশীদার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহারই উপর দোকানের সমস্ত নির্ভর করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের অবস্থা যখন মন্দ হইল তখন আমি কতদিনে কাজ শিখিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইব,—এখন সংসার চলিবে

কিরূপে ? একথা জ্যাঠা মহাশয় অবশ্যই ভাবিয়াছিলেন। যিনি নিরুপায়ের উপায়! তিনিই জ্যাঠামহাশয়ের দ্বারা এক উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন।

যখন বিষয়-আশয় সমস্তই যাইতেছিল, তখন পিতার মানসিক অবস্থা নিতান্ত বিশৃঙ্খল। যার তার হাত দিয়া যৎসামান্যেও মূল্যবান বস্তু সকল বন্ধক রাখিয়া কত টাকা আনাইয়াছিলেন তাহার কোনো হিসাব ছিল না। যাঁহারা ভাল লোক তাঁহাদের নিকট জ্যাঠামহাশয় দোকান হইতে টাকা ধার দিয়া কিছু কিছু জিনিষ ফেরত পাইয়াছিলেন। সেই সকল মূল্যবান অলঙ্কার, শাল, রুমাল ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। আর মাতা-ঠাকুরাণী নিজের কতকগুলি অলঙ্কার বিক্রয় করিতে তাঁহার হাতে দিয়াছিলেন, এই উভয়বিধ টাকা দোকানে জমা রাখিয়া, তাহার স্থদ এবং কিছু কিছু আসলে তখনকার মত সংসার চলিবার ব্যবস্থা করিয়া জ্যাঠামহাশয়, মাতাঠাকুরাণীকে বরাহনগর হইতে গোবরডাঙ্গার বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

বিবাহ—এই সময় জ্যাঠামহাশয় আর একটি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বরাহনগর-নিবাসী স্বর্গীয় ষষ্ঠীবর পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, জ্যাঠামহাশয়ের উদ্যোগে কয়েকদিনের মধ্যে তাহা স্থির হইয়া ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসে বরাহনগরের বাড়িতে থাকিয়াই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হইয়া গেল। সাত বৎসর বয়স্কা বালিকার সহিত আমার বিবাহ হইল, তখন আমার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরীক্ষাজয়—পল্লীগ্রামে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হইলেও তখনকার সময়ে পল্লী-জীবনে তেমন বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভোগ মাত্র বয়সের দশ এগারো বৎসর পর্য্যন্ত।

যখন দোকানে কার্য্য শিক্ষা করিতে এলাম, তখন বড়-বাজারের রাস্তায় ড্রেণ ছিল না। রাস্তার দুই পার্শ্বে নর্দ্দামার দুর্গন্ধ, চিনির বস্তায় মাছি বোল্‌তা ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে; অনেক রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা, তার পর ডাল ভাত খাওয়া; সর্ব্বদা গদিতে বসিয়া খাতা লেখা—এ অবস্থা আমার পক্ষে বড়ই ভয়ানক বোধ হইল। এই ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আমারি মত এক বালক-সঙ্গীর (অটল সেন) সহিত পশ্চিমে পলাইয়া গেলাম, কানপুর পর্য্যন্ত গিয়া পথের কষ্টে ও বিপদাশঙ্কায় কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। লজ্জায় কলিকাতায় কাহারো সহিত দেখা না করিয়া সরাসর গোবরডাঙ্গার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ি গিয়া দেখি, একটি ছোট ভাই অতিশয় রুগ্ন, সে যে কি দৃশ্য—সংসার যেন শ্রীহীন। অল্প দিনের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সংসারের এই দশা দেখিয়া প্রাণে একটা গুরুতর আঘাত লাগিল। মনে হইল, কি, এই সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে পারিব না? বড় মানুষের ছেলে ছিলাম, মনে করিয়া বসিয়া থাকিব? না, তাহা হইবে না। এই

ভাবে কে যেন আমাকে এই সংসারের ভার বহন করিতে বল দান করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া দোকানের কাজে মন নিবেশ করিলাম। ধীরে ধীরে সকল কষ্ট সহ্য হইয়া গেল। দুই বৎসরের মধ্যে হিসাব পত্র লেখায় পারদর্শী হইলাম।

তিনটি ভাবের অঙ্কুর—ঈশ্বর-কৃপা-স্পর্শে আমার পরিবর্ত্তিত জীবনে যে সকল ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনটি ভাবের অঙ্কুর যৌবনের প্রারম্ভেই প্রকাশ পাইয়াছিল। আগে তাহা বুঝি নাই—এখন বুঝিতেছি।

পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি চলিয়া গেলে যখন বড়বাজারে জ্যাঠা মহাশয়ের দোকানে আসিলাম, অর্থাৎ এতবড় অবস্থান্তরের জন্য আমার মনে কোনো কষ্ট, দুঃখ, কিম্বা কিছুমাত্র আক্ষেপ কোনোদিন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বিষয়-আশায় সমস্তই গেল—এখন কি হইবে, কেমন করিয়া সংসার চলিবে ইহা ভাবিয়া যে একটা হা-হুতাশের ভাব মনে হওয়া কিম্বা তখন কতজনে কত কথা বলিয়া, হায় হায় করিয়াছিলেন, অবশ্য আমি কি সে সকল কথা কিছুই বুঝিতাম না? তাহা নহে। তথাপি তজ্জন্য যে আমি কোনোদিন দুঃখ করিয়াছিলাম এমন কিছুমাত্র আমার মনে হয় না। ইহাতেই এখন বেশ স্মরণ হইতেছে যে, এ জীবনের মূলেই ঐ "অনাশক্ত" ভাবটি ছিল।

তবে যে, দোকানে আসিয়া ভয়ানক অসহ্য ক্লেশানুভব করিতে লাগিলাম,—যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেই কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চিম প্রদেশে পলাইয়া গেলাম, তাহার কারণ অন্য। ইহাও আর একটি নিদ্রিত ভাবের অঙ্কুর। আমি এখন এ কথা

মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, মানব-জীবনের পক্ষে পরম পদার্থ পরমেশ্বর, স্পর্শমণিস্বরূপ। তাঁহার কৃপা-স্পর্শে লৌহময় মলিন জীবন সোনা হইয়া যায়। ভগবানের আর একটি নাম "ক্ষতিপূরণ।" যিনি তাঁহার চরণাশ্রয় করেন, তাঁহার গত জীবনে যে-কিছু ক্ষতি থাকে তাহা পূরণ হইয়া যায়। আমার বাল্য জীবনে অভিভাবকের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে, শিক্ষা-বিশৃঙ্খলার মধ্যে, পল্লীগ্রামে কুসঙ্গে—উশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারে—অবাধ বিচরণের মধ্যে অনেক দোষাবহ কুঅভ্যাস হইয়াছিল; কিন্তু সেই স্বেচ্ছাচারিতার ভিতর হইতেই যেন স্বাধীন ভাবটি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। দোকানে আসিয়া সেই অবাধ ভাবে বাধা পড়িল। বিশেষ ভাবে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িলাম; এ বন্ধন আমার পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। ইহাই কষ্টের কারণ হইল। বাল্যের উশৃঙ্খল ভাব যাহা পরিণামে স্বাধীনভাবে পরিণত হইয়াছিল, তাহারও অঙ্কুর এইখানে দেখা গিয়াছিল।

প্রথমত মাতাঠাকুরাণীর উপর সংসারের সকল ভার পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সে ভার বহনের জন্য তিনি আমার প্রতি নির্ভর করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে কেন জানি না, সংসারের প্রকৃত দায়িত্ব বোধ এই পঞ্চদশ বা যোড়শ বর্ষীয় বালকের মনে জন্মিল! আন্তরিক দৃষ্টিতে সংসারের দিকে তাকাইয়া কি এক অশান্তির ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম।

এ অশান্তি যে কেবল আমারই পক্ষে নূতন তাহা বলিতে পারি না। সংসারে অশান্তি নাই কাহার? কোন্ সংসারে প্রকৃত শান্তি আছে? কিন্তু জানি না এই অশান্তির অন্ধকার

আমাকেই কেন এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছিল! যতই চিন্তা করিতাম, কোনো কূল দেখিতে পাইতাম না—কেবলই যেন অন্ধকার। পক্ষান্তরে কি এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা—কি-এক অস্ফুট আভাস মনে জাগিত। কি-করিলে সংসারে স্ত্রীলোকদিগের কুসংস্কার দূর হইবে, সংসারে শৃঙ্খলা হইবে। সংসারে অর্থাভাবে মানুষ যেরূপ অধীর হইয়া হাহাকার করে, আমার মনে সে ভাব কখনো আসিত না। মনে শান্তি থাকিলে অল্প অর্থেও সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং শৃঙ্খলা হইতে পারে এ কথা যেন মনে মনে বুঝিতাম, কিন্তু সংসারে কাহাকেও বুঝাইতে পারিতাম না। কি-এক চিন্তাই ক্রমাগত হইত—কোনো পথই বাহির করিতে পারিতাম না।

পূর্ব্বে যখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল তখন আত্মীয় সম্পর্কে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ যাঁহারা আমাদের সংসারভুক্ত ছিলেন, ছোটবেলা যাঁহাদের আমি দেখিয়াছিলাম এখন তাঁহাদের কেহ কেহ পরলোকস্থ হইয়াছেন, আর কেহ কেহ অবস্থান্তরে স্থানান্তরে গিয়াছেন, সুতরাং সংসারে পিতামহী, মাতাঠাকুরাণী, মাসীমাতা এবং ভগিনী—এই নিতান্ত আপনা আপনি কয়েকটির মধ্যেও নানাপ্রকার অনৈক্য, অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া আমার মনে অতিশয় ক্লেশ বোধ এবং তাহার প্রতিবিধানেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইত। ইহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটি "নূতন সংস্কারের" ভাব মূলেই প্রাণে ছিল।

অনাশক্তি, স্বাধীনতা, সংস্কার—বা ভাঙা গড়ার স্পৃহা, এই তিনটি ভাবের বীজ, যৌবনের প্রারম্ভেই অঙ্কুরিত হইয়া যথাসময়ে ঈশ্বর-কৃপা-বারি পতনে জীবনে তাহার আকার ধারণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুসঙ্গে বিকাশ—বাল্যকালে মনে হয় না যে, ভাল সঙ্গী একটিও পাইয়াছিলাম। সে-সময় আমাদের পাড়ায় পাঠশালার বালকেরা অনেকটা অসভ্যই ছিল। অবশ্য খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গায় দুইটি স্কুল ছিল বটে, কিন্তু আমার শিক্ষা-সঙ্গ ততদূর অগ্রসর হয় নাই।

কিছুদিন পরে কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া মধ্যে একবার বাড়ি থাকার অবস্থায় গোবরডাঙ্গা-স্কুলে ভর্ত্তি হই। সেইসময়ের মধ্যে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের নাবালক গিরিজাপ্রসন্ন, অন্নদাপ্রসন্ন বাবুরা ছুটিতে বাড়িতে আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানো এবং বাবু-পাড়ার দুই-একটি বালকের সঙ্গে বন্ধুতাও হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে যে আমার মানসিক কোনো উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহা মনে হয় না।

পিতা আমার জন্য একটি ছোট্ট টাটু ঘোড়া কিনিয়াছিলেন। দমদমা রোডে তাহাতে চড়া অভ্যাস করিয়া সেই ঘোড়া লইয়া দেশে আসি। আমার ছোট্ট ঘোড়াটিকে দেখিয়া বাবুরা একটু আমোদ করিতেন।

বাল্যসঙ্গী হরিবিহারী—দেশের সঙ্গীদের মধ্যে আমার সমবয়স্ক একজন বিশেষ ছিল, তার সঙ্গে ভালোবাসা যেমন অধিক ছিল—কুপথে পদার্পণও তেমনি তার সঙ্গে মিশে খুব প্রথমে হয়। এখন সে পরলোকে, তার নাম হরিবিহারী সেন।

হরিবিহারী বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল। হরিবিহারীর মা আমাকে ছেলের মতই ভালোবাসিতেন। সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ি থাকিতাম। হরিবিহারীর বাবা রামচন্দ্র সেন, লোকে তাঁহাকে "চন্দ্রসেন" বলিত। তাঁহার চিনির কারখানা ছিল। বাড়িখানি একতলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাওয়া-রৌদ্র-মুখীন। বাড়িতে গাই-গোরু ছিল। বাড়ির বাগানে কলা, বেল, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি ফল হইত। ফলত চন্দ্রসেন মহাশয়ের বেশ সুখের সংসার ছিল। তখন গোবরডাঙ্গায় চিনির কারখানা করিয়া অনেক ব্যবসায়ী গৃহস্থের স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া কিছু সঞ্চয়ও হইত। খাদ্যসুখই প্রধান ছিল।

আমি প্রায় প্রতিদিন ভাত খাইয়াই হরিবিহারীদের বাড়ি গিয়া হাজির হইতাম। দুধ পাটালি গুড় মধ্যে মধ্যে পাকা কলা মাখিয়া হরিবিহারীর মা ভাত দিতেন, তবু আমি ও হরিবিহারী একপাতে দু-টি খাইতাম। কোনো-কোনোদিন রাত্রেও তাহাদের বাড়ি একত্রে ঘুমাইয়া পড়িতাম। আমাদের বাড়ি পূজাপার্ব্বণে সর্ব্বদাই যাত্রা-গান হইত। দিনে ছুটাছুটি খেলায় মত্ত থাকিয়া রাত্রে যাত্রার আসরে ঘুমাইয়া পড়িতাম।

এক নাপিত-বাড়িতে তবলা বাজাইতে শেখা, তামাক খাওয়া অভ্যাস হইতে খুব অল্প বয়সেই আমরা আরো কয়েকটিতে অসৎ পথে অগ্রসর হই, কিন্তু হরিবিহারী শীঘ্রই আমাদের উপর চলিতে আরম্ভ করে।

ইতিমধ্যে হরিবিহারীর বাবা মারা গেলেন। তাহার কিছু

পরে খাঁটুরা-নিবাসী সূতা-ব্যবসায়ী বিখ্যাত ধনী রাজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত হরিবিহারীর বিবাহ হয়। রাজেন্দ্রবাবু তখন অভিভাবক হইয়া তাহাকে কলিকাতায় সূতার দোকানে লইয়া গেলেন। যখন হরিবিহারীকে পাইলাম না, তখন আমা হইতে ছয়-সাত বৎসরের বড় কালীনাথ রক্ষিতকে পাইলাম। কালীনাথ সৌখীন বাবু এবং এ-পথে তাহার অভিজ্ঞতাও কিছু ছিল, সুতরাং সে যেন আমার পরিচালক হইয়া পড়িল। আবার কলিকাতায় আসিয়া জ্যাঠামহাশয়ের দোকানেই কালীনাথের চাকরি হইল ; তাহাতে আমাদের মাহেন্দ্রযোগ ঘটিল।

আমাদের বাড়ির পার্শ্বেই কালীনাথদের বাড়ি ছিল। তাহার পিতা দ্বারকানাথ রক্ষিত মহাশয়কে আমি দেখিয়াছিলাম। তখন তিনি বোধহয় অসুস্থ ছিলেন, তারপর মারা যান। এবং কিছুদিন পরে কালীনাথের মাতাও গত হন। শেষ কালীনাথের বড় মামা রাজেন্দ্র রক্ষিত ও এক মাসীমাতা ঐ বাড়িতে ছিলেন।

কালীনাথের ছোটমামা ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় পূজ্য ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যখন মালদহ জেলার চাঁচল রাজবাড়ির ডাক্তার হইয়া ষোল বৎসর তথায় সপরিবারে বাস করেন, সে-সময় কালীনাথ সেখানে কিছুদিন ছিল। এমন সাধুপুরুষের সঙ্গে থাকিয়াও কি সূত্রে কালীনাথ কুসঙ্গানুরাগী হইয়াছিল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

অনুকূল কুপথে—বরাহনগরে আমাদের এক খুল্ল-পিতামহী বাস করিতেন এ-কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞাতি

সম্পর্কীয় এক খুল্ল-পিতামহের তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে ন-দিদি বলিতাম। তিনি অনেক নিঃসম্পর্কীয়েরও "ন-দিদি" ছিলেন। একটা চলিত কথা আছে "বরের ঘরের পিসী ক'নের ঘরের মাসী"; ইনি সেই রকমের ছিলেন। আমার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে নৈকট্যভাবে সর্ব্বদা বসবাস না করিলেও তাঁহার উপর ন-দিদির প্রভাব কিছু কম ছিল না। তিনি খুব উগ্রস্বভাবা নারী ছিলেন, কিন্তু আমার ভাইদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং সময় সময় কাছে রাখিতেন। শেষে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর যতীন্দ্রকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সেইসময় হইতে আমাদের পাকা বাড়িতে আসিয়া তিনি বাস করেন।

ন-দিদির কিছু সংস্থান ছিল। কারণ নিজের জীবিকা ছাড়া আমাদের জন্য বা যতীন্দ্রকে প্রতিপালন-সূত্রে আমরা স্ব-ইচ্ছায় কখনো কিছু না দিলে অর্থের জন্য আমাদের উপর নির্ভর করিতেন না। আহিরীটোলা-প্রবাসী বিখ্যাত ধনশালী সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের সহিত তাঁহার কি-রকম ভাই সম্পর্ক ছিল। ন-দিদি তাঁহারই নিকট অর্থবিত্ত গচ্ছিত রাখিয়া তথা হইতে মাসিক কিছু কিছু সুদ আনিতেন। ন-দিদির আরো দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী বরাহনগরেই পৃথক পৃথক বাস করিতেন। ন-দিদির বয়স বেশী দেখাইত কিন্তু ত্রিশের বেশী নয়।

এই বরাহনগরের বাড়িতে থাকিয়া কুপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে আমার আরো একটি সহজ অনুকূল সুযোগ হইয়াছিল। যখন দোকানে থাকা ঠিক হইল, তখন এই কথাটি প্রথমে

ন-দিদিই বলেন ;—"ছেলেমানুষ দোকানের কষ্ট সয়ে থাক্‌তে পারবে কেন ? দু-পাঁচ দিন দোকানে রহিল, দু-এক দিন বা বরাহনগর রহিল।" ঠাকুরমা, মা, সকলেই এ-কথা সঙ্গত মনে করিলেন। বিশেষ যাঁহার কাছে থাকিব তিনি যখন তাহাতে ইচ্ছুক তখন আর কথা কি ?

বড়বাজারে যখন কাজ-কর্ম্ম করিতে লাগিলাম তখন আট দশ দিন অন্তর বরাহনগর আসিয়া দু-একদিন বিশ্রাম করা নিয়মিত রকমেই চলিতে লাগিল। বরাহনগর-বাসী বড়বাজারের চাকুরে কয়েকটি কুসঙ্গীর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। জ্যাঠামহাশয়ের ভয়ে দোকানে থাকিয়া কিছু করা তত সুবিধাজনক হইত না। কিন্তু বরাহনগরের নামে সন্ধ্যার সময় দোকান হইতে বাহির হইয়া রাত্রি দশটা এগারোটা, কোনোদিন একটা-দুটার সময় যে-অবস্থাতেই হউক বরাহনগরে পৌঁছিতে তেমন কোনো বাধা হইত না। যদিও ন-দিদি কিছু বকিতেন কিন্তু তাহা অন্য রকমের। ক্রমে তাঁহার ভাব বোঝা যাইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা, যাহা করি ঘরে বসিয়া বাড়িতেই করি। শেষ কথাটা বলাই আমার পক্ষে বড়ই মুস্কিল, আগে জানিতাম না যে তাঁহার মনে এত দুরভিসন্ধি ছিল, ক্রমে আমাকে এমন সর্ব্বনাশের পথে জড়িত হইতে হইবে।

মাতামহ ও ছোটমামা—মাতামহের ভিটাজমিতে বরাহনগর-বাড়ি তৈরীর কথা পূর্ব্বে মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। পিতা ঐ জমির উপর ছাদওয়ালা বারান্দাযুক্ত নীচে-উপর দুইটি পাকা ঘর করিয়াছিলেন। তাহাতে চুণকাম, দরজা খড়খড়িতে

রং দেওয়া পর্য্যন্ত হয় নাই; তদবস্থাতেই আমরা উহাতে অনেকদিন বসবাস করিয়াছিলাম।

মাতামহ স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দুই কন্যা ব্যতীত কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। জ্যেষ্ঠা মাতাঠাকুরাণী, কনিষ্ঠা মাসীমাতা অল্পবয়সে বিধবা অবস্থা হইতে আজীবন আমাদের সংসারে থাকিয়া আমাদের লালন-পালন করিয়াছিলেন। দাদামহাশয় শেষ জীবনে কিছুদিন আমাদের গোবরডাঙ্গার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, তারপর এখানেই মারা যান। তখন আমার বয়স সাত কি আটের বেশী নয়। তিনিও ষাট্ বৎসরের বেশী বয়সে দেহত্যাগ করেন। দাদামহাশয়ের আকার ঠিক স্মরণ নাই বটে, কিন্তু তিনি দীর্ঘাকার—অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ সবল-দেহী আর অত্যন্ত সরল, একেবারে সাদাসিদা মানুষ ছিলেন। কড়েয়ার বাজারে তাঁহার একখানা মুদিখানা দোকান ছিল। তিনি বরাহনগর হইতে তিন মাইলের অধিক পথ চলিয়া প্রত্যহ প্রাতে দোকানে যাইতেন এবং রাত্রিতেও চলিয়া বাড়ি আসিতেন। দাদামহাশয় আজীবন গরীব গৃহস্থ ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, ঠাকুরদাদা এই গরীবের কন্যা পছন্দ করিয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মারা যান সে সময় দিদিমা কাছে ছিলেন, সে কান্নাকাটির কথা আমার মনে আছে, কিন্তু দাদামহাশয়ের মত তিনি জামাতা-বাড়িতে বাস করিতেন না। দাদামহাশয়ের বাড়ি কাঁচা (খড়ো ঘর) ছিল; সুতরাং কয়েক বৎসর পরে দিদি-মা চলিয়া গেলে কিছুদিনের মধ্যে সে বাড়িঘর ভূমিসাৎ হইয়াছিল।

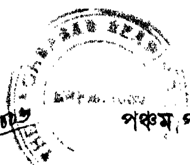
দাদামহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় ঠাকুরদাস দত্ত মহাশয় নিকটেই স্বতন্ত্র ভিটায় বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্রকে আমি আপন মামার ন্যায় জানিতাম। ছোট দাদামহাশয়ও অতি প্রফুল্লচিত্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন। ছোটমামা অবিনাশ দত্ত আমাপেক্ষা দশ এগারো বছরের বড় হইলেও পায়রা লইয়া খেলা-ধূলায় তাঁহার সঙ্গী ছিলাম, পায়রা পোষার বাতিক ছোটমামা হইতে জন্মিয়াছিল। তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন—"বাবা যোগী" বলিয়াই তিনি আমাকে ডাকিতেন। ছোট দাদামহাশয়ও গরীব ছিলেন, মুদিখানা দোকানে চাকরি করিয়া তিনি সংসার প্রতিপালন করিয়াছেন। ছোট দাদামহাশয় মারা গেলে দুই মামা অবিবাহিত অবস্থায় পর পর গতাসু হন। দিদিমাকে অনেক দিন কষ্টের জীবন বহন করিতে হইয়াছিল।

সে সময় বরাহনগরের উত্তরে তাম্বুলীপাড়ায় পঁচিশ ত্রিশঘর তাম্বুলী আর তিন-চার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এখন কিছু অধিক হইয়াছে। এখন চিনির ব্যবসা বিদেশী বণিকের কবলিত হওয়ায় ধনীর অবস্থা হীন ও সংখ্যায় কম হইয়াছে। বরাহনগরের তাম্বুলীশ্রেণী পূর্ব্বে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতার অবস্থা—পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন না, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন হইলেন। তাঁহার উদাসীনতাও বিশেষ রকমের ছিল। অর্থ না থাকিলে সকলেই যে সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত হইয়া দায়ীত্ব এড়াইতে পারেন তাহা বড় দেখা যায় না। একসময় যাঁর অবস্থা ভাল ছিল—তারপর একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন—তখন মেয়েদের হাতে সংসার, তবু তিনি সংসারের ভাল মন্দ চিন্তা—মায়ামমতার কথা কিছুই ভুলিতে পারেন না। কিন্তু পিতার সেরূপ ভাব দেখা গেল না। তিনি সংসারের সকল চিন্তা উদ্‌বেগ—ভাল মন্দ হইতে একেবারে বিরত হইলেন। কোনো দায়ীত্ববোধ রাখিলেন না।

কিন্তু ভোগ-বিলাস অভ্যাস তাঁহার এই উদাসীন প্রকৃতির উপর প্রথমত ভয়ানক বিঘ্ন ঘটাইল। আবাল্য সুখ-স্বচ্ছন্দতার পর এই অবস্থা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। বিশেষত আহারাদির বিষয়ে তখন সংসারের মোটামুটী অবস্থা; তথাপি মাতাঠাকুরাণী চেষ্টা করিলে যতটা শৃঙ্খলা করিতে পারিতেন, তাহার যেন ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। তজ্জন্য পিতা সর্ব্বদা বিরক্ত হইতেন। সংসারের এই অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। বাড়ি আসিয়া দেখিতাম, আমাপেক্ষা পিতার যত্ন যেন কম হইত। তাহা আমার আদৌ ভাল লাগিত না।



সাংসারিক বিষয়ে পিতার কোনো ভাবনা না থাকিলেও রাত্রি জাগরণে অতিরিক্ত তৈলের খরচ, তামাক এবং নিজের ইচ্ছামত কিছু ফল-পাকড় কেনা এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য তিনি প্রথমে মাতা ঠাকুরাণীর উপর জোর-জুলুম – পরে বাড়ির জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহাও আমার পক্ষে এক অশান্তির কারণ হইল।

তৎপরে পিতার কাপড় জুতা প্রভৃতি ছাড়া প্রতিমাসে নগদ কিছু কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম, তাহাতে দেখা গেল, সেই কাপড় জুতা দুই-এক দিনের বেশি তাঁহার নিকট থাকে না— হয় কাহাকে দান করা, না-হয় সামান্য দুই-চার আনা লইয়া দেওয়া। খরচের জন্য যা-কিছু দিলে সেইদিনই সমস্ত খরচ, পরদিন যে নাই সেই নাই অবস্থা। ইহাতে শেষে এমন হইল যে তাঁহার অভাব পূরণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল।

আরো দেখা গেল, যার-তার নিকট তিনি যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন; ইহাতে আমার মনে তখন যে লজ্জা ও কষ্ট হইয়াছিল তাহা এখন আর কি বলিব! কখনো কখনো রাগ হইয়াছে—তাহাতে দুই-এককথা বিরক্তির ভাবেও বলা হইয়াছিল। কতরকম উপায় করিয়াও কিছুতেই কিছু করা গেল না। এই ঘটনায় আমার মনে হইল যাহার পিতার অবস্থা এইরূপ, সে আবার কেমন করিয়া সংসারে গণ্য-মান্য হইয়া বাবু সাজিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু পিতা তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জা কিম্বা কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। অর্থ সম্বন্ধে যেন তাঁহার 'আমার' 'তোমার' ভাব ছিল না।

তাই তিনি মনে করিতেন; আমার যখন ছিল অকাতরে সকলকে দিয়াছি, এখন যাহাদের আছে তাহারা আমাকে অতি সামান্যও দিবে না কেন? এখন এইরূপ আমার মনে হইতেছে, কিন্তু তখন তাহা হয় নাই।

এইরূপে দোকানে অশান্তি, সংসারে অশান্তি পিতার অবস্থা জনিত অশান্তি, কিন্তু ঘোর অশান্তির মধ্যেই বিধাতা নবজীবনের সূচনা করিতেছিলেন। এইরূপই তাঁহার কাজ।

স্নেহময় বন্ধু—এ অশান্তি দোকানের কাজে কর্ম্মে ভুলিয়া থাকিতাম বটে, কিন্তু বাড়ি আসিলে সংসারের চিত্র দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিতাম, অথচ তাহার প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না। পিতার অবস্থা দেখিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িতাম। ভাবনা ত্যাগ করিতেও পারিতাম না।

এইরূপে যখন দিন যাইতেছিল তখন এক স্নেহময় বন্ধু পাইলাম। তিনি সম্পর্কে আমার দাদা। স্বর্গীয় রামরাম কুণ্ডু মহাশয়ের ছয় পুত্র, এক কন্যা; আমরা তাঁহার ৪র্থ পুত্রের প্রপৌত্র, দাদা কন্যার প্রপৌত্র। দাদার পিতামহ স্বর্গীয় রামসুন্দর রক্ষিত মহাশয় আর আমার পিতামহ স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় উভয়ে মামাত-পীস্‌তুত ভাই।

সুন্দর রক্ষিত মহাশয় নাকি বেশ আহার করিতে পারিতেন। তাঁহার ছয় মামার বাড়ি পৃথক পৃথক ছিল, তিনি যমুনায় স্নান করিয়া যাইবার সময় প্রতিদিন এক এক মামীর ঘরে দশ বারো গণ্ডা পিষ্টক ও খেজুর গুড় জল খাবার খাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনে তাঁহার কোনো ব্যাঘাত হইত না। ইহা শত বৎসরের কথা।

দাদারা তিন সহোদর, কনিষ্ঠ উমেশচন্দ্র রক্ষিত আমার স্নেহময় বন্ধু। উমেশদাদার প্রাণে আমার প্রতি এত সহানুভূতি কেন সঞ্চিত ছিল জানি না। আমি প্রথমে কিছুই জানিতে পারি নাই যে তিনি আমার প্রতি এত ভালবাসা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে কার্য্যের দ্বারা দাদা আমাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন।

দাদার সঙ্গে সম্বন্ধ—দাদা কেবল দাদা না হইয়া বন্ধুও হইয়াছিলেন। দাদা আমা অপেক্ষা দশ বারো বৎসরের বড় এবং নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন। আমি কিন্তু তখন তাঁহার মত ছিলাম না, অনেক কুসঙ্গে মিশিতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, দাদা তাহা যেন জানিতেনই না, এমন-কি আমাকে যেন কত বুদ্ধিমান মনে করিতেন। ইহার মধ্যে আরো একটি বিশেষ কথা এই যে, প্রথম হইতে তাঁহার মনে আমার সম্বন্ধে 'আমার' 'তোমার' ভাব ছিল না; ইহা আমি প্রথমে বুঝিতাম না, অনেক পরে বুঝিলাম, এখন সেই কথাটি বড়ই মনে জাগিয়াছে।

যখন দাদার সঙ্গে কোনো জিনিস-পত্র খরিদ করিতে বাহির হইতাম, তখন উভয়ের টাকা পয়সা দেনা লেনা ঘটিত। আমি মনে মনে হিসাব রাখিতাম কত দিলাম কত লইলাম কিন্তু সকল সময়—সকল অবস্থাতেই দেখিয়াছি দাদা তাহা মনে রাখিতেন না। আমার নিকট তিনি পাওনা মনেই করিতেন না। এমন অভেদ ভাব সংসারে বড়ই দুর্লভ।

দাদারও সংসারে কতরকম অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামসেবক রক্ষিত মহাশয় কিছু বিষয়-বিত্ত রাখিয়া

গিয়াছিলেন। তারপর দাদাদের বনগাঁয় দোকান ও গোবরডাঙ্গায় চিনির কারখানা ছিল। সমস্তই বড় দাদাদের কর্ত্তৃত্বে চলিত, শেষটা গোলোযোগ হইয়া গেল, ভাই ভাই পৃথক হইয়া বাড়ি-ঘর পর্য্যন্ত ভাগ হইল। সকল সময় আমি দাদার সঙ্গী, দাদা আমার সঙ্গী। দাদা আমার সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেন, পিতার হাত হইতে বাড়ি রক্ষার জন্য দাদার নামে সদরবাড়ি ভাড়ার একটা এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়াছিলাম, দাদা সমস্ত ঘর চিনির গুদাম-ভাড়া দিতেন। তাহাতে খাজনা ট্যাক্স দিয়া মেরামত খরচ কিছু কিছু করিয়াও সংসারের আংশিক সাহায্য করিতেন। বলা বাহুল্য এ কাজে তাঁহাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত। দাদার শ্বশুরবাড়ি বরাহনগরে ছিল, আমি সেখানে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের তত্ত্বাবধান করিতাম। প্রয়োজন হইলে টাকা পয়সা দিতাম, দাদার স্ত্রী আমাকে ভাইয়ের মত দেখিতেন। এইরূপ আমাদের মধুর সম্বন্ধ ছিল। এমন দাদার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারি নাই। আত্ম-কথার সঙ্গে তাঁহার অনেক সংযোগ আছে যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে।

পাঠানুরাগ—দোকানে থাকিতে একটি শুভ-সংযোগ হইল। জ্যাঠামহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামদাদা এবং উমেশদাদা উভয়ে মিলিয়া বাংলা নাটক নভেল বই কিনিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পড়ায় অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। আমিও ঐ বই দু-একখানা পড়িতে পড়িতে বেশ আকৃষ্ট হইলাম। সে বাংলা ১২৮৩—৮৪ সালের কথা। বাংলা সাহিত্যে তখন নবযুগের স্রোত বহিতেছিল।

বই কেনা হইল—বঙ্কিমবাবুর সমস্ত নভেল, অবশ্য তখন "দেবীচৌধুরাণী" ও "আনন্দমঠ" বাহির হয় নাই। তারপর দীনবন্ধু-বাবুর "লীলাবতী" "নবীন তপস্বিনী" প্রভৃতি নাটক, মাইকেলের সমস্ত কাব্য,—"মেঘনাদবধ কাব্য" কতক কতক মুখস্ত হইয়া গেল। তারপর শোভাবাজার রাজবাটীর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যয়ের এক প্রকাণ্ড পুস্তক বাহির হইল যাহার চলিত নাম "হরিদাসের গুপ্ত কথা", সে বোধ হয় এক বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে মনোমোহন বসুর প্রণয়পরীক্ষা, রামাভিষেক, হরিশ্চন্দ্র, সতী নাটক, পড়িয়া পড়িয়া মুখস্থ হইয়া গেল। সঞ্জীব বাবুর নভেল, রমেশচন্দ্র দত্তের "বঙ্গবিজেতা" প্রভৃতি, এদিকে "রামের রাজ্যাভিষেক", "সীতার বনবাস", "কাদম্বরী" "শকুন্তলা" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ দাদাদের কৃপায় পড়া হইল। তারপর আর তেমন করিয়া পড়া হইত না। কিন্তু ঐ যে অভ্যাস তাহা রহিয়া গেল। জ্যাঠামহাশয় বই পড়ার বড় বিরোধী ছিলেন। আমরা রাত্রে এবং যখন সুবিধা পাইতাম তখন লুকাইয়া পড়িতাম। কোনো কোনো সময় নভেল পড়িতে পড়িতে এমন নেশা ধরিয়া যাইত যে বই খানা শেষ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আর সোয়াস্তি ছিল না।

এই পাঠের ফলে যথেষ্ট আনন্দ হইয়াছিল এবং অনেক কুসংস্কারের মূলচ্ছেদ হইয়া তখন নিদ্রিতভাবেই মনে ছিল। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, সাহিত্যের শক্তি ব্যর্থ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোগ পরিচর্য্যা—বাংলা ১২৮৪ সালের শেষভাগে এক কঠিন পরীক্ষায় পড়িলাম। দ্বিতীয় তৃতীয় সহোদর উপেন্দ্র ও শশীন্দ্র, গোবরডাঙ্গার বাড়িতে থাকিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর ও প্লীহা যকৃতের পীড়ায় এবং মাতা ঠাকুরাণী গ্রহণী-শোথ রোগে আক্রান্তা হইয়া সকলেরই জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করানো কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় দোকান হইতে জ্যাঠামহাশয়ের সাহায্য পাইবার তেমন আশা পাওয়া গেল না। দোকানে যে টাকা জমা ছিল তাহাও এই চার পাঁচ বৎসরে নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। দোকানে আমাকে যাহা দিতেন, তাহাও সাধারণ বেতনের অধিক তেমন-কিছু নয়।

প্রথমে মনে বড় ভয় ভাবনা হইয়াছিল, তারপর মনে হইল যাহাতে মা-ভাইদের জীবন ফিরিয়া পাই তাহাই করিতে হইবে। সকলকে বরাহনগরের বাড়িতে আনিয়া কবিরাজী চিকিৎসায় নিযুক্ত করা হইল। এই সময় জ্যাঠামহাশয় একদিন বলিলেন, "দোকানে আসা বন্ধ কর, দোটানা কাজে কোনোদিকেই সুবিধা হইবে না।" প্রথমে কথাটা শুনিয়া কষ্ট হইল, শেষে দেখিলাম ঠিক বলিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীর নিকট তখন যে গহনা ছিল তাহার কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া চিকিৎসা-খরচ চলিতে লাগিল। ন-দিদি সমস্ত দিন-রাত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া একাই তিনটি রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু অতিশয়

বকাবকি করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ঐ রকম তাঁহার স্বভাব ছিল। আমরা অগত্যা সকলই সহ্য করিতাম। যাহাহউক এইরূপে প্রায় এক বৎসরে দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ঈশ্বর-কৃপায় তিনটি জীবন ফিরিয়া পাওয়া গেল, অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইল। কোনো-কোনো দিন কষ্টে দুঃখে কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম সে সমস্তই সফল হইল। এই সময় গোবরডাঙ্গার বাড়িতে পিতা, মাসীমাতা, ভগিনী ও পিতামহী ঠাকুরাণী ছিলেন, সুতরাং দুইটি সংসার-খরচ চলিয়াছিল—অবশ্য পিতামহী কিছু কিছু চালাইতেন।

জ্যাঠামহাশয়-পর্ব্ব সমাপ্তি—যখন এই গুরুতর রোগ-পরিচর্য্যায় পড়িলাম, তখন আমার বয়স সতেরো বৎসর। প্রত্যহ বা একদিন অন্তর নেড়া-গীর্জ্জায় রমানাথ সেন কবিরাজ-বাড়ি হইয়া চিনাবাজার ও বড়বাজারে পথ্য পাঁচনাদি সংগ্রহ এবং সকলপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করা, প্রধানত তিনটি রোগীর অবস্থার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা, অর্থাভাবের মধ্যে ব্যয় সংকুলান করা, বালক হইয়াও এই বিজ্ঞ-জনোচিত দায়ীত্ব, ব্যাকুল আন্তরিকতার সহিত বহন করিয়া, দোকানের কার্য্যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে প্রকার কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং কার্য্য-পটুতা জন্মে নাই, এই বৎসরকালে তাহার অধিক হইল। স্বাধীনভাবে দায়ীত্ব পালন করিয়া স্বভাবত একটা আত্ম তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল। এইসময় জ্যাঠামহাশয়ের দোকানের কার্য্যে আমার আর তেমন আস্থা রহিল না। মনও ভাঙিয়া গিয়াছিল।

আমি যখন উৎসাহের সহিত দোকানে কার্য্য করিতেছিলাম

তখন, আমাদের পুরাতন দোকানের ন্যায়পরায়ণ কর্ম্মচারী পার্ব্বতীচরণ কুণ্ডু মহাশয় আমাকে গোপনে দেখাইয়া দেন, আমাদের দোকানের অনাদায়ী ৫৩৫৲ টাকা আদায় হইয়া এই দোকানের আমানত খাতায় জমা আছে। উহার অধিকাংশ আমার প্রাপ্য। কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম এই বিপদের সময়ও জ্যাঠামহাশয় সে-কথা আমাকে বলিলেন না। এখন আমি তাঁহাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়া বলিলেন,—“উহা তোমাকে পরে দিব মনে করিয়াছিলাম।”

এই সময় আর এক ঘটনা উপস্থিত হইল। টালায় আমাদের একটু সাদা জমি ছিল, তাহা বিক্রয় করিবার জন্য এক ব্যক্তির নিকট শেষ অবস্থায় পিতা ২০১৲ টাকা বায়না লইয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক সে বিষয় অন্যের নিকট বিক্রয় হওয়ায়, তাঁহার বায়নার টাকা পাওনাই ছিল। তখন তিনি সেজন্য আর কিছু করেন নাই। তারপর যখন শুনিলেন আমি সাবালক হইয়া কাজকর্ম্ম করিতেছি, তখন সে পাওনা তামাদি হইলেও মনে হয় না কিরূপে তিনি সেই পাওনা আমার নিকট আদায় করিয়া লইলেন।

এইসময় জ্যাঠামহাশয়েরও একটি গুরুতর বৈষয়িক ঘটনা ঘটিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীরাম কুণ্ডুর সহিত এ পর্য্যন্ত তিনি একান্নবর্ত্তী থাকিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় হরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় প্রথমে আমাদের দোকানে ছিলেন। কালাচাঁদকে তিনিই দোকানের কার্য্যে আনেন। তারপর

তিনি মারা যাবার সময় তিনটি অপোগণ্ড-সহ পত্নীর ভার কালাচাঁদের হাতে দিয়া যান। সুতরাং শ্রীরামদাদা নিজেকে অর্দ্ধেক অংশীদার মনে করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় বোধ হয় কল্পনা করিতেন শ্রীরামকে কিছু দিয়া নিরস্ত করিব। এই-বিষয় লইয়া ভিতরে ভিতরে গোলোযোগ চলিত।

তারপর যখন শ্রীরামদাদা বুঝিলেন কাকা স্ব-ইচ্ছায় বিষয়ের ভাগ দিবেন না, তখন তিনি কৌশলে একদিন ত্রিশহাজার টাকা হস্তগত করিয়া অর্থাৎ পনেরোহাজার টাকা ভদ্রেশ্বর মহাজনের ঘরে জমা দিতে গিয়া, তাহা না দিয়া আরো পনেরো হাজার টাকা লইয়া, এই উভয় টাকাই দোকানের খাতায়—নিজ হাতে—নিজ নামে খরচ লিখিয়া লইলেন। এইদিনে ঘটনাক্রমে জ্যাঠামহাশয় প্রভৃতি অধিকাংশেই বরাহনগর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। এই ঘটনায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু আর কি হইবে, শেষে কয়েকজন ভদ্রলোকের সালিসীদ্বারা শ্রীরামদাদার সাতআনা-রকম স্থির হইল। এই ঘটনার পরই জ্যাঠামহাশয়ের শরীর-মন ভাঙিয়া গেল; তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন।

জ্যাঠামহাশয়ের ধর্ম্মভাব ও অনেক সদ্ব্যয় ছিল—যমুনাতীরে শবদাহের পাকা শশ্মানঘাট তাঁহার অমর কীর্ত্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনভাবের বিকাশ—মাতাঠাকুরাণী ও ভাইদুইটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে সকলকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ছোট ভাইটি ন-দিদির নিকট থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল। সুতরাং বরাহনগরে আমাদের একটি ছোট-খাটো বাসা ঠিকমত রহিয়া গেল।

জ্যাঠামহাশয়ের দোকানের কাজ ত্যাগ করিয়া আমি প্রায় প্রতিদিন বরাহনগর হইতে বড়বাজার যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। ভালো ভালো ফারমে চাকরিও উপস্থিত হইতে লাগিল কিন্তু মনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইল, চাকরি করিব না, অথচ নিজে যে দোকান করিব তাহার উপযুক্ত মূলধনও ছিল না। এ-দিকে প্রায় দুইটি সংসার। তবু মনে হইল একবার চেষ্টা করিয়া দেখি যদি কোনো উপায় হয়, কিন্তু সহজে চাকরি করা হইবে না।

এইভাবে কয়েকমাস কাটিল। ইতিমধ্যে নবীনচন্দ্র পালের সস্নেহ আকর্ষণে 'রামচন্দ্র সেন, মঙ্গলচন্দ্র আশে'র দোকানে দুই মাস চাকরি করি, তাহার ফলে চাকরিতে বিতৃষ্ণাভাব আরো জাগিয়া উঠিল। ইঁহারা বরাহনগরবাসী আত্মীয় ছিলেন।

এই অবস্থার কিছু পূর্ব্বেই খাঁটুরা-নিবাসী ও বরাহনগর-

প্রবাসী ভুবন রক্ষিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত আমার মধ্যম সহোদর উপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কি-এক অজ্ঞাত কারণেই যেন ভুবনবাবুর সঙ্গে কুটুম্বভাবের অতীত এক সৌহৃদ্যভাব হইয়াছিল। জামাতা-বাড়িতে এরূপ নিরভিমানে সর্ব্বদা আসিতে ও মিশিতে বড় দেখা যায় না। আমার মনে ভুবনবাবু চিরশ্রদ্ধেয় হইয়া আছেন। দুঃখের বিষয় বধূটি অধিকদিন জীবিত ছিলেন না।

কিছুদিন চেষ্টা হইল আমরা উভয়ে বড়বাজার পগেয়াপটীতে কাপড়ের দোকান করিব, কিন্তু সুবিধামত ঘর পাওয়া গেল না। তারপর সহসা খাটুরা-নিবাসী রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের সহিত অংশীদার হইয়া চিনির দোকান খোলা হইল। এই সংযোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোম্পানির কার্য্য—এই ফারমের অংশীদার হইলাম আমরা চার ব্যক্তি। রামকৃষ্ণবাবু অবশ্য মূল ধনী কিন্তু অল্পই মূলধনে এই কার্য্য আরম্ভ করা হইল। আমারও অতি অল্প-কিছু (ডিপজিট স্বরূপ) ছিল। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রনাথ দে দুইজনকে কর্ম্মকারক হিসাবে সামান্য অংশীদার করা হয়। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা-পিতৃহীন বালক, আমাদের এক জ্যাঠাইমার দ্বারা প্রতিপালিত হন। তিনি আমার পিতার সহকারী, আমাপেক্ষা দশ-বারো বৎসরের বড় সুদক্ষ কার্য্যকুশল এবং আমার পরমহিতৈষী ছিলেন। মহেন্দ্র দের নিবাস হুগলি, তিনি পরিপক্ক দোকানদার। ১২৮৭ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ এই দোকান খোলা হয়।

দোকান খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিশেষ উন্নতি হইতে থাকে। একবৎসরের মধ্যে এই দোকান বড়বাজার চিনিপটীর মধ্যে একরূপ শ্রেষ্ঠ চিনির আড়ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই দোকানের উন্নতি দেখিয়া তাৎকালীন কোনো সমব্যবসায়ী বলিয়াছিলেন, 'বোধ হয় ইহার মধ্যে কোনরূপ গভীর প্রবঞ্চনা আছে,' কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

প্রায় পাঁচবৎসর আমি এই উন্নতিশীল ফারমের অংশীদার ছিলাম। তারপর আমার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে, দাসের আত্ম-কথার মূলকথা একপ্রকার তাহাই। দোকানের কার্য্যকাল পাঁচবৎসরের মধ্যে অন্তরবাহে যে-সকল বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিয়া তৎপরে পরিবর্ত্তনের কথা বলিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীপুত্রের অবস্থা—১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়ভূষণ বরাহনগর মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে তাহার জননীর স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য (Nervous Debility) প্রকাশ পাইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন তাঁহার বয়স তেরো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে মাত্র। প্রসবান্তে চারদিনের দিন জ্বর হইয়া বিকারে পরিণত হইল এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার জীবনের আশা চলিয়া গেল। তারপর ঈশ্বর-কৃপায় চিকিৎসা এবং শুশ্রূষাদিতে জীবন রক্ষা হইলেও অধিককাল শয্যাগত থাকায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার শক্তি হইল না। চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

চারদিনের শিশুটির প্রতিপালন-ভার শাশুড়ীঠাকুরাণীর উপর পড়িল। তাঁহার ক্রোড়ে ছয়মাসের একটি কন্যা, সুতরাং অপেক্ষাকৃত গাঢ় স্তন্যপানে শিশুর উদরাময় পীড়া হইল। এই অবস্থায় ছয়মাস গত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিতে লাগিল, অথচ মায়াপ্রযুক্ত শিশুটিকে শাশুড়ীমাতা ছাড়িতে চাহেন না।

এইসময় মাসীমাতা গঙ্গাস্নান-উপলক্ষ্যে বরাহনগর আসেন। শাশুড়ীমাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া শিশুটিকে লইয়া মাসীমাতার হস্তে অর্পণ করা হইল। তিনি উহাকে লইয়া দেশে গেলেন, আমিও সেদিন দোকানে আসিলাম।

তারপর বরাহনগরে আসিলেই ন-দিদির মুখে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে নানা সমালোচনা শুনিতে লাগিলাম,—অবশ্য শিশুটিকে লওয়ায় শাশুড়ীমাতার মনে কষ্ট হইয়াছিল, তজ্জন্য কিছু-না-কিছু বলা অসম্ভব নয়, কিন্তু ন-দিদি যতরকম করিয়া যতকথা বলিতে লাগিলেন, তাহা সমস্তই সত্য এবং সম্ভব কি না তাহা ভাবিলাম না। যাহা শুনিতাম তাহাতেই অভিমান ও রাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার ফলে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ— নিমন্ত্রণাদি প্রত্যাখ্যান, অধিকন্তু রুগ্না স্ত্রীর প্রতি তখন যে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা পর পর বলিব।

শাশুড়ীমাতার অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি। দশ-এগারো বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র হরি, সাত-আট বৎসর বয়স্কা মধ্যমা কন্যা মুক্ত, বাকি গুলি শিশু। তা-ছাড়া অন্য পরিজনও কেহ সংসারে ছিলেন না, সুতরাং এ-অবস্থায় তাঁহা দ্বারা তাঁহার রুগ্না কন্যার সম্যক্ সেবা-শুশ্রূষা হওয়া অসম্ভব হইল। দুইবেলা আহারাদি দেওয়া ছাড়া আর বেশীকিছু হইত না।

চিকিৎসা উভয় পক্ষ হইতে ছয় মাসাধিক কাল হইয়াছিল, এবং চিকিৎসকের আদেশেই ঔষধ বন্ধ করা হয়। তাঁহারা বলিলেন, "আজীবন শুশ্রূষার দ্বারাই যথাসম্ভব সুস্থ রাখিতে হইবে।" কিন্তু এখন সেই শুশ্রূষার অভাবে তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। আমার এই আচরণ দেখিয়া শ্বশুরমহাশয় আর কিছু বলিলেন না—বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই অবস্থায় আমার রুগ্না স্ত্রী প্রায় ছয়বৎসরকাল পিত্রালয়ে রহিলেন। আমি একবারও দেখিতাম না। এইসময়ে জ্যাঠা-মহাশয়ের দোকান ত্যাগ, রামকৃষ্ণবাবুর সহিত কার্য্যারম্ভ এবং ক্রমশ আর্থিক উন্নতি হইতেছিল।

ঘনীভূত মোহমেঘ—ইতিমধ্যে ন-দিদি পুনর্ব্বার আমার বিবাহ দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। আমাদের সমাজে একটু বংশমর্য্যাদা অথবা অর্থ থাকিলে একস্ত্রী-সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ হওয়া বিশেষ কঠিন নয়, আমার তো রুগ্না স্ত্রী—কিন্তু ভগবান আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যরূপ ছবি আঁকিতেছিলেন। কত সম্বন্ধের কথা উঠিল, একটিও স্থির হইল না। চারি বৎসরাধিক কাল ব্যাপিয়া ন-দিদির চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

ক্রমে সমস্ত ঘটনার এমন সমাবেশ হইয়া আসিল, যাহাতে আমার পাপ অপরাধের মাত্রা ভারী হইয়া অনুতাপের সূচনা হইল।

প্রথমত দীর্ঘকাল রুগ্না স্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া মনে হইল, ইহা আমার আন্তরিক ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ঘটিতেছে। বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে অন্তঃকরণের যেন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

অনেক রাত্রে দোকান হইতে আসিবার সময় কোনো কোনো দিন শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়া আসিতাম। অন্ধকারে জানালার নিকট পথে দাঁড়াইয়া শুনিতে চেষ্টা করিতাম আমার সম্বন্ধে কোনো কথা হয় কি না। প্রাণ টানিত কর্ত্তব্যের পথে, কিন্তু বাহিরের অবস্থা তাহাতে বাধা দিত। এই এক অশান্তি ঘটিল।

সুরেন্দ্রের সহিত আমি প্রায় সমবয়স্ক ছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বিশেষ বন্ধুতা হইয়া পড়িল। কেন জানি না আমরা উভয়ে উভয়কে অত্যন্ত ভালোবাসিতাম, কিন্তু আমাদের ভালোবাসার বাহ্য আকার ভিন্ন ছিল। আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত সুরেন্দ্রকে চাহিতাম, কিন্তু সে বাহিরে কোনো আগ্রহ দেখাইত না। মধ্যে মধ্যে তাহাকে আমাদের বাড়িতে আনিয়া পায়রা, ছাগলের গাড়ি ইত্যাদি লইয়া খেলা করিতাম এবং একত্রে থাকিতে বড়ই ভালোবাসিতাম। কখনো কখনো নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া অনেক যত্ন করিরাও তাহাকে আনিতে না পারিলে বড় কষ্ট হইত। আমাদের এই খেলা-ধূলা অল্পদিনের জন্যই হইয়াছিল। পরে সুরেন্দ্র যখন শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসে, তখন আমাদেরও অবস্থান্তর ঘটায় আমিও দোকানে আসি।

সুরেন্দ্র ডাক্তারী পাশ করিতে পারে নাই। পড়া শেষ করিয়া কয়েকটি পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করে এবং তাহার প্রচার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এক একস্থানে ডিস্‌পেনসেরীও করিয়াছিল। বালক-প্রিয় সুরেন্দ্রনাথ দুই-তিনটি অনুগত সহকারী বালক পাইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বারো-তেরো বৎসর সুরেন্দ্রের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। আমার ভগিনী ত্রৈলোক্য ব্যস্ত হইয়া কতবার পত্র প্রেরণ এবং আসিবার জন্য কতই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিত কিন্তু বোধ হয় এই দীর্ঘকালের মধ্যে দুই-চারবারের বেশী সে আমাদের বাড়ি আসে নাই।

আমার যখন আভ্যন্তরিক জীবনে অতীব দুর্দ্দিন চলিতেছিল, তেমন দিনে—সম্ভবত ১২৯১ সালের শেষ ভাগে—সহসা সুরেন্দ্র কলিকাতা-বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম; সহসা প্রাণে যেন কেমন একটা সদ্ভাবের উদয় হইল। সুরেন্দ্র যাহাতে দেশে দেশে এমন করিয়া না বেড়ায় তার জন্য আমি পাঁচশত টাকা দিয়া বড়বাজারে ডিস্‌পেনসেরী করিয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে আমার প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। কিন্তু কয়েকমাস বড়বাজারে ক্ষেত্রবাবুর বাড়ির উপর-ঘরে রহিল, এবং কিছুদিনের জন্য আমার ভগিনীকে আনিয়া নিকটে একটি বাসা করিয়াছিল।

প্রেমিকস্বভাব প্রিয়দর্শন সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে কত ভালোবাসিত তাহা সকলসময় বুঝিতে দিত না। সে যেন অত্যন্ত অবাধ্য ছিল—সেইটিই তার স্বভাবের বিশেষত্ব—তেজস্বী—স্বাবলম্বী—স্বাধীনতাপ্রিয়। তার এই ভাবটি কখন্ অজ্ঞাতসারে আমার প্রাণে সংক্রামিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই—বোধ হয় সেই দুর্দ্দিনে—এখন আর দুর্দ্দিন বলিতে পারি না। যখন আমি চতুর্দ্দিকে সংসার-মোহ-পাপ দুর্ব্বলতার অধীনে চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম, সেই শুভদিনে কোথা হইতে সুরেন্দ্র আসিয়া দেখা দিল, তাহাতে আমার প্রাণে কি এক নবভাব—নববলের সঞ্চার হইল।

সুরেন্দ্র কোনোদিন আমার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আগ্রহ করিয়া কোনোকথা বলে নাই,—কথা-প্রসঙ্গে কেশববাবু-সম্বন্ধে দু'এক কথা, কমলকুটীরে ছেলেদের কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে কিম্বা

"নববৃন্দাবন" নাটকাভিনয়, সুরাপান-নিবারণী সভার কথা বোধ হয় কখনো কিছু বলিয়াছিল। কিন্তু কিরূপে যে উপদেষ্টার মত দৈববলে আমাকে চিরদিনের জন্য একটি সত্যের পথে অগ্রসর করিয়াদিল, ইহাই আশ্চর্য্য। এখানে বিধাতার



ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ আশ

মঙ্গলময় হস্ত কার্য্য করিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। সুরেন্দ্রনাথের সেই কমনীয় কান্তি—সেই তেজস্বী মূর্ত্তি আমার হৃদয়-পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত রহিয়াছে।

মধ্য বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভাত—একদিন প্রাতে বরাহনগরের বাড়িতে আমার পেটে একটা বেদনা উপস্থিত হইল। একঘণ্টার মধ্যে এত বেশী হইতে লাগিল যে, ক্রমে অসহ্য বোধ হইয়া উঠিল। বিছানা হইতে নীচের মেঝেতে পড়িয়া এদিক-ওদিক গড়াইতে লাগিলাম। তখন ডাক্তার ডাকা আবশ্যক বোধ হইল। যিনি ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছিলেন তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র কবিরাজ যাইতেছেন, ডাকিব কি?" আমি, বলিলাম "ডাকো"।

মহেন্দ্রবাবুর পিতা সিঁতির হরিশ পাল মহাশয় আমাদের পাড়ায় চিকিৎসা করিতেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এখন মহেন্দ্রবাবুও চিকিৎসায় বেশ বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন। সকলের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট সদ্ভাব—বিশেষত তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন।

মহেন্দ্রবাবু আমার অবস্থা দেখিয়াই বলিলেন, "আতপ চাউল ধোয়া জল একটু পাওয়া যাইবে?" ন-দিদি তখনি নিকটস্থ এক বাড়ি হইতে তাহা আনিয়া দিলেন। মহেন্দ্রবাবু একমোড়া ঔষধ আমাকে সেবন করাইয়া পরমহংস মহাশয়ের কথা বলিতে লাগিলেন। এ-দিকে আমার সেই অসহ্য বেদনাও কমিয়া

আসিল। তিনি আর কয়েকমোড়া ঔষধ দিয়া সেদিনকার মতো চলিয়া গেলেন। পরে বেদনা সম্পূর্ণরূপেই নিবৃত্ত হইল।

তারপর মহেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আমার যখনই



পরমহংস রামকৃষ্ণ

দেখা হইতে লাগিল, তখনই তিনি পরমহংসদেবের ধর্ম্ম এবং তাঁহার মহত্ত্বের কথা আমাকে শুনাইতে লাগিলেন।

তাঁহাকে দেখিতে যাইবার কথাও মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে হইল। তখন তিনি অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় কাশীপুরে এক বাগান-বাড়িতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার তিরোধান হইল। ইহা বাংলা ১২৯২ সালের প্রথমের কথা।

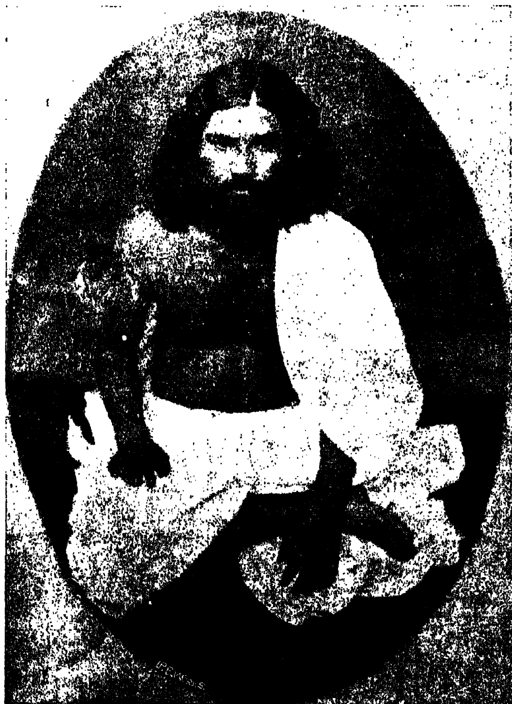
এই ঘটনায় আমার মনে হইল, কোনোরূপ অসহ্য যন্ত্রণা-নিবৃত্তির পর কেমন আরাম বোধ হয়! ইহা তো শারীরিক সম্বন্ধে; কিন্তু মনের অশান্তি দূর হইলে সে আনন্দ আরো কেমন গভীর! অশান্তি দূরের কি কোনো উপায় নাই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে যেন একটু আশার আলোক—উৎসাহ আসিতে লাগিল। কিন্তু কি করিলে মনের অশান্তি দূর হইতে পারে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সংযম--আমার কনিষ্ঠ সহোদর যতীনকে বরাহনগর ইংরাজি স্কুলে পড়ানো হইতেছিল। এইসময়ে নূতন সংস্কারের ভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে এখন হইতে আমাদের বংশের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে।

যতীনের সহপাঠীদিগের মধ্যে মতিলাল চক্রবর্ত্তী অনুগত-ভাবে আমার কিছু প্রিয় হইয়া উঠে। যখন আমার মনে পরিবর্ত্তনের ভাব আসিতেছিল, তখন এই বালক আমাকে সম্মান করিয়া আমার মনে একটা আত্ম-সম্মানের ভাব জাগাইয়া দিল। সহসা মতিলালের মনে এ-ভাব হওয়া যে ভগবানের করুণার নিদর্শন, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

সেইসময়ে আমাদের পাড়ায় ছেলেরা একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছিল। তাহাতে সাহায্য করিতে মতিলাল আমার দৃষ্টি

বাল্যবন্ধু হরিবিহারী সেনের যত্নে আমার একটি ফটো লওয়া হয়। আত্ম-গৌরবার্থে নহে—অবস্থার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপেই তাহা প্রদত্ত হইল।



১২৯২ সাল! ২৫ বৎসর বয়স

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়দর্শন ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়—নিজের নৈতিক জীবনে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় মনে হইল, বাল্যকাল হইতেই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন। এই সময় শুনিলাম, বরাহনগর কুটিঘাটায় একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় (সাণ্ডেস্কুল) আছে। সেখানে প্রতি রবিবারে স্কুলের ছেলেদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যে তথায় যতীনকে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। এই সূত্রে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত এই স্কুলে শিক্ষা দান করিতেন।

বরাহনগরেই ভবনাথ বাবুর বাড়ি। বিধাতা তাঁহাকে সুন্দর-কমণীয়-কান্তি সুপুরুষরূপে সৃজন করিয়া, তাহার উপযুক্ত মনপ্রাণও দিয়াছিলেন। তিনি অতি কোমলহৃদয় বন্ধু-বৎসল প্রিয়দর্শন ছিলেন। শুনিলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। *

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আমাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ন্যায় করিয়া লইলেন। প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে আমাদের বাড়ি হইতে

---

* ভবনাথ বাবুর ফটো অভাবে তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

আমাকে সঙ্গে লইয়া বনহুগলীর কোনো-এক বাগানে গিয়া বসিতেন। সেই সময় কেবল আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। তখন তাঁহাকে আমি আমার মনের অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ কথা বলিয়াছিলাম, যদিও তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু তিনি তখন নিশ্চয়ই আমার মনের সমুদয় অশান্তির ভাব বুঝিয়াছিলেন; তাঁহাকে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে সমস্ত কথা বলিয়াছিলাম। বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাই আমার জন্য তাঁহার প্রাণে অত সহানুভূতির উদয় হইয়াছিল। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা এবং অন্যান্য সাধু মহাত্মাদের কথা বলিয়া আমার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা এই ঘটনা বিধাতার অপার করুণা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

এই সময়েই বরাহনগর অঞ্চলে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জনহিতকর বিবিধ সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। নিয়োগী পাড়ায় তাঁহার নিজ বাড়ির সংলগ্ন "শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটে" লাইব্রেরী, বালিকাবিদ্যালয়, শ্রমজীবিদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয় ছিল এবং প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে তথায় ঈশ্বরোপাসনা হইত। সর্ব্ব প্রথমে ভবনাথ বাবু আমাকে সেখানে লইয়া যান। তখন আমি উপাসনার ভিতরকার ভাবার্থ, তেমন বুঝি নাই, কিন্তু প্রাতঃকাল—স্থানটিও বেশ মনোরম, তারপর শশিপদ বাবুর পুত্র এ্যাল্‌বিয়ান রাজকুমারের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত ব্রহ্মসঙ্গীত এবং উপাসনার কোনো কোনো কথা বেশ ভালো লাগিল। বোধ হয় আরো কয়েকবার ওখানে গিয়াছিলাম।

সেইসময় মুন্সীবাবুদিগের পুরাতন বাড়িতে পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যমণ্ডলী অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভবনাথ বাবু আমাকে সেখানেও লইয়া গেলেন। ত্যাগী যুবকগণকে দেখিয়া বড়ই ভালো লাগিল। নরেন্দ্র, কালী, রাখাল, শরৎ 'মহারাজ' প্রভৃতি তখন তাঁহাদের নাম শুনিয়াছিলাম।

ইহাতে আমার মনে যেন কি-এক নিদ্রিত ভাব জাগিয়া উঠিল। প্রায় প্রতিদিন তথায় যাইতে লাগিলাম। প্রতিদিনই ভবনাথ বাবু উপস্থিত থাকিতেন, সেইসময় তিনি বি-এ পড়িতেছিলেন। আমি ভিতরে সন্ন্যাসীবৃন্দের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতাম, আর তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতাম। ভবনাথ বাবু ও তাঁহার সহপাঠী সত্যবাবু বাহিরের একটি ঘরে বসিয়া পড়িতেন। ঐ বাড়িতে "আত্মোন্নতি বিধায়িণী সভা" ও একটি লাইব্রেরী ছিল।

কিছুদিন সেখানে যাওয়া আসা করিয়া একদিন দেখিলাম, একঘরে সিংহাসনের উপর পরমহংস মহাশয়ের একখানি ছবি ফুলমালায় সজ্জিত রহিয়াছে। এবং উপরে দেওয়াল-গাত্রে লেখা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ" ভবনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই লেখার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি? তিনি ঈষৎ হাসিয়া পরমহংস মহাশয়ের অবতারত্বের আভাস দিলেন। আমি তখন ইহার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মনে মনেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। তারপর অবস্থার পরিবর্ত্তনে ওখানে যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ—ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কাশীপুর মঠে অল্প দিন যাওয়া-আসা করিয়া, তারপর কিন্তু একটা নিরবলম্বন অবস্থার মধ্যে পড়িলাম। প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল—কোথায় যাই, কি করি; কি করিলে প্রাণে শান্তি পাইব, সর্ব্বদা এই চিন্তা চলিতে লাগিল। বুঝিলাম, ভাসা-ভাসা ভাবে কিছু হইবে না। একটা পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হইবে, কিন্তু সে পন্থা যাহা হয় একটা-কিছু হইলেই তো হইবে না, ভাবের সঙ্গে—বিশ্বাসের সঙ্গে এক হওয়া চাই। আমার পক্ষে সে কোন্ পন্থা। প্রচলিত কতরকম ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাই, কতরকম ভাবও দেখিতেছি, কিন্তু ঐ সকল ভাবের সঙ্গে আমার মন মেলে না কেন? আমার মন যাহাতে মিলিবে সে আদর্শ আমি কোথায় পাইব? আমি তো এখন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

একদিকে এই আকুল চিন্তা, তারমধ্যে এক-একবার দোকানে গিয়া কাজে-কর্ম্মে মন দিতে হইত, কিন্তু কাজের টান বড়ই কম হইয়া আসিতে লাগিল; কেবল বন্ধনের টানে যেন টানিয়া লইয়া যাইত। দোকানে গিয়া শান্তি পাইতাম না।

সুরেন্দ্র কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে কিছুদিন তাহার খবর পাইলাম না, তারপর মহেশপুর হইতে তাহার পত্র পাইলাম। যখন প্রাণ বড়ই অস্থির—কি করি কোথায় যাই ভাব, তখন একবার মহেশপুর গেলাম। চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত রেলে গিয়া ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল গো-গাড়িতে যাইতে হইল।

সেখানে গিয়া সুরেন্দ্রের সঙ্গে কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটিল। মহেশপুর গ্রামের অবস্থা ভালো দেখিলাম না, জমিদার-বংশ বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়াছেন ; চরিত্রে কার্য্যে কোনো উন্নতি না থাকায় তাঁহারা অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন। সুরেন্দ্রকে আনিবার জন্যই আমার তথায় যাওয়া, কিন্তু তাহাকে কিছুতেই তখন আনিতে পারিলাম না। নানা কাজের ওজর করিয়া বলিল, 'তুমি যাও, আমি শীঘ্রই তোমার নিকট যাইব।'

মহেশপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দোকানেই কিছু সময় কাটিতে লাগিল। তাহার কারণ দোকানের প্রধান মুহুরী বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেশ সুমিষ্ট স্বরে অনেকটা ভাবের সঙ্গে দাশরথী রায়ের গান গাইতেন। কর্ম্মান্তে প্রতিদিন রাত্রে গান শুনিয়া ভালো ভাবে সময় কাটিয়া যাইত। তারপর কিছুদিন বারোয়ারিতলায় যাত্রা শোনা আরম্ভ করা গেল।

সে সময় মতিরায়, ব্রজরায়, এবং নীলকণ্ঠ প্রভৃতি উদীয়মান যাত্রাওয়ালার দলগুলি নূতন ভাবে, নূতন ধরণে, নূতন সাজে অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রা শুনিতে শুনিতে মনে বেশ ধর্ম্মভাবের উদয় হইত। অনেক সময় অশ্রুপাত হইয়া হৃদয়ে ভক্তি ভাব জাগিয়া উঠিত। যাত্রার বিষয় লইয়া বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হইত, তিনি কুসংস্কার মূলক ব্যাখ্যা করিয়া যাহা বুঝাইতে চাহিতেন, আমার সেভাবে বিশ্বাস হইত না। পৌরাণিক অলৌকিক এবং অবৈজ্ঞানিক বর্ণনার প্রতিবাদ করিতে গেলে বন্ধু রাগিয়া যাইতেন। তাঁহার মন কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল।

এই সময় আমাদের দোকানের কাজ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল,

সুতরাং কর্ম্মচারির সংখ্যাও অনেক ছিল। অনিয়মিতরূপে স্নান আহার এবং পরিশ্রম করা, এই ছিল চিরন্তন প্রথা। আমাদের নিয়ম করা হইল, প্রাতে স্নান করিয়া কিছু জলখাবার খাইয়া সকলে কাজে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থাৎ সকল বিষয়েই সুনিয়ম ও শৃঙ্খলাপূর্ব্বক কার্য্য চালাইবার আমার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। যাহা হউক, আমি ও আমার বন্ধু যোগীন্দ্র মুখুজ্যে প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া নিয়মিতভাবে কাজ কর্ম্ম এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলাম। সে একটা বাহ্যভাবের ব্যাপার কিছুদিন চলিল।

যাত্রা গানের ভিতর দিয়া যেটুকু ভাব-ভক্তি বা আনন্দ লাভ হইতে লাগিল, তাহাতে ঠিক হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। সুতরাং অশান্তি দূরের কোনো উপায় না পাইয়া সর্ব্বদা মন অবসন্ন হইতে লাগিল।

ঠিক স্মরণ হয় না কোন্ সূত্রে এইসময় আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। বোধ হয় মহেশপুরে সদালোচনার মধ্যে মহাপুরুষ-চরিতের কথা শুনিয়া সেই চিন্তা-সূত্রেই কয়েকখানি পুস্তক ক্রয় করিলাম। প্রথমে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্কলিত 'বুদ্ধদেব চরিত' পড়িলাম। রাজপুত্র শাক্যসিংহ, জ্ঞান-ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন—কি সুন্দর দৃশ্য! তারপর কৃষ্ণবাবুরই লিখিত 'মহম্মদ চরিত' পড়িলাম। পিতৃ-মাতৃহীন বালক মহম্মদ, পিতামহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে হইতেই দীন ভাবটি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণে গভীর ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি

জ্বলন্ত ভাব! তারপর চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয়ের 'ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা' পাঠ করিয়া নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যার গর্ব্ব চূর্ণ, গয়ায় গিয়া ভক্তিলাভ, নদীয়ায় ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার—শেষ চৈতন্যের গৃহত্যাগ, বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে আঘাত করিল। তারপর তাঁহারই 'ঈশাচরিতামৃত,' কি চমৎকার বোধ হইল! ঈশার সেই আত্ম-ত্যাগ, প্রেম এবং ক্ষমার ভাব, জগতের দুঃখ পাপ দেখিয়া গভীর ব্যাকুলতা। কি সুন্দর ভাব! কি সুন্দর দৃশ্য! এইসকল জীবন-চরিত পাঠ করিয়া সকলভাবের মধ্যে, প্রত্যেক জীবনের বৈরাগ্য ভাবটিই যেন আমার নিকট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে 'বুদ্ধদেব-চরিত' হইল ভিত্তি স্বরূপ, গৌরাঙ্গ-চরিতের প্রেমোন্মত্ত ভাব আমার চক্ষে তখন তত আকর্ষণের বস্তু হয় নাই, তাঁহার গৃহত্যাগ; 'মহম্মদ-চরিতে' ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, ঈশা-চরিতের কর্ম্ম-যোগ এবং শান্তভাব দেখিয়া মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

পাঠে মনোনিবেশ করিয়া বিষয়কর্ম্মের চিন্তা মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানের উপরে বসিয়া পড়িতাম, নিতান্ত প্রয়োজনে নীচে হইতে ডাক পড়িলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইত। মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসিয়া নির্জ্জনে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও মন তৃপ্ত হইল না, মনের বিক্ষিপ্ত ভাব, ঘুচিল না। কোথায় যাই, কি করি, কি করিলে আকাঙ্ক্ষার বস্তু পাই, এইভাব চলিতে লাগিল।

বুদ্ধদেব-চরিত অভিনয় দর্শন—এইসময় একদিন রাস্তায় প্লাকার্ডে দেখিলাম, ষ্টার থিয়েটারে 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনয় হইবে। ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন ষ্ট্রীটে ছিল। কিন্তু বারাঙ্গণা-সংস্পৃষ্ট থিয়েটারের প্রতি তখন আমার সহানুভূতি ছিল না। আমাদের দেশমান্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় প্রথমে যখন "কুশদহ" সংবাদপত্র বাহির করেন—যে 'কুশদহ' কিছুদিনের পর "ভেরী ও কুশদহ" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে তাহা আমার নামে একখানি করিয়া আসিত। তাহাতে আমি বারাঙ্গণা-সংস্পৃষ্ট থিয়েটারের অপকারিতার বিষয় পাঠ করিয়া থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করি। কিন্তু 'বুদ্ধদেব চরিত' দেখিতে আমার এত প্রবল ইচ্ছা হইল, যে, তাহা সত্ত্বেও আমি দেখিতে গেলাম। সেইদিন আমার পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কি দেখিলাম! যখন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, জীবের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত অন্তরে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনকার সেই দৃশ্য এবং তাঁহার সেই ধ্যাননিরত জীবন—সেই গভীর বৈরাগ্য এবং মৈত্রীভাব, তাঁহার গৃহত্যাগ—কঠোর তপস্যার ভাব দেখিয়া প্রায় সমস্তক্ষণই আমার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এমন দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নাই, এমন সুখ আর কখনো উপভোগ করি নাই; এ যেন কি-এক নেশার মতো আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন করিল। এই ধর্ম্মভাবের নেশায় আর সকল অসার নেশা এমন তুচ্ছ বোধ হয়, তাহা আমি এখন যথার্থ অনুভব করিলাম। তখন প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে বাণী উঠিতে লাগিল—এইতো মানুষ, এই তো মানব-রতন!

রাজপুত্র আজ জ্ঞান-ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আহা! এমন না হইলে কি সেই পরমধন মেলে! এই তো মানব জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

সেইদিনের ভাব আমার মন হইতে আর বিলুপ্ত হইল না; সে দৃশ্য যেন থাকিয়া থাকিয়া আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আবার 'বুদ্ধদেব-চরিত' পুস্তকখানি পড়িলাম। আবার একদিন থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। আমি দেখিলাম, এই 'বুদ্ধদেব-চরিত' কত লোকে দেখিতেছে, কিন্তু হায়! তাহারা কোন্ ভাবে দেখিতেছে? তাহারা যাহা দেখিতে আসে, যে আমোদ সম্ভোগ করিতে আসে তাহাই লইয়া যায়! অভিনয় দেখিয়া, সেদিনও আমার মন কত নূতন নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল। ভাবাবেগে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মন প্রাণ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

ভাবের বিকাশ—এইসময় দোকানের কাজে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িলাম। মন উধাও হইয়া কোথায় গেল! কিছুদিন বাড়িতে আসিয়া রহিলাম। সদর বাড়ির উপর বৈঠকখানায় আশ্রয় লইলাম। মাতাঠাকুরাণী এক একবার আসিয়া কি এক রকম ভাবে যেন আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—স্নান আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেন। এদিকে মনে যখন যে ভাব হইতে লাগিল, তখন সেই ভাবেই বিভোর হইয়া উঠিতাম। রাত্রে অল্প আহার করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহাতে নিদ্রার আবিল কম হইত। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর শরীর মন শান্ত বোধ হইত। প্রশস্ত বারান্দায় গভীর রাত্রে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাদচারণা করিতে করিতে প্রাণে কতই ভাবের সঞ্চার হইত; কখনো হৃদয় মন উৎসাহযুক্ত হইয়া সৎসঙ্কল্পে হৃদয় বদ্ধপরিকর হইয়া, ভাবে চক্ষে জলধারা বহিত। উপাধানে মস্তক রাখিয়া নিস্তব্ধে পড়িয়া থাকিতাম,—উপাধান আর্দ্র হইয়া যাইত। যত চিন্তা যত ভাব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এইটিই ফুটিয়া উঠিল যে, ধর্ম্মের জন্য শাক্যসিংহের ন্যায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

যখন এই সঙ্কল্প নিশ্চয়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম, তখন প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল—উৎসাহে শরীর কণ্টকিত হইয়া পড়িত। আবার যখন ভাবিতাম, আমি কি বাতুল হইয়াছি? আমি কে? কোন্ নরকের কীট, আমি এ কি কল্পনা করিতেছি? সংসার আমাকে ছাড়িবে কেন? তখন হতাশ হইয়া পড়িতাম।

কিছুদিন বাদে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখিলাম। চৈতন্যের গৃহত্যাগ দেখিয়া আবার যেন প্রাণে আর এক তাড়িত-সঞ্চার হইল। তারপর 'ঈশাচরিতামৃত' পুস্তকখানি আবার ভালো করিয়া পড়িলাম। ক্রাইষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি দেখিলাম সে কি ভীষণ দৃশ্য! যীশু-চরিতের ভাবেপ্রাণ অনুপ্রাণিত হইল। তখন হইতে প্রাণে এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল, ধর্ম্মের জন্য আত্ম-সমর্পণ করিতেই হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ত্যাগ-সমস্যা—এইসকল ঘটনা ১২৯২ সালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোম্পানির চিনির আড়তে অংশীদাররূপে কার্য্যারম্ভ করিয়া পাঁচবৎসর মাত্র কার্য্য করি। ইতিমধ্যেই মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন দোকানের কাজে দিন দিন অমনোযোগ ঘটিতে লাগিল, তখন রামকৃষ্ণবাবু কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমার কার্য্যত্যাগে অংশীদারদিগের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া হয় তো ফারমের গোলযোগ ঘটিতে পারে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামকৃষ্ণবাবু পাঁচজনকে লইয়া কাজকর্ম্ম করিতে ভালোবাসিতেন। তিনি সহসা কাহাকেও ছাড়িতে চাহিতেন না, এ সম্বন্ধে তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল। আমি যাহাতে পুনরায় কাজে মনোযোগী হই, তিনি সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমার মনে দোকান ছাড়িবার চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কার্য্যত দোকানে আর মন বসেনা, বাহিরে বাহিরে যেখানে ধর্ম্ম-বন্ধু-সঙ্গ, ভগবৎপ্রেমের মিলন, সেখানেই যাইতে পারিলেই স্বচ্ছন্দে থাকিতাম।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, ভিতর হইতে বুঝিতেছি, বিষয়কর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না—কাজকর্ম্ম আদৌ ভালো লাগে না, সেদিকে একটুও মন

নাই; অথচ এমন-এক বন্ধনে আবদ্ধ আছি, ছাড়িব বলিলেই ছাড়াইতে পারিতেছি না। রামকৃষ্ণবাবু যখন ধীরে ধীরে টানিতেন, তখন দশদিন এড়াইয়া দু'-পাঁচ দিনও আবার কাজে আসিতে বাধ্য হইতাম। সেকয়দিন যে কি অশান্তিতে কাটাইতে হইত, কতবার বিরক্ত হইতাম, কতবার কাজ ছাড়িয়া উপরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য হই।

কিন্তু সেইসময় দু'-একবার মনের অবস্থা এমনও হইয়াছিল 'দূর হোক্ আর পারি না, ও-সকল চিন্তা ছাড়িয়া দি, যেমন কাজকর্ম্ম করিতেছিলাম, তেমনি করি, আর গণ্ডগোলে কাজ নাই,' এই সঙ্কল্প করিয়া কিছুমাত্র কাজে মনোযোগ দিতে পারিতাম না। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত—শরীর কেমন করিত—আমি যেন আর নিজে নিজের বশে থাকিতাম না; তারপর যেমন দোকান হইতে বাহির হইয়া কোনো প্রিয় জনের নিকট গিয়া বসিতাম, প্রাণে যেভাব চলিতেছে, তাহা প্রচার করিতাম, তখনই আবার প্রাণে শান্তি ও বল পাইতাম।

এইরূপ অবস্থায় একদিন যখন কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট্ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে আসিয়াছি, তখন লোকসমাগম দেখিয়া মনে হইল, আজ রবিবার এখন সমাজে উপাসনার সময় হইয়াছে। আমি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বে আর কোনোদিন এখানে আসি নাই; উপাসনা আরম্ভ হইয়া সঙ্গীত হইতেছিল, তার মধ্যে আমার কাণে প্রবেশ করিল,

"যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় কামনা,
স'পিয়ে তনু হৃদয় মন করো তাঁর সাধনা।"

আহা! একি শুনিলাম, এই তো ঠিক কথা! আজ কি আমারই জন্য এই আয়োজন! এই তো বিধাতার ইঙ্গিত!

এই ঘটনায় ঠিক হইয়া গেল, বিষয়-সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতেই হইবে। গোপনে দোকানের খাতায় হিসাব দেখিয়া বুঝিলাম, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত খরচ বাদে আমার অংশে ছয়, সাত হাজার টাকা পাওনা হইবে।

ইতিপূর্ব্বে দণ্ডীদাদা গোবরডাঙ্গায় যে চিনির কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে এই সমস্ত টাকা দিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ চালাইলে, লভ্যাংশ দাদার বলিয়া রাখিয়াও কেবল সুদের টাকায় সংসার চলিবে, তা ছাড়া উপেন্দ্র ও শশীন্দ্র ভাই দুটি কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভগবান এই তো আমাকে তাঁহার পথে যাইবার উপায় করিয়াই রাখিয়াছেন, তবে আর সংসারের জন্য আমার ভাবনা কেন? সংসার কতই চায়, তাহা ভাবিতে গেলে কেহ ভগবানের পথে যাইতে পারে না।

দণ্ডীদাদা—দণ্ডীদাদার সহিত 'দাসের আত্ম-কথা'র বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং কিছু তাঁহার পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক।

শুনিয়াছিলাম ছোট পিসীমাতার শরীর তেমন সুস্থ ও সবল ছিল না, অল্পবয়সে তিনি বালিকা-কন্যা মোক্ষদা আর নিতান্ত শিশু অবস্থায় দণ্ডীদাদাকে রাখিয়া মারা যান। শিশুটিকে পিতামহীঠাকুরাণী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দিদিমাকেই তিনি মায়ের মতো ভাবিতেন, মামার বাড়িই নিজের বাড়ি এবং আমাদিগকে সহোদরের ন্যায় মনে করিতেন।

প্রতাপচন্দ্র পাল পিসেমহাশয় পুনরায় বিবাহ করিয়া বৃদ্ধা মাতা ও বালিকা-কন্যা-সহ খাঁটুরা-পালপাড়ার বাড়িতে ছিলেন, আমি তাঁহাদের দেখিয়াছিলাম। মোক্ষদাদিদির বিবাহ হয়দাদপুরে শ্রীমন্ত আশ মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল। আমার জ্ঞান হইলে তাঁহাকে বিবাহিতা অবস্থায় দেখিয়াছিলাম তাহাই আমার মনে আছে। বোধ হয় বালক অবস্থায় দণ্ডীদাদাও কিছুদিন খাঁটুরার বাড়িতে ছিলেন, তজ্জন্য আমার বাল্যাবস্থায় দাদার বিষয়ে কোনো ধারণা নাই। যখন আমাদের বৈষয়িক অবস্থাবিপর্যয় হইতেছিল, তখন আমার বয়স নয়-দশ বৎসর আর দাদার বিংশাধিক, সেই অবস্থা হইতে দাদার বিষয় আমার মনে ধারণা হইয়াছিল।

পিতামহ উইলে দুই বিধবা পুত্রবধূ এবং শিশু দৌহিত্রের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তদনুসারে দণ্ডীদাদা সাবালক হইলে, পিতা দাদার বিবাহ দিয়া, গোবরডাঙ্গাতেই একখানি একতালা পাকা বাড়ি খরিদ করিয়া দেন এবং চিনির কারখানার মূলধন ইত্যাদিতে অন্যূন পাঁচহাজার টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু "নরানাং মাতুল ক্রমঃ" বাক্য সফল করিতে দণ্ডীদাদা ত্রুটি করেন নাই। অর্থাৎ মাতামহ-প্রদত্ত বিষয় কয়েকবৎসরেই নিঃশেষ করিয়াছিলেন। শেষে বাড়িখানিও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় দণ্ডীদাদা কতকগুলি কু-অভ্যাসের বশীভূত এবং বিলাসী হইয়াছিলেন। তারপর একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া বিধাতার বিধানে তাঁহার সুবুদ্ধি ও সদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। দাদার স্বভাবে এই বিশেষত্বটি আজীবন

অক্ষুণ্ণভাবে দেখা গিয়াছে যে, তিনি পরধনে সম্পূর্ণরূপে নির্লোভ এবং খাঁটী বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন।

দণ্ডীদাদা সাংসারিক জীবনে এক সুশীলা গুণবতী পত্নী পাইয়াছিলেন। হয়দাদপুরে মহাদেব রক্ষিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত দাদার বিবাহ হয়। আমি তখন বালক। আমার বেশ মনে আছে, আমি নিত-বর হইয়া গিয়াছিলাম এবং বিবাহের পরদিন প্রাতে দাদার শ্বশুরবাড়ির সম্মুখে কদমতলায় বড় বড় কদমপাতার পৃষ্ঠে কাঠি বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে বিবাহের বাদ্যভাণ্ডের অনুকরণ করিয়া দাদার বিবাহজনিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলাম। বালিকা নব-বধূ প্রথমে কিছুকাল আমাদের বাড়ি ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কড়ি খেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া আমাদের একটা বিশেষ প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল। তারপর যখন দাদা নূতন বাড়িতে গেলেন, তখন পিসেমহাশয় পালপাড়ার জীর্ণগৃহ হইতে সপরিবারে গোবরডাঙ্গার বাড়িতে আসেন। দাদার পিতামহী তখনও জীবিত ছিলেন। আবার যখন দণ্ডীদাদা গরীব অবস্থায় পালপাড়ার মৃণ্ময় গৃহবাসী হইলেন তখন হইতে অবস্থান্তরের বিচিত্র সুখদুঃখের ভিতর দিয়া বউদিদির সহিত আমার সৌহৃদ্যভাব আরো গভীর হইয়াছিল। তিনি যেন স্বামী অপেক্ষা আমার নিকট সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়া অধিক শান্তি অনুভব করিতেন। অতঃপর ঘটনাগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

সাংসারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যখন এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইলাম। মুক্তভাবের একটা স্বাদ

যেন এইদিন অনুভব করিলাম। এ-প্রলোভন আর ছাড়া যায় না, যত শীঘ্র সম্ভব বিষয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার পথে—তাঁহার প্রেম-সমুদ্রে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এ-জিনিষ কূলে বসিয়া একটু একটু আস্বাদ করিবার জন্য নয়। একেবারে প্রাণ ভরিয়া পান করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গান শোনার পর প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঐ-সমাজে যাইতে লাগিলাম। গানগুলি খুবই ভালো লাগিত। গান শুনিয়া প্রাণে ভাব হইত, একটা বলও পাইতে লাগিলাম। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশও খুব ভালো লাগিত। এইসময় মনে হইল আমার সাধন-পথ কি? বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ভাবে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাঁদিগকে লইয়া, এক-একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কোনোটি তো আমার জন্য বুঝিতেছি না। আমার প্রাণে কেবল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগিতেছিল। এখন সাধনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে মনে জাগিল।

মনের অবস্থা ক্রমশ অগ্রসর হইয়া বিষয়ত্যাগ স্থির হইয়া গেল। তখনো কিন্তু রামকৃষ্ণবাবুকে নিজমুখে কার্য্যত্যাগের কথা বলিতে পারিতেছি না, তিনিও আমার ভাবগতি বুঝিয়াও তবু যেন একেবারে আমার আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় আর এক ঘটনা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শক্তি-সঞ্চার—বাল্যবন্ধু হরিবিহারী সেন ও কালীনাথ রক্ষিত তখন যোড়াসাঁকোতে "সেন ফ্রেণ্ডস" নামে এক 'টেলার সপ' খুলিয়া কার্য্য করিতেছিল। আমার মনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হরিবিহারী খুব আনন্দিত হইয়াছিল, তার সঙ্গে ভালোবাসার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইসময় প্রায় প্রত্যহ হরিবিহারীর দোকানে গিয়া বসিতাম। ক্রমে হরিবিহারীও ভালো দিকে আসিতে লাগিল। সহসা একদিন হরিবিহারী বলিল, "ভাই এক 'বেরুয়া' (উদাসীন) আসিয়াছিলেন, আমরা তো তাঁর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করাইয়া দিব। আর এই দেখ তিনি কি কাগজ না বই রাখিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া হরিবিহারী তিন ফর্ম্মা ছাপা কাগজ আমাকে দিল। আমি দেখিলাম তাহার প্রথম পরিচ্ছেদের হেডিং "প্রথম স্বপ্ন—নির্ব্বেদ," প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি "জীবনপরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্নচতুষ্টয়" নামে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যেটুকু পড়িলাম, তখন যেন সেইটুকুই আমার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রথম স্বপ্ন—নির্ব্বেদ, যার প্রাণে বাস্তবিক নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রাণের ছবিরূপে এই লেখা বাহির হইয়াছে, কে সে বক্তি!

সেদিন আমি দোকানে এলাম। পরদিন অপরাহ্ণে প্রিয়নাথ আমাদের দোকানে উপস্থিত! সঙ্গে হরিবিহারী! সে দেখা-



স্বর্গীয় প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী

শোনা বোধ হয় দশমিনিটের জন্য। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, প্রিয়নাথ আর সেখানে একটুও বিলম্ব করিলেন না, কেবল যেন প্রাণের একটি টান দিয়া চলিয়া গেলেন।

তারপর অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয়নাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। কি মিষ্ট সঙ্গই পাইলাম! প্রতিদিন প্রিয়নাথের নিকট যাওয়া তখনকার প্রধান কাজ হইল।

পরমপ্রিয় প্রিয়নাথ—কলিকাতা সহরে প্রিয়নাথ তখন একরূপ নিরাশ্রয়। শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার মাতুলের একটি ভাড়া-করা ঘরে তিনি কোনোরকমে থাকেন। তার মধ্যে তো আর আমাদের স্থান হয় না। প্রিয়নাথের হৃদয়াকর্ষণী শক্তি দিন-দিন প্রসারলাভ করিতে লাগিল। যিনি একদিন তাঁহার নিকট মন খুলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, সহানুভূতিতে তিনি তাঁহাকেই আপনার করিয়া লইতেন। দিন-দিন প্রিয়নাথের প্রিয়জন-সংখ্যা বাড়িতেই লাগিল। তিনি চারিদিকে পরিচিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্যামবাজারের ঐ সংকীর্ণ গৃহ হইতেই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "জীবন-পরীক্ষা" লেখা আরম্ভ।

তারপর দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে পরলোকগত কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্রের মোহনবাগানস্থিত প্রাসাদের একটি সজ্জিত কক্ষ তৎপুত্র বাবু প্রিয়নাথ মিত্র, প্রিয়নাথের অবস্থিতির জন্য সাদরে ছাড়িয়া দিলেন। আমরা সদলে সেই কক্ষে প্রিয়নাথের প্রিয়-সঙ্গে অনেকসময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু অল্পদিনেই ঐ ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত গৃহে আমাদের কেমন অস্বচ্ছন্দতা বোধ হইতে লাগিল। প্রিয়নাথ ইহা আগেই অনুভব করিয়া বাহির-বাড়ির

একটি ঘরের জন্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামীর ব্যবস্থা তিনি তখন প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। কিন্তু শেষে আমরা বাহির-বাড়ির এক দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আসিলাম।

এইসময় ভ্রাতা উপেন্দ্র বড়বাজারে রামগোপাল রক্ষিত মহাশয়ের দোকানে কার্য্যে প্রবেশ করিয়াই সহসা হাঁপ, কাশী, জ্বর ইত্যাদি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। বলরাম-দে ষ্ট্রীটে বন্ধুবর হরিবিহারী সেনের বাসার তেতলায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া, শুশ্রূষার জন্য গোবরডাঙ্গার বাড়ি হইতে মাতাঠাকুরাণীকে আনা হইল। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রোগীর তত্ত্বাবধান, ঔষধ-পথ্যাদি আহরণ করিয়া দেওয়া এবং দুইবেলা দু'টি আহার করা মাত্র বাসার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ; বাকি সময় প্রিয়নাথের সঙ্গে বেড়াইয়া, রাত্রে বন্ধুগণ মিলিয়া আনন্দেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভ্রাতার পীড়ায় কোনোরূপ দুশ্চিন্তা উদ্‌বেগ আমার মনে আসিতে পারিত না, এমনই সৎসঙ্গে ভুলিয়া থাকিতাম।

আমাদের এইদলের মধ্যে অনেকেই আসিতেন। প্রিয়নাথ প্রত্যেকের বিশেষত্বের দিক্ দিয়া আকর্ষণ করিতেন। আমরা আবার দু-চারিটিতে অনেকটা বেশিরকম মিশিতাম, তার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ একজন। নিঃস্বার্থ প্রেমের এ-ই লক্ষণ যে, ক্রমে তাহা বাড়িতেই থাকে। নগেন আজো সেই নগেন। বস্তুত মানবের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেমই সার বস্তু। মানুষ সঙ্কীর্ণ মায়া-দৃষ্টিতে তাহাকে দেখে। ভক্তগণ প্রেমের মধ্যেই জগজ্জীবন প্রেমময়কে দর্শন করেন।

প্রিয়নাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, নিরুপাধি নিরাশ্রয় হইয়াও

গণ্যমান্য বিদ্বান-পূজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কিসের জন্য, —একমাত্র হৃদয়ভরা প্রেমের জন্য। আমাদের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও সে-প্রেমের বন্ধন একদিনের জন্যও শিথিল হয় নাই। এখন তো প্রিয়নাথ এ জগতে নাই, এখন শরীরমুক্ত আত্মার সঙ্গে মতভেদ কোথায়? এখনো কি তাঁর জাতিভেদ ভাব আছে, শরীরের সঙ্গে শারীরিক ভাব কি লুপ্ত হয় নাই?

প্রিয়নাথের প্রেম কেবল যে আমার সঙ্গে পরিচয়ে আমার প্রতি আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, আমার সম্পর্কে যতদূর গিয়াছিলেন, সকলকেই আপনার জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহারাও কোনোদিন প্রিয়নাথকে ভুলিতে পারেন নাই। প্রিয়নাথের সংস্রবে যাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ, তাঁহার সম্পর্কীয় বা প্রিয়জনবর্গ সকলের সঙ্গে সেই একইভাব আজো আছে। ইহা প্রেমের মোহিনী-শক্তি ছাড়া আর কি বলিব।

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান ২৪ পরগণার রাজপুর জয়নগর গ্রামের অন্তর্গত গোকর্ণী গ্রামে। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শ্যামবাজার স্বর্গীয় মোহনলাল মিত্র মহাশয়দিগের দেবালয়-বাড়িতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে অনধিক আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মবন্ধু প্রিয়নাথ নিজ স্বভাব-সারল্যে আমাকে "দাদা" বলিতেন।

অল্পদিনের মধ্যে বুঝিলাম প্রিয়নাথের ধর্ম্মমত এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যপ্রণালী ভিন্ন, আমার তাহাতে সম্পূর্ণরূপে যোগ

দেওয়া অসম্ভব। তবে তাঁহার জীবনের মূলেও সদুদ্দেশ্য আছে। এইসময় ইহাও বুঝিলাম, কেবল ধর্ম্মভাব লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে কিছু হইবে না। নিজের বিশ্বাস, নিজের আদর্শ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সাধন-ভজন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবে যদি বিধাতার কৃপায় এ-জীবন জনসমাজের কিছু কাজে আসে।

কয়েকমাস প্রিয়নাথের সঙ্গলাভ করিয়া আমার অনেক উপকার হইল—নিদ্রিতভাব অনেকটা জাগিয়া উঠিল। আমাদের ভালোবাসার যোগ চিরদিন অক্ষুণ্ণই ছিল।

আমি যখন ধর্ম্মবন্ধু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে নিবিষ্টভাবে মিশিয়াছিলাম তখনো মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম। প্রিয়নাথ প্রথমেই আমাকে ব্রাহ্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আমাদের এইদলের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আলোচনা খুব হইত। যে-কারণেই হউক প্রিয়নাথের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের প্রভাব অনেক কাজ করিয়াছিল। তাহা তাঁহার "জীবন-পরীক্ষা" গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায়! তিনি তাঁহার গ্রন্থে পুরাতন রক্ষণশীলতার অনুসরণ করিয়াও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় অনেক দিয়াছেন।

তিনি একবার আমাদের দেশে খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসবিকাশ—আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের, মূলে এমন একটি ভাব ছিল, যাহার বিকাশ-পথে যখন যে-বাধা আসিয়াছে তাহাতে তাহার মূলের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। যতই প্রতিকূল ভাবের সঙ্ঘর্ষে গিয়াছি ততই পরিস্ফুট হইয়াছে।

আমার বিশ্বাসের একটি লক্ষণ প্রথমেই দেখা গিয়াছিল, সেটি সংস্কারের ভাব। সামাজিক কিম্বা আধ্যাত্মিক বিষয়, প্রচলিত অনেক মত ও বিশ্বাসে আমার একেবারে অনাস্থা জন্মিল। এ-যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের দ্বারা হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ সেরূপ কোনো পথ তখনো পর্য্যন্ত পাই নাই। যে বিবেকবাণীর দ্বারা আমি সর্ব্বপ্রথমে ভর্ৎসিত হইলাম, সেই বিবেকদ্বারাই স্বভাবত সংস্কারের জ্ঞান পাইলাম। দেখিলাম, যে-পাপ করিয়া আমি আমার নিজ সমাজে নিন্দনীয় নই, বিবেকবিরুদ্ধ কাজে রত থাকিয়াও সমাজে স্থান পাইতেছি। তখনি বুঝিলাম শাস্ত্রে ধর্ম্মের শাসন যাহাই থাক্ না কেন, সমাজের বড়ই পতন হইয়াছে। সুতরাং এ-অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে কখনই শক্তিলাভ করিতে পারিব না। অতএব বিবেকের আদেশানুরূপ পথে চলিতেই হইবে। ভগবানের কৃপায় সে-পথে অগ্রসর হইতে আমার কোনো ভয় বা সঙ্কোচ আসিল না, বরং এমন অদম্য তেজ আসিল যে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না।

সহজজ্ঞানেই বুঝিলাম, অন্যায় পোষণ করিয়া চিত্ত কখনো স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারে না, ধর্ম্মসাধন তো দূরের কথা। অন্ধবিশ্বাসে জনসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সৎসাহস ও মনের বল যেখানে নাই, সেখানে ধর্ম্মের ধ-ও দাঁড়াইতে পারে না। অন্যায় অসত্যের প্রশ্রয় কখনো দেওয়া হইবে না। কোনো সত্বগুণ নাই, নীচতাতে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, উদরান্নের জন্য জঘন্য কার্য্যসকল করিতেছে। তাহারাই ব্রাহ্মণ? এই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ? ব্রাহ্মণের হৃদয় এমনি নীচ? কখনই না। ইহাদিগকে যদি আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রণাম করি, আর আমার ব্রাহ্মণ-আদর্শের যদি কিছু ধারণা থাকে, তবে যে সেই-জ্ঞানকে অবমাননা করা হয়। ইহাতে যে জনসমাজের ভয়ানক অকল্যাণ হইতেছে, আজ যদি অধিকাংশ লোকের চোখ ফোটে তবে কখনই এই মিথ্যা আচরণ সমাজে টিকিবে না। মানুষের গুণেরই আদর করিতে হইবে, সে যে-জাতিই হউক না কেন। যার ভক্তি-বিশ্বাস আছে—ত্যাগ-বৈরাগ্য আছে, জ্ঞান-তপস্যা আছে, সেই নমস্য! এই তো মানবজাতির উন্নতির প্রকৃত পথ। জনসমাজ এখন আত্মসম্মান এবং প্রকৃত গুণের আদর ভুলিয়াছে। দেশের এই প্রকাণ্ড মোহ-নিদ্রা ভঙ্গের জন্য যাঁহারা এইপথে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, সেই মহাকার্য্যে আমারও ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিব। দেশের সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এইরূপে সংস্কারের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজা, এই দুইটিবিষয় প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় মনে হইয়াছিল।

অবিশ্বাস—কোনো বিষয়ে 'হাঁ'বলিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বে একটা 'না' থাকে। কিছু গড়িবার জন্য কিছু ভাঙিবার আবশ্যক হয়। কতকগুলি নূতন বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর কতকগুলি পুরাতন ভ্রান্ত সংস্কার চলিয়া গেল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তখন পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষের সঙ্গে মিশিয়া হয় নাই। পরোক্ষভাবে যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিলাম, আমার এক-স্ত্রী-সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিতে সমাজে কোনো বাধা হয় না। যদিও তিনি রুগ্না ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সুস্থ ছিল। সুতরাং তাঁহার মনোকষ্টের কারণ না হইতে পারে এমন নহে। তথাপি আমি এই কার্য্যে অগ্রসর। আমার চরিত্র থাক-না-থাক, অর্থ থাকিলেই সমাজে আমি প্রতিষ্ঠাবান। যিনি হয়তো সমস্ত জীবন ব্যভিচারে লিপ্ত, ব্যবসায়ে অতি অসৎপথাবলম্বী, তিনিও পূজা-অনুষ্ঠানে এবং দান-খয়রাতে অর্থব্যয় করিয়া সমাজে যশস্বী হন। এইসকল অবস্থা দেখিয়া আমাদের জাতীয় বা হিন্দুসমাজের প্রতি আমার আস্থা একেবারে চলিয়া গেল। অবশ্য দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়া সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াও তো আমি নিজ সমাজে থাকিতে পারিতাম। কিন্তু যেদিকে অধিকাংশের গতি, তাহার বিরুদ্ধে ভিন্ন পথে চলিতে গেলেই তদ্রূপ সৎসঙ্গের প্রয়োজন।

আমি দেখিলাম, শ্রেষ্ঠ জাতির দোহাই দিয়া অযোগ্যের পূজা অবাধে চলিয়াছে। মানুষ মানুষের মাথায় পা দিয়া অযথা প্রভুত্ব করিতেছে। এই অন্যায় আমার নিতান্ত অসহ্য

বোধ হইল। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া সত্যের প্রতি অনুরাগ রক্ষা করা যায় না। যাঁহারা মনে মনে জাতিভেদ মানেন না, অথচ সমাজভয়ে বাহিরে জাতিভেদ রক্ষা করেন, আমি তখন সেই কপট ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত মনে করিলাম। আমার মনে হইল, কেন, কিজন্য আমি এ অন্যায় পোষণ করিব? মানুষমাত্রেই এক মনুষ্যজাতি। সকলের মধ্যেই ভিন্নতা আছে বটে, কিন্তু নির্ব্বিশেষভাবেই গুণ এবং জ্ঞান-ধর্ম্মের আদর করিতে হইবে। তেমনি পাপের প্রতি ঘৃণা করিতে হইবে। তাহার মধ্যে আবার জাতিভেদ কেন? ইহাতে বঙ্গ-সমাজে বাঙালী জাতির এবং সমস্ত ভারতের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে। সমস্ত বঙ্গ– সমস্ত ভারত এক জাতীয়ভাবে একতাবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে কখনই দেশের দুর্গতি ঘুচিবে না। অবাধে মুক্তভাবে মানুষ আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে এত বাধা কেন? এ-সমস্ত মানুষের মোহজাল মাত্র। ঈশ্বর মানুষকে কি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন? অচিরাৎ এই মোহজাল ছিন্ন করিতে হইবে। যাঁহারা এইপথে অগ্রসর, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে।

তারপর আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা মূর্ত্তিপূজা, বলিদান ও তাহার সঙ্গে বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি করিয়া কোনোকালে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। ঐ বিশ্বাসে আরো জড়তা ও কুসংস্কার জন্মায়। কেন-না, উহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে—ধর্ম্মান্ধতা মাত্র।

পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় নিরাকার জ্ঞানময়, চৈতন্যময়, মঙ্গলময়, পবিত্রস্বরূপ, ইচ্ছাময়। তিনি এক হইয়াও বহু হইয়া-

ছেন। ইহাই সৃষ্টির রূপ, সমস্ত সৃষ্টির পরতে পরতে তাঁহারই রূপ-গুণ জড়িত। অন্তরবাহির পূর্ণ করিয়া তিনি আছেন। জ্ঞান-চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে হয়। বহুর মধ্যে তিনি এক, এবং সেই একের মধ্যেই বহু বিদ্যমান। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী এবং পুরুষ-মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা ভ্রম মাত্র। তাঁহাকে কেহ গঠন করিতে পারে না, তিনি আমাদিগকে নিয়ত গঠিত করিতেছেন। তাঁহাকে গঠন না করিয়া নিজেকে তাঁহার হাতে গঠন হইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। এইপথেই জ্ঞান-বিবেক লাভ হয়।

তারপর বলিদান সম্বন্ধে মনে হইল, ইহা একটি নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার। শাস্ত্রের দোহাই দিলে কি হইবে? শান্তচিত্ত হইয়া বিনয় ক্ষমা দয়া ভক্তি গুণ যেখানে সাধন করিতে হইবে, সেখানে পশু হউক আর যাহাই হউক—প্রাণীবধ! এই কি উপাসনার অঙ্গ! এমন আসুরিক সাধন কোন্ সাধকদিগের জন্য? বাহ্যিক পূজার সকলই ভাবুকতা মাত্র। ইহাতে আন্তরিকতা কতটুকু? চরিত্রই বা গড়ে কই? এই তো কতস্থানে দেখিতেছি, দালানে প্রতিমা, বৈঠকখানায় বাই নাচ! কোনো বাধা হয় না। এই কি সাধনার আদর্শ!

তারপর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়েই আমার বিশ্বাস চলিয়া গেল। পৌরাণিক ধর্ম্মে তেমন আস্থা রহিল না। রামায়ণের সীতা, মহাভারতের ব্যাস ও পাণ্ডবগণের অনৈসর্গিক অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্তে এবং অলৌকিক বর্ণনায় অবিশ্বাস হইল। ঐসকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে হইলে জ্ঞানের মস্তকে

পদাঘাত করিতে হয়। শাস্ত্রে যে-টুকু ভালো কথা আছে, তাহার জন্য সমস্তটাই মানিতে হইবে, তার অর্থ কি ?

সহজজ্ঞানে আমার মনে হইল, শাস্ত্রে কোথায় কি আছে তাহা উদ্ধার করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে। আমি প্রত্যক্ষ অনেক সাধক-জীবন দেখিতেছি, তখন কবে কোন যুগে কি হইয়াছিল না হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া আমার কি হইবে ? আর ঐসকল জীবনকাহিনীর অপ্রাকৃত ঘটনায় আমার বিশ্বাস না থাকে—বুঝি বা নাই বুঝি, শাস্ত্রের শাসন মানিলেই আমার ধর্ম্ম হইবে, নচেৎ হইবে না, ইহা কখনো যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। কৌলিক গুরুদেব সাধক, ত্যাগী, ঈশ্বর-পরায়ণ, জ্ঞানী-ভক্ত নাই বা হউন, তিনিই আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, মুক্তিদাতা ; এমন অস্বাভাবিক বিশ্বাস করিতে আমি পারিতেছি না। যেখানে জ্ঞানের স্বাধীনতা নাই, হৃদ্গত বিশ্বাসের কার্য্যক্ষেত্র নাই, সেখানে কোনোদিন জীবন্ত সত্যধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না। আমি ঈশ্বরকে চাই, এই আমার মূলমন্ত্র। তিনিই শাস্ত্র, বিধি, গুরু হইয়া আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিবেন। আমি শাস্ত্র জানি না, শাস্ত্র পড়িয়া ধর্ম্মসাধন করা আমার পক্ষে কোনোদিন সম্ভব নয়। তবে কি আমার ধর্ম্মসাধনের পথ নাই ? যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে ভালো লোক হইলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে অনেকে অনেক দরিদ্র। আধ্যাত্মিক রত্ন অধিক উপার্জ্জিত না হইলে পাপ যায় না। ভালো লোক হওয়া আর নিস্পাপ হওয়া এক কথা নয়। এই যে চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে নিরক্ষর রামকৃষ্ণ-চরিত ; তিনি তো পণ্ডিত

ছিলেন না, তবে কোন বলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মস্তক তাঁহার নিকট নত হইয়াছিল ?

একদিকে যেমন অবিশ্বাস, তার সঙ্গে সঙ্গে সহজজ্ঞানে কতকগুলি বিশ্বাসের বলে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মধ্যে প্রধানত—ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতি, আত্মা স্বাধীন ও নিজ পাপ-অপরাধের জন্য মানুষ নিজে দায়ী। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, মানুষ ঈশ্বর-বাণী শ্রবণ করিতে সমর্থ। জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বরদর্শন সম্ভব—স্বাভাবিক ব্যাপার। জ্ঞান-কর্ম্ম-ইচ্ছাযোগে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের যোগ হয়। তাঁর যোগসম্ভোগই স্বর্গসুখ। স্বর্গ বলিয়া কোনো স্থান, কল্পনা মাত্র; নির্ম্মল চিত্তই স্বর্গ। তদ্রূপ কলুষিত অন্তঃকরণ নরকবিশেষ। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কড়ি উৎসর্গ করিলে কিছুই হয় না, গঙ্গাস্নান করিলে শরীরের মলিনতা যায় কিন্তু মনের যায় না। তীর্থে ঘুরিলে কিছুই হয় না। জ্ঞানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু। বিষয়াসক্তি ছাড়িয়া একমনে একমাত্র পরমেশ্বরের ভজনাতেই সেই জ্ঞান লাভ হয়। আবার জ্ঞানেই বিষয়াসক্তি ও সকলপ্রকার পাপ বিদূরিত হয়। যখন এইসকল তত্ত্বে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তখন প্রাণের অন্তস্থল হইতে এক নবশক্তি জাগিয়া উঠিল। রোমাঞ্চ দেহে প্রাণ, মন, হৃদয়, আত্মা একযোগে বলিল—"হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেবাপরায়ণ লক্ষ্মণচন্দ্র ও উমেশদাদা—স্নেহময় বন্ধু উমেশদাদার কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। উমেশদাদা চিনির কারকানা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মূলধন ছিল না, ছিল কেবল একটি কারখানা-বাড়ি। তাই তিনি কোনো ধনীর সাহায্যে অংশীদার হইয়া ঐ-কারখানার কার্য্য করিতেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার অংশীদারপরিবর্ত্তন হইত। শেষে কোনোসময় তিনি এইকার্য্যে স্বদেশহিতৈষী সদাশয় ধর্ম্মানুরাগী সেবাপরায়ণ ভাবুক ভক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের সাহায্যপ্রার্থী হন। প্রথমে তিনি এ-কাজে সাহায্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, শেষে উমেশদাদা যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক অনুরাগের সহিত একান্তভাবে ধরিলেন, তখন তিনিও উমেশদাদার ভাব-স্বভাব বুঝিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপেই সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণবাবু আমাদের দেশে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। গোবরডাঙ্গার অন্তর্গত হয়দাদপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয় অত্যন্ত নিরীহ শান্তপ্রকৃতি এবং এদেশের গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে, তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত (ক্ষেত্রবাবু কর্ত্তৃক লিখিত) শ্রাদ্ধ-বাসরে পঠিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাবের

বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দান করিবে, বামহস্ত তাহা জানিতে পারিবে না। গোপনে আন্তরিকভাবে বিপন্নের সাহায্য করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র, প্রথম যৌবনে কলিকাতার আহিরিটোলা-বেনেটোলার যুবকদলের সঙ্গে অসৎপথাবলম্বী হইয়া পড়েন। তাঁহার মাতুল ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে বিস্তর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁ ার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হয়। কিছুদিন পরে ভগবানের কৃপায় লক্ষ্মণচন্দ্রের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল; তিনি সমস্ত কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথাবলম্বী হইলেন। ক্রমে নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ যখন মঙ্গলগঞ্জে নিজ জমিদারীর কার্য্যে রত থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছিলেন, সেইসময়ে উমেশদাদা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হন। ইহা বাংলা ১২৯০-৯১ সালের কথা। লক্ষ্মণবাবুর একটি প্রধান ভাব এই ছিল যে, তিনি যখন যে-কার্য্য করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিকতার সহিত সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু অন্তরের সায় না পাইলে তিনি কোনোকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং তিনি যখন উমেশদাদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবেই সে-কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমি সর্ব্বপ্রথমে উমেশদাদার মুখেই লক্ষ্মণচন্দ্রের উচ্চান্তঃ-করণের কথা শুনি, তাহাতেই অল্পে অল্পে তাঁহার দিকে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন যখন আমি রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের

সহিত বড়বাজারে চিনির কার্য্য করিতেছিলাম তখন আর একটি



সেবাপরায়ণ লক্ষ্মণচন্দ্র আশ

ঘটনা হয়। রামকৃষ্ণবাবু লক্ষ্মণবাবুর আত্মীয় ছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ভুবন রক্ষিত মহাশয়; রামকৃষ্ণবাবু এবং লক্ষ্মণবাবু ইঁহারা পরস্পর ভায়েরা-ভাই। সেজন্যও বটে, তা-ছাড়া আমাদের ফারমের কার্য্য ভালো চলিতেছে বলিয়া আমরা ফারমের হিসাবে লক্ষ্মণবাবুর নিকট মরসুমে প্রভূত অর্থ ধার পাইতেছিলাম।

এইসময়ে—অর্থাৎ ১২৯৩ সালের প্রথমে মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয় পরলোকগমন করেন। লক্ষ্মণবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি-অনুসারে হয়দাদপুরের নিজ বাড়িতে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। যেদিন তিনি অশৌচ-বেশে বড়বাজারে (নিজে ব্রাহ্ম হইয়াও) স্বজাতিবর্গের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, সেদিন আমি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আমাদের দোকানে দেখি। সেইসময়ে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আমি শ্রাদ্ধে যাইব।" তারপর আমি দণ্ডীদাদাকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখিতে যাই। কিন্তু যখন আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম, তখন উপাসনাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি সেই অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রটি দেখিয়া কেমন একটি অভিনব পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিলাম। আমরা অল্পক্ষণ তথায় ছিলাম। কেবল দেখিয়া শুনিয়াই চলিয়া আসি।

তার পরই এই ব্রাহ্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক মহান্দোলন উপস্থিত হয়। তাম্বুলীসমাজের এক প্রধান ব্যক্তি—খাঁটুরা-দত্তবাটীর বাবু রাসবিহারী দত্ত মহাশয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, কলিকাতা বরাহনগর এবং খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গার সমগ্র তাম্বুলীসমাজের সকলকে আহ্বান করিয়া এক মহতী সভার অধিবেশন করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিরাট তাম্বুলীসভা—আমি যখন এই সভার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম তখনই সহজে বুঝিলাম এ-সভা প্রধানত ব্রাহ্মবিদ্বেষী সভা, এ-বিদ্বেষের সঙ্গে আমার সহানুভূতি নাই সুতরাং সভায় যাইতে কেমন-একটা অনিচ্ছার ভাব আসিল। তারপর ভিতরে ভিতরে শুনিলাম, যাঁহারা এই শ্রাদ্ধের সংস্রবে ছিলেন বা শ্রাদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন, এমন তাম্বুলীদিগের বিচারও এই সভায় উপস্থিত করা হইবে। ইহাতে আমার দণ্ডীদাদা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন বুঝিলেন এ-সভার প্রতি আমি কিছুমাত্র সন্তুষ্ট নহি, এমন-কি সভায় যাইতেও ইচ্ছা করি না, তখন তিনি নিতান্ত বিপদ গণনা করিতে লাগিলেন। আমি ছোট ভাই বটে, কিন্তু আমার ভাব বুঝিয়া প্রথমে আমাকে সভায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিলেন না।

তারপর যখন সভার দিন নিতান্তই নিকট হইল তখন তিনি একদিন কৌশলে আমাকে একান্ত ধরিয়া বসিলেন যে, "সভায় তোমাকে যাইতেই হইবে, আমরা তো সেখানে কোনোরূপ পান-ভোজন করি নাই, সুতরাং আমাদের ভয় কি? জাতীয় সভায় যাওয়াই কর্ত্তব্য, না গেলে দোষ হইবে।" আমি তখন দাদার সঙ্গে তর্ক করিয়া আমার হৃদয়ের সমগ্র ভাব তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না, অগত্যা আমরা খাঁটুরা-দত্তবাটী তাম্বুলীসভায় গেলাম।

সভার আরম্ভেই বুঝিলাম যে, এখানে আসা আমার পক্ষে ভালো হয় নাই, কেন-না যাঁহারা গুরুতর সম্পর্কের—যাহাদিগকে চিরদিন মান্য করিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা এখানে উপস্থিত, অথচ সভায় যাহা প্রস্তাব হইতে লাগিল, তাহা নিতান্তই আমার ভাবের বিরুদ্ধ।

তখন আমি সহজজ্ঞানে বুঝিয়াছিলাম ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর-পরায়ণ, ধার্ম্মিক লোক, তাঁহারা দেশহিতে রত, এবং পরোপকারে একান্ত প্রবৃত্ত; তাঁহারা যেরূপ আচারানুষ্ঠান করেন, তাহা অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান সমাজের বিরুদ্ধ হইলেও তাহাই সত্য এবং হিতকর সংস্কার, তাহা করাই আবশ্যক, সুতরাং ব্রাহ্মগণের প্রতি বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তখন আমার হৃদয়ের সহানুভূতিই চলিতেছিল; আর এই সভা তাহার বিরোধী, সুতরাং কেমন করিয়া এই সভার কার্য্য আমার ভালো লাগিবে! অথচ তখনো সম্পর্কে ও বয়সে গুরু-স্থানীয় ব্যক্তিগণের দিকে চাহিয়া আমার চক্ষুলজ্জা দূর হয় নাই—কেমন করিয়া এখানে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিব, এই ভাবিয়া একটা অব্যক্ত জড়তা অনুভব করিতে লাগিলাম।

প্রথমে সভায় কথা উঠিল, "আত্মীয়-সম্পর্কের অনুরোধে কেহ পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে পারিবেন না; এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধে আমরা কোনো সহানুভূতি করিব না; ব্রাহ্মদিগের যে একটি বালিকাবিদ্যালয় আছে তাহার স্থান আমরা কোনো বাড়িতে দিব না, তথায় আমরা মেয়ে পাঠাইব না;" ইত্যাদি। একমাত্র বাবু রাসবিহারী দত্ত এইসকল প্রস্তাবকারী; সকলেই বিনা বিচারে

তাঁহার প্রস্তাবে সায় দিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল ও কেমন-একটা অশ্রদ্ধা এবং রাগের ভাবও হইতে লাগিল।

তারপর আমাদিগের বিচার উপস্থিত হইল। প্রথমে আমার ভগিনীপতি সুরেন্দ্রনাথ আশ সম্বন্ধে কথা উঠিল,—তিনি ব্রাহ্ম, শ্বশুরবাড়ি আসেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কেন স্বতন্ত্র হইবেন না? দ্বিতীয়,—যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু এবং দণ্ডীবর পাল তাঁহারা কেন ব্রাহ্ম-শ্রাদ্ধে গমন করিয়াছিলেন? এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্রেই দণ্ডীদাদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতকলেবরে যোড়হস্তে কহিলেন, "মহাশয়গণ, আমরা শ্রাদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু কোনোরূপ পান-ভোজন করি নাই, আর, যদি এই যাওয়াও দশের বিচারে অন্যায় বোধ হয় তজ্জন্য আমি (বা আমরা) ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আর কখনো এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না।"

এই কথাগুলি যখন হইল, তখন আমার আপাদমস্তক হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। দাদা যেমন বসিলেন, আমি অমনি কি-এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমার সকল চক্ষুলজ্জা—জড়তা কাটিয়া গিয়াছে, আমি বলিলাম—"দাদা যাহা বলিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথা, আমি এই সভায় আসিব না স্থির ছিল, কিন্তু কেবল দাদার অনুরোধেই অনিচ্ছাসত্ত্বে এখানে আসিয়া অবধি আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছি; এই সভা ব্রাহ্মবিরোধী সভামাত্র, আপনারা ব্রাহ্মদিগকে যেরূপ মনে করেন, আমি তাহা করি

না, সুতরাং এরূপ সভার সঙ্গে আমার কোনো সহানুভূতি নাই, এখানে আমি কাহারো নিকট বিচারিত হইতে ইচ্ছা করি না, আপনারা আমার সম্বন্ধে যেমন ইচ্ছা বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারেন তাহাতে আমার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, আর আমি এই সভায় ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে ইচ্ছা করি না।" এই বলিয়া আমি সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কয়েকটি লোক আমাকে আর কিছুক্ষণ থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তখন তাঁহাদের সে-কথা রক্ষা করিতে পারি নাই। ধন্য ভগবানের নব লীলা! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা, আর আজ সমাজের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

প্রত্যুৎপন্নমতি বাবু রাসবিহারী দত্ত—বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ জন্মভূমির বক্ষে বসতবাড়িতে বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি-অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করাতে তাম্বুলীসমাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি বাবু রাসবিহারী দত্ত মহাশয় উত্তেজিত হইয়া এক বিরাট তাম্বুলীসভা আহ্বান করেন; এই প্রসঙ্গে রাসবিহারী দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও তিনি রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী হইয়া এই নব ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, তথাপি রাসবিহারীবাবুতে তাম্বুলীসমাজের একজন নেতার ন্যায় যোগ্যতা ছিল। কেবল ধনগৌরবে নয় কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবেও নয় প্রকৃত গুণগ্রামেই তিনি উল্লিখিত সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বিষয়ে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলা আবশ্যক।

বাবু রাসবিহারী দত্ত খাঁটুরা-নিবাসী সুবিখ্যাত স্বর্গীয়

কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র, এবং স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। যে-সময়ের কথা উল্লিখিত



বাবু রাসবিহারী দত্ত

হইয়াছে তখন তাঁহার বয়স ছ-চল্লিশ সাত-চল্লিশ বৎসর মাত্র। সাধারণের নিকট তিনি 'বিহারীবাবু' নামে সম্বোধিত হইতেন।

বহুগুণান্বিত রাসবিহারীবাবুর কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয়, তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। এইটিই তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা খাঁটুরা গ্রামখানিকে তিনি জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য তখনো সকলরকমে দেশের এমন শোচনীয় মৃতকল্প অবস্থা হয় নাই।

তাঁহার সকলকাজে একটি অনুগত যুবকদল নিয়ত তাঁহার সঙ্গী ছিল। সকলবিষয়েই তিনি দলের নেতা ছিলেন। কন্‌সার্ট-পার্টি, ব্যায়াম-শালা, থিয়েটার-পার্টি, অপেরার দল-গঠন প্রভৃতি যখন যে-কাজে তিনি প্রবৃত্ত হইতেন, সমস্ত শরীর-মন অর্পণ করিয়া সে-বিষয় সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ছিল। তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি কোনো-একটি বিষয়ে আসক্ত—জড়িত থাকিতেন না, একটির পর আর একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করিয়া নব-নব শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। একমাত্র আনন্দই ছিল কেবল তাঁহার স্থায়ী ভাব।

রাসবিহারীবাবু বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং চিরদিন তাহার সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া নিজ স্বভাবের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে কোনো সংকীর্ণ ভাব তাঁহার ছিল না। তাঁহার খুল্লতাত স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন প্রভূত ধনশালী

হইয়াছিলেন, তখনো বিহারীবাবুর যে-উদ্যম-আনন্দ-খেলা চলিয়াছিল, আবার যখন তাঁহার তিরোধানে বৈষয়িক অবনতি ঘটিতেছিল, তখনো তিনি দমিয়া যান নাই। চিরদিন আপনার ভাবেই চলিয়াছিলেন। নিতান্ত অর্থাভাব হইলে পত্নীর গায়ের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

তিনি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, প্রথম-বয়সেই এ-টা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি নিজের প্রতিকৃতি নিজেই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। একসময় ছায়াচিত্র-বিদ্যায় (ফোটোগ্রাফী) মনোনিবেশ করিয়া আশ্চর্য্য সফলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজ উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা সকলকাজে হস্তক্ষেপ করিতেন—তাহা সঙ্গীতবিদ্যাই হউক বা শিল্পকলা অথবা যে-কোনোবিষয় হউক-না-কেন, যদিও তাহাতে কিছু অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটিত। কিন্তু সেইটাই ছিল তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

তিনি হিতৈষী পরোপকারী বন্ধুবৎসল সদা-ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি শত্রুকেও ক্ষমা করিতে ক্রটী করিতেন না। তিনি কিছু ক্রোধী ছিলেন, কিন্তু ক্রোধ তাঁহার জাত-ক্রোধে কখনো পরিণত হয় নাই। ক্রোধের কারণ পর্য্যন্ত তিনি সহজেই ভুলিতে পারিতেন। তিনি যে-খুড়ামহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী হইয়া ভয়ানক আন্দোলন করিলেন—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেন; পরবর্ত্তী সময়ে আবার সেই-খুড়ামহাশয়েরই কার্য্যভার অর্থাৎ খাঁটুরা-স্কুলের সম্পাদকতা নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাসবিহারীবাবু নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার অন্তরে শিক্ষানুরাগ ছিল। তাহার বিশেষ পরিচয় তিনি উপরোক্ত কার্য্যের দ্বারা দিয়াছিলেন। যখন বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় শারীরিক অপটুতা বশত আর গোবরডাঙ্গায় আসা-যাওয়া করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন তখন বিহারীবাবুকেই অনুরোধ করিয়া বলেন, "বিহারী, তুমি সর্ব্বদা দেশে থাকো এবং সকলের সঙ্গে তোমার যথেষ্ট সদ্ভাব আছে, তুমি স্কুলের সম্পাদকীয় ভার লইলে ইহার আর্থিক উন্নতি করিয়া স্থায়ী করিতে পারিবে,নচেৎ অর্থাভাবে বোধ হয় স্কুলটি উঠিয়া যাইবে।" তাহাতে বিহারীবাবু বলেন, "খুড়ামহাশয়, আমি স্কুলের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা এবং তত্ত্বাবধানাদি সমস্ত করিব, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টারকে কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না; সম্পাদক আপনাকেই থাকিতে হইবে।' এইভাবে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত স্কুলের উন্নতি করিয়াছিলেন।

এইবার আমার ব্যক্তিগত একবিষয়ে তাঁহার নিরপেক্ষ সমদর্শীতার পরিচয় দিয়া তাঁহার কথা শেষ করিব।

১৩০৭ সালে আমাদের গোবরডাঙ্গার বাড়ি সালিশী দ্বারা বিভাগ করা হয়। সালিশ ছিলেন তিনব্যক্তি। প্রথম গোবর-ডাঙ্গার প্রতিবাসী এবং আমাদের আত্মীয় বাবু রাখালদাস রক্ষিত মহাশয়, দ্বিতীয় দণ্ডীদাদা, তৃতীয় রাসবিহারী বাবু। প্রায় ছয় মাসাধিককাল এই কার্য্যের মধ্যে আমি রাসবিহারীবাবুর সম-দর্শীতার যে-পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা আমার চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বাবু রাসবিহারী দত্ত মহাশয় এত বড় ধনীর ঘরে জন্মিয়াও একেবারে নির্লিপ্ত—সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। তিনি ১৩০৯ সালের ২৮শে ভাদ্র ৫৩ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়,তাঁহার সহধর্ম্মিণী সেইমাসের একাশৌচের মধ্যেই তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন।

দণ্ডীদাদার স্ত্রীবিয়োগ—এখানে দণ্ডীদাদার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কেন-না, এখন তিনি খাঁটুরার বাড়ি ছাড়িয়া আমাদের বাড়িতে একান্নবর্ত্তী হইয়া আছেন এবং চিনির কারখানার কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং এই অবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্ম-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলেন।

যখন তিনি খাঁটুরার বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন, তখনো আমাদের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা কিছুমাত্র কমে নাই। আমাদের বাড়িতে সর্ব্বদা আসা-যাওয়া তো ছিলই, কোনো উপলক্ষ্য হইলেই বৌদিদিও আমাদের বাড়িতে সর্ব্বদা আসা-যাওয়া করিতেন। তখন দণ্ডীদাদার বিমাতা এবং পিতামহী বর্ত্তমান ছিলেন না। কেবল পিসেমহাশয় ছিলেন, এবং এখনও বর্ত্তমান আছেন।

দণ্ডীদাদা নিঃস্ব হইয়াও ব্যবসায় কাজে দক্ষ এবং স্বভাবে বিশ্বাসী থাকায় বড়বাজারে চিনির ফারমে তাঁহার ভালো চাকরীর কখনো অভাব হয় নাই।

১২৮৭ সালের শেষে আমি রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের সহিত কার্য্যারম্ভ করিবার পর সম্ভবত ১২৮৯ সালে খাঁটুরার বাড়িতে দাদার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। প্রথমত বৌদিদির সন্তান হইবার

কোনো সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি একটি কন্যা প্রসব করেন। তিনি যখন গত হইলেন তখন সেটি মাত্র এক বৎসরের।

বৌদিদি ওষ্ঠব্রণ-রোগে কয়েকদিন মাত্র শয্যাগত ছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিয়াছিলাম। এবং গোবরডাঙ্গার বাড়ি হইতে মাসীমাতা আসিয়া সে-কয়েকদিন আমাদের অন্ন-জলের আয়োজন করিয়াছিলেন। যে-মুহূর্ত্তে বৌদিদির প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া গেল তদবস্থায় দাদা আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া যে-প্রকার শোকের প্রথমাবেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে। দেহত্যাগের কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে বৌদিদি আমার হাতে ধরিয়া শিশু-কন্যাটিকে আমার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন।

এই ঘটনার পর দণ্ডীদাদাকে খাঁটুরার বাড়ি হইতে পিসে-মহাশয়-সহ আবার আমাদের বাড়ি আনিয়া কন্যাটির প্রতি-পালনের ভার মাসীমাতার হাতে অর্পণ করা হয়। বিনয় তখন চার বৎসরের। সুতরাং তাহারা ঠিক সহোদর-সহোদরার ন্যায় প্রতি-পালিত হইয়াছিল। কন্যাটির নামকরণ হয় "নারায়ণদাসী"। আমরা তাহাকে 'দাসী' বলিয়াই সম্বোধন করি। বোধ হয় দণ্ডীদাদা এই কন্যার বিবাহ বিষয়ে পরিণাম চিন্তা করিয়াই তাম্বুলীসভার বিচারে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আত্মীয়-বন্ধু বাবু রাখালদাস রক্ষিত—তিনজন সালীশের মধ্যে প্রতিবাসী-আত্মীয় রাখালদাস রক্ষিত মহাশয়ের

নামোল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার বিষয় এখানে কিছু বলিবার আছে, তাহা সংক্ষেপেই বলিব। রাখালবাবু আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আত্মীয়-সম্পর্কে ভগিনীপতি অর্থাৎ স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডু জ্যাঠামহাশয়ের মধ্যম জামাতা ছিলেন। প্রথমাবস্থায় হরিবিহারী, কালীনাথ প্রভৃতির সঙ্গে রাখালবাবুও অল্পদিন আমার কুপথের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তারপর একটি ঘটনা-সূত্রে তাঁহার সে-ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সদ্ভাববিকাশের শুভ-সুযোগ ঘটিল, এই-সূত্রে ভবিষ্যতে তিনি বিশেষ সৎস্বভাব লাভ করিয়াছিলেন। সে-ঘটনার কথাও সংক্ষেপে বলিব।

গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য-পাড়ায় স্বর্গীয় উমাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতার পরম শুভানুধ্যায়ী ভক্তিভাজন ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁহাকে দাদামহাশয়ের ন্যায় মান্য করিতাম। তিনি আজীবন গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবস্থায় সাংসারিক জীবনযাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ-সত্তভাবে তাঁহার অন্তঃকরণ বড় ছিল।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রসরাজ প্রথমে ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া সুযোগক্রমে লাহোরে গিয়া ডাক্তারী পড়েন, এবং যথাসময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। তারপর রসরাজ বাড়ি আসিয়া দেশেই চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু উমাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এবং আমাদের দেশেরও অতীব দুর্ভাগ্যবশত রসরাজ সহসা মারা গেলেন।

রসরাজ অত্যন্ত ধীর সুশীল সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। লাহোরে অবস্থান কালীন তিনি ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ পাইয়া-

ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রগঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন এ-কথা আমি বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার একটি যুবক ডাক্তার-বন্ধু তাঁহাকে দেখিবার জন্য লাহোর হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। এইসকল ঘটনা দাসের নবজীবনলাভের কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

রসরাজ মারা গেলে তাঁহার পরিত্যক্ত হোমিওপ্যাথী ঔষধ ও পুস্তকাদি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সামান্য মূল্যে রাখালবাবুকে বিক্রয় করেন। এদিকে পূর্ব্ব হইতে রাখালবাবুর পক্ষে এমন-এক ঘটনার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল যে, এই ঔষধাদি প্রাপ্তিই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ-পথে বিশেষ অনুকূল হইল।

রাখালবাবুর পিতা স্বর্গীয় দীননাথ রক্ষিত মহাশয়ের নাম তত প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু রাখালবাবুর খুল্লপিতামহ স্বর্গীয় নীলমণি রক্ষিত মহাশয় গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কারণ কতকগুলি গাছ-গাছড়া-ঘটিত 'টোট্‌কা' ঔষধ-পত্র তাঁহার জানা ছিল, তাহা তিনি সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিতেন। "নীলমণি রক্ষিতের তেলপড়া" অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত ছিল, তাহাতে সকলরকম ক্ষত আরোগ্য এবং তাঁহার "জলপড়া"য় অনেক শিশুরোগের প্রতীকার হইত।

নীলমণি রক্ষিত মহাশয় পরলোকগত হইলেও তাঁহার বাড়ির মেয়েরা পর্য্যন্ত ঐ-ঔষধাদি জানিয়া রাখাতে ঔষধ দেওয়া কাজটি তাঁহার চলিয়া আসিয়াছিল। সম্ভবত এই-সূত্রে

রাখালবাবুর কিঞ্চিৎ চিকিৎসানুরাগ জন্মিয়াছিল। সুতরাং ঐ-ঔষধ ও পুস্তক পাইয়া তাঁহার যেন একটা নিদ্রিত ভাব জাগিয়া উঠিল। এ-বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপ্রতিহত ইচ্ছা-শক্তি কখনো খর্ব্ব হয় নাই। নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাঁহার এই ঔষধ-দান কখনো বন্ধ হয় নাই। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। জ্যাঠামহাশয়ের পুত্র শশী ও সত্যভূষণের সাহায্যে কিছুদিন দাতব্য ঔষধালয়ের উন্নতি হইয়াছিল। তার পর তাঁহাদের অবস্থা মন্দ হয়। শশী সত্য উভয়েই নিঃসন্তান, শশী গত হইয়াছেন, সত্য সাধারণ অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছেন; ইঁহাদের কাশীধামে কিছু দেবত্তর বিষয় আছে। ইঁহারা দাসে বয়ঃকনিষ্ঠ। এ-দেশে ব্যবসায়ী শ্রেণীর অনেকেরই অবস্থা হীন হইতেছে।

সাংসারিক জীবনে তিনি অনেকগুলি গুরুতর শোক পাইয়াছিলেন। শেষে জ্যেষ্ঠপুত্র এবং স্ত্রী-বিয়োগেও কিন্তু তাঁহার স্বভাবের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় নাই। রোগে বা শোকে তাঁহার চির-শান্ত ভাব অক্ষুন্নই ছিল। তাঁহার পরোপকার বৃত্তির সঙ্গে তাঁহার স্বভাবে আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহাকে ক্রোধান্বিত হইতে কখনো দেখা যায় নাই। গত ২৩শে অগ্রহায়ণ তিনি দুইপুত্র রাখিয়া তিহাত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে, সর্ব্বসাধারণে 'রাখাল রক্ষিতের ঔষধ' পাওয়া চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার জীবন স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগের শেষ অবস্থা—আমি তাম্বুলী-সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পর রামকৃষ্ণবাবুর মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। তিনি এতদিন আমার জন্য যে শেষ আশাটুকু পোষণ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার শেষ হইয়া গেল। এই ঘটনাতে তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন যে, আমার সঙ্গে তাঁহার আর কাজ-কর্ম্ম চলিতে পারে না। এইবার আমাকে ছাড়িতে হইল।

তারপর একদিন তিনি আমাদের গোবরডাঙ্গার বাড়িতে আসিলেন। অবশ্য আমিও সেদিন বাড়ি ছিলাম। তিনি যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। প্রথমে দণ্ডীদাদাকে মাঝখানে রাখিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া শেষ কথা জানাইলেন, "আর আমি বাবাজীকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, বাবাজী নিতান্তই আমাদের পরিত্যাগ করিলেন," ইত্যাদি। বোধ হয় মাতাঠাকুরাণীও এইসকল কথার মধ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তখন আমি একটু তফাতে বৈঠকখানা-ঘরে ছিলাম। শেষে রামকৃষ্ণবাবু আমার নিকট আসিয়া যেমন দুই-চারিকথা কহিতে লাগিলেন, অমনি আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কি করিব, আমাদ্বারা আর আপনার কাজ হইবে না, তজ্জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন। আজ হইতে আপনার সঙ্গে আমার আর বৈষয়িক সম্বন্ধ রহিল না।"

তাহার পর কিছুদিনের মধ্যে ভাগা-ভাগী সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ করিয়া ফারখৎ লেখাপড়া ও দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। যেদিন কলিকাতা রেজেষ্টারী-আফিসে গিয়া ফারখত দলিলে সহি দিয়া আসিলাম, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। রামকৃষ্ণবাবু, তাঁহার দু'-একটি কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া এবং গৈপুর নিবাসী পরলোকগত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার মহাশয়কে (কারণ তাঁহার সাক্ষাতে সেই লেখা-পড়া হইয়াছিল) সঙ্গে লইয়া রেজেষ্টারী-আফিসে আসিলেন। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রিয়নাথ-দলের আমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। লেখাপড়ার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে রামকৃষ্ণ বাবু আপনার পথে চলিয়া গেলেন। আর আমি ? সেদিনের ভাব কোন্ ভাষায় বলিব ? অনেকদিন হইতে যাহা চাহিতেছিলাম আজ তাহা পাইলাম। আমার আজ বন্ধন টুটিয়া গেল, আমি এখন অভিলষিত পথে স্বাধীনভাবে চলিতে পারিব—আর কোনো বাধা পাইব না, এই কথা ভাবিয়া আজ প্রাণে যে অপার আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে সেই দীন-দয়াল প্রভুর জয়গান করিতে করিতে ধর্ম্মবন্ধু সঙ্গে আমার সে-দিনের গন্তব্য-পথে চলিয়া গেলাম।

প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত—ইতিপূর্ব্বে আমি বাংলাভাষায় যে-সকল মহাপুরুষচরিত এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সরল সহজ কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ উপকার লাভ করি। তাহাতে আমার মনে হয় এইসকল পুস্তক যে পাঠ করিবে তাহারই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। নিজে যতগুলি পুস্তক কিনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে উপযুক্ত পাঠক

বুঝিয়া যার সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইত, তাহাকে পুস্তক পড়িতে দিতাম। এইরূপ বিনা আড়ম্বরে একটি লাইব্রেরীর সূচনা হইল।

ব্রাহ্মসমাজ-সাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয় খাঁটুরা-দত্তবাটী হইতে উঠাইয়া দিলে, আমার মনে হইল, অকারণ কেন স্কুলটি উঠিয়া যায়, গোবরডাঙ্গায় আনিয়া উহা চালাইতে চেষ্টা করা যাক্।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমি যখন লক্ষ্মণবাবু অথবা ক্ষেত্রবাবুদিগের সঙ্গে সহানুভূতি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন তাঁহারা ব্রাহ্ম, কিংবা ব্রাহ্মধর্ম্ম ভালো, এই ভাব আমার মনে হয় নাই। আমার মনে হইয়াছিল, যাঁহারা সত্যানুরাগী দেশহিতৈষী, দেশের লোক যদি তাঁহাদের প্রতি বিরোধী বা শ্রদ্ধাহীন হন, তাহাতে আমি তাঁহাদের সঙ্গে সহানুভূতি করিব না কেন? তাহা হইলে আমি সত্যলাভ করিব কিরূপে? যাহা ঠিক সত্য,—যাহা ভালো তাহার জন্য যদি আমাকে নির্য্যাতন সহিতেও হয় তাহাতে আমার কি হইবে? আমি সত্যের পক্ষ না হইয়া থাকিতে পারি না। আবার তেমনই তাম্বুলীসমাজ ভালো না, এরূপ চিন্তাও আমার মনে হয় নাই। সেজন্য আমি তাম্বুলী-সভা ত্যাগ করি নাই। যখন সেই সভার কার্য্য সত্যের বিরোধী বলিয়া আমার বোধ হইল তখনই তাহাতে আমার আস্থা চলিয়া গেল। যাহাহউক এই সূত্রে বালিকাবিদ্যালয়টি আমাদের বাড়ি আনা হইল, এবং তাহার কার্য্য ভালোই চলিতে লাগিল। কেন-না গোবরডাঙ্গা ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, এখানে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর বালিকার অভাব হইল না।

এই বালিকাবিদ্যালয় গোবরডাঙ্গায় আনা সূত্রে ক্ষেত্রবাবুর সহিত আমার যখন সাক্ষাত হয়; বোধ হয় সেইসময় তিনি আমাকে একটু বিশেষভাবেই দেখিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে কুটুম্ব ভাবের পরিচয় ছিল।

বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক গৈপুর-নিবাসী সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর লাইব্রেরীর ভার দিয়া মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আহিরীটোলায় ২০নং শঙ্কর হালদার লেনে ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এবং উপাসনাদিতে যোগ দিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতাম। এবং লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক-সংগ্রহও করিতাম। এই উদ্‌যোগে রিডিংরুম ও তাহার সঙ্গে একটি লাইব্রেরী আরম্ভ হইল। অনেকেই পুস্তকাদি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য যে কাহারো জীবনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এমন মনে হয় না।

তারপর ঐ-সময় স্বভাবত আর একটি কাজের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার নাম "দাতব্য-ভাণ্ডার"। কিছু দান সংগ্রহ করিয়া তাহা গরীব-দুঃখীদিগকে পাত্র-বিবেচনায় সাহায্য করা হইত। কিন্তু এই সংগ্রহের কার্য্য তখন তেমন সুবিধাজনক-ভাবে চলে নাই; বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ পিতৃশ্রাদ্ধের দান কতক-গুলি বস্ত্র ও তৈজসপত্রাদি এই দাতব্য-ভাণ্ডারে দিয়াছিলেন, তাহাই কিছুদিন ধরিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল। তার পর আমার এই বাহ্যদান-কার্য্য একরূপ চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ভগবান আমাকে দীন-কাঙাল সাজে সাজাইলেন।

৮শম পরিচ্ছেদ

বন্ধুবিয়োগে—উপেন্দ্রের জন্য শ্রাবণ মাস হইতে বলরাম দে ষ্ট্রীটে বাসা লওয়া হয়। যখন পৌষ মাস শেষ হইয়া আসিল তখন উপেন্দ্র অনেক পরিমাণে আরোগ্যোন্মুখ হইয়াছে। এই সময় হঠাৎ একদিন কেন জানি-না আমি গোবরডাঙ্গার বাড়িতে আসিলাম। আসিয়াই শুনিলাম সুরেন্দ্র আসিয়াছে। কিন্তু তাহার জ্বর। উপরে গেলাম।

আমাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র উৎসাহ-উৎফুল্ল-মুখে সহজভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তাহাতে মনে করিলাম বুঝি সামান্য জ্বর হইয়া থাকিবে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বুঝিলাম জ্বর সামান্য নহে—"নিউমোনিয়া"। অবস্থা একটু কঠিন বলিতে হইবে। তখন ভাবিলাম ভালোরকম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। আমাদের চিরসুহৃদ ডাক্তার শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বহুদিন আমাদের সদরবাড়িতে ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি আমাদের আত্মীয় হইয়াছিলেন। দণ্ডীদাদা তাঁহাকে ডাকিয়া সুরেন্দ্রের চিকিৎসা করাইতেছিলেন। শশীবাবু বলিলেন, "ভয় নাই, দুই-তিনটি ঔষধ কলিকাতা হইতে আনিতে পারিলে ভালো হয়।" তাঁহার ব্যবস্থামত আমি কলিকাতায় ঔষধ আনিতে আসিলাম। সর্ব্বাগ্রে ক্ষেত্রবাবুকে সংবাদ দিলাম। তিনি বলিলেন,—"আমি আজই যাইতেছি, সন্ধ্যার পর পৌছিব। তুমি ঔষধ লইয়া আগে যাও।"

যথাসময়ে ক্ষেত্রবাবু আসিলেন। এদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িল, সময়ও আর অধিক পাওয়া গেল না, রাত্রি নয়টার পর আমার কোলে মস্তক রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করিলেন।

যখন সুরেন্দ্রনাথের প্রাণত্যাগ হইল তখন কিছুক্ষণ আমি যেন বিশ্বাসই করিতে পারি নাই যে, তাঁহার এমন হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ ক্ষেত্রবাবুর ভাগিনেয়। বাল্যকাল হইতে সুরেন্দ্রনাথকে তিনি প্রতিপালন করিয়া শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, সে-সময় ক্ষেত্রবাবুর মনে যে-ভাব হইতেছিল তাহাতে তিনি সেই কান্নাকাটির ভিতর কোনো-রকমে আমার ভগিনীকে একটু সান্ত্বনা দিয়া ভগবানের নিকট একটি হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়া সুরেন্দ্রনাথের আত্মার কল্যাণ কামনা করিলেন।

আজ ১২৯৩ সালের ২৯শে পৌষ প্রথম রাত্রিতে আমাদের বাড়ি হইতে সুরেন্দ্র ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। ১২৬৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাত্রিশেষে ক্ষেত্রবাবু খাঁটুরা-ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার সময় আমাকে বলিলেন,—"তুমি কি বৈকালে মন্দিরে যাইবে? সুরেন্দ্রের চিতাভস্ম কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া লইও", আমি বলিলাম "লইয়া যাইব।"

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথের শবদেহ যমুনার শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। যাঁহারা লইয়া গেলেন, তাহার মধ্যে আমার পিসে-মহাশয়, আর একজন সম্পর্কে-কাকা (রামতারণ দে) আর একজন স্বজাতি। আমার তখন স্বভাবত মনে এক নব সংস্কারের ভাব আসিয়াছে, তজ্জন্য প্রচলিত দেশাচার অনুসারে আমার ভগিনীকে

শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়া মুখ-অগ্নি করানো, এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রপাঠ করিয়া শবদেহের সংকার করা, এ-সকল কিছুই করিতে দিলাম না। মনে হইল এ-সকলের প্রয়োজন কি? পবিত্র-মনে পবিত্রভাবে শবদেহে যথোচিতরূপে অগ্নিসংযোগ করা এবং সময়োচিত মনের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করাই প্রকৃত সংকার। আমার আত্মীয়গণ আমার এই কার্য্যে কিছুই বলিতে পারিলেন না। বোধ হয় তাঁহারা মনে করিলেন, সুরেন্দ্র ব্রাহ্ম ছিল তাই তাহার কার্য্য এইরূপেই হইল। তবে মনে মনে কিছু দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

ইহার পূর্ব্বে বন্ধুবিয়োগ-জনিত এমন মনঃক্লেশ আর আমি ভোগ করি নাই; সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদে হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। সে এমন অসময়ে হঠাৎ চলিয়া যাইবে তাহা তো কোনো দিন ভাবি নাই। যাহাহউক অন্তরটা বড়ই খালি হইয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ আমার ভগ্নীপতি, হইতে পারে পার্থিব সম্পর্ক-সূত্রেই সুরেন্দ্রের সঙ্গে আমার ভালোবাসা, কিন্তু তাহার প্রতি আমার ভালোবাসা বাস্তবিক অহেতুকীই ছিল। কেবল তাহাকে ভালোবাসিতেই ভালো লাগিত।

বেলা অবসানকালে এই ভগ্নহৃদয় লইয়া খাঁটুরা-ব্রহ্মমন্দিরে ক্ষেত্রবাবুর নিকট গেলাম। অবশ্য সুরেন্দ্রের দেহাবশেষ ভস্মও সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম।

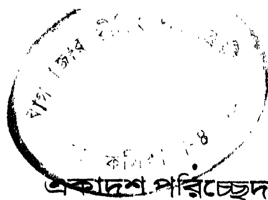
অল্পক্ষণ পরে তিনি উপাসনার আয়োজন করিয়া বলিলেন,—"এখন একটু উপাসনা হইবে, তুমি কি গান করিতে

পার ?” আমি বলিলাম “যাহা দুই-চারিটি অভ্যাস করিতেছি তাহা হইতেই যাহা পারি করিব।” উপাসনার প্রথমে গাইলাম,

“দে মা স্থান শান্তিনিকেতনে ;
মা তোর পুণ্যময় অভয় চরণে।
মাতৃহীন বালকের মত, কাঁদিব আর বল কত,
রোগে শোকে পাপ-প্রলোভনে ; শীঘ্র খোল দ্বার ডাকি গো সঘনে।
হয়েছি নিতান্ত শ্রান্ত, পাপ-ভারে ভারাক্রান্ত,
মতিভ্রান্ত পড়ে ভব-বনে ;—সঙ্গ ছাড়েনি এখনো রিপুগণে।
ডেকে লওগো দয়া করে তোমার ঘরের ভিতরে,
ভক্ত পরিবার-সদনে, রাখ দাস করে তাঁহাদের সনে।”

এই গানের প্রত্যেক কথার ভাব বুঝিয়া যে আমি তখন গান করিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না, অন্তরে অশান্তি অনুভব করিয়াই এই গান গাইলাম, কিন্তু পরে দেখিলাম ভগবান্ আজ আমার মুখ দিয়া আমার প্রকৃত অভাবের কথা · আমাকে তিনি যাহা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিলেন,—“ডেকে লওগো দয়া করে, তোমার ঘরের ভিতরে, ভক্ত পরিবার-সদনে, রাখ ‘দাস’ করে তাঁহাদের সনে।”

এখন মনে হয়, বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার আধ্যাত্মিক যোগ লাভের সূত্রপাত সেইদিন হইল। অথবা ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আমাকে মিলাইয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।



একাদশ পরিচ্ছেদ

সংস্কারক ক্ষেত্রমোহন—প্রসঙ্গক্রমে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের পরিচয় যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তারপর তাঁহার সম্বন্ধে আরো বিশেষ কিছু বলিবার আছে। ধর্ম্মের আদর্শ আমি ইহাই দেখিয়া আসিতেছিলাম যে, অন্তরে যাহাই থাক্ বাহিরে সমাজে দশজনকে মানিয়া দশের মতো চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, অর্থাৎ অন্তরে একরকম বাহিরে অন্যরকম।

যখন ভক্তিভাজন ক্ষেত্রবাবুর মুখে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গে শুনিলাম, "যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা কার্য্যেও করিব, কপটতা একটি মহাপাপ,—ফলাফল গণনা করা অবিশ্বাসের কার্য্য; আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া চলিব; আমাদের কেহ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" এই কথায় আমার মন বিদ্ধ হইল, এই সময় হইতে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধনায় আমার বিশ্বাস জন্মিল। আমার দেশের—আমার আত্মীয় এমন আদর্শ ব্যক্তিকে পাইয়া আমি যেন একটা অবলম্বন পাইলাম। ক্রমশ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। এবার ভক্তিভাবের সঙ্গ পাইলাম।

কুশদহসমাজের অন্তর্গত খাঁটুরাগ্রামে সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারে ১২৪৫ সালের আষাঢ়মাসে, রথযাত্রার দিন ক্ষেত্র-মোহনের জন্ম। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের অগ্রজ খ্যাতনামা স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় বহু পুত্রপৌত্রাদি-বেষ্টিত ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

পাঁচশতবৎসর পূর্ব্বে খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গার তাম্বুলী-শ্রেণী সপ্তগ্রাম হইতে এখানে আসেন, এজন্য এই 'থাকে'র নাম সপ্তগ্রামী। ইঁহারা অনেকেই ঘৃত চিনি সূতা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায়ে ধনশালী ছিলেন। তজ্জন্য ইঁহাদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার তখন প্রয়োজন হইত না। এই দত্ত-পরিবারে কালীকুমারের এক পুত্র স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং বাড়ির অন্যান্য ছেলেদেরও ইংরাজী পড়াইতে ইচ্ছুক হইয়া শিক্ষাকালীন কলিকাতায় অবস্থানের সুবিধার জন্য—তাঁহারই উদ্যোগে আহিরীটোলা শঙ্কর হালদার লেনে একখানি বাড়ি ক্রয় করা হয়।

পাঠশালার শিক্ষাশেষ করিয়া ক্ষেত্রমোহন এবং তাঁহার সমবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তকুমার কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী পড়িলে ছেলে খৃষ্টান হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয় এ-বিষয়ে প্রথমে আপত্তি করেন, কিন্তু তদীয় অগ্রজ কালীকুমার এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হারাণচন্দ্রের উৎসাহবাক্যে অগত্যা তিনি পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি কন্যা সন্তানের পর ক্ষেত্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তজ্জন্য তিনি জীবিতকালের মধ্যে পৌত্র-মুখাবলোকন করিয়া যাইবার মানসে পুত্রের ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইতেই বিবাহ দেন। ঐ গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ভগবতীচরণ দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সপ্তম বর্ষীয়া কুমুদিনীর সহিত ক্ষেত্রমোহনের বিবাহ হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মহাত্মা ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় নিজ হাতে আত্মজীবনীর একখানি পাণ্ডুলিপী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের অনেক গূঢ় কথা অবগত হওয়া যায়।



"কুশদহ" প্রবর্ত্তক

বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত

ক্ষেত্রমোহনের বয়স যখন নয়-দশ বৎসর তখন বৃহৎ দত্ত-পরিবারের মধ্যে কালীকুমার বর্ত্তমানে তাঁহার পাঁচপুত্রের মধ্যে সহসা প্রসন্নকুমার মারা যান। তাহাতে বাড়ির পরিজনবর্গের ক্রন্দন ও গভীর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। কিছুদিন ধরিয়া সে ক্রন্দনের রোল চলিয়াছিল। সে-দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেত্রমোহনের মনে একটি বিশেষ ভাবের উদয় হয়, সে-সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবনীতে বলিতেছেন ;—"মানুষ হইয়া মরিয়া যাওয়ার সময় সকলকে যদি এইরূপ কাঁদাইতে হয় তবে মনুষ্যজন্ম কি কেবল আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইবার জন্য ?" যাঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, আমার যদি এখন মৃত্যু হয় তাঁহারাও তো আমার জন্য এইরূপ হাহাকার করিয়া কাঁদিবেন। যখন তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিবেন না, তখন যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে ভালো হয়। মৃত্যু কেন হইল ? মৃত্যু না হইলেই ভালো ছিল। এই চিন্তা মনের মধ্যে আন্দোলিত হইয়া দুঃখ হইত।"

তারপর হেয়ার স্কুলে উন্নতশ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন তিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজের লিখিত কোনোবিষয় পড়িয়া দেখিতে পান, তাহার মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল ;—"মানুষের মৃত্যু হয় না, শরীর বিনষ্ট হয় ; কিন্তু প্রকৃত মানুষ যে আত্মা তাহা চিরদিন থাকে।" তাহাতে তিনি বলিতেছেন ;—"ইহা পড়িয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল, বাল্যকাল হইতে মৃত্যু দেখিয়া মনে যে-ভয় ও চিন্তা, এবং অমরত্বের জন্য অন্তর্নিহিত যে-এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে-ভয় দূর হইয়া আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। তখন মন বলিয়া উঠিল, ইহাই আমার স্বভাব চায়—

ইহা বিশ্বাস করিয়া আমি সুখী হইব। এইসময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদিতে আত্মার অমরত্বের বিষয় পড়িতে অনুরাগ জন্মিল।"

তারপর আর-একস্থানে তিনি বলিতেছেন ;—"বাধা-বিঘ্নের মধ্যে যখন হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম, তখন সিন্দুরিয়াপটীতে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' সংস্থাপিত হয়। স্কুলে কতকগুলি সমবয়স্ক ছাত্রের মধ্যে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। যেদিন রবিবারে স্কুল খুলিবে সেদিন বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু কালীনাথ দত্তের সহিত বসন্তকুমার ও আমি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে গমন করি। পরে আমাদের মধ্যে 'ব্রাহ্ম আত্মীয়-সভা' (ব্রাহ্ম ইন্টিমেট এসোসিয়েসন্) সংস্থাপিত হয়। তাহাতে নীতি, ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় স্বাধীনভাবে আলোচনা করা হইত। এই সভা হইতে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত প্রথমে "বামাবোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে আমি ও বসন্ত ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করি, পরে উমেশবাবুর হাতে সে-ভার অর্পণ করা হয়।

"কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ও কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে 'সঙ্গত সভা'র সভ্য হইয়া যাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহাদিগের সে-শিক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মতো কেবল বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিত তাহা নহে একেবারে হৃদয়-মন-প্রাণকে উন্নত করিত। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে জ্ঞান লাভ করিতেন এবং সঙ্গতে যে-নীতিশিক্ষা পাইতেন,

তাহা জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দুর্জ্জয় বাধাবিঘ্নের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। 'শির দিয়া আব রোণা ক্যায়া' (মস্তক সমর্পণ করিয়া আবার কান্না কেন ?) সঙ্গতের এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বীরত্বের সহিত সত্যের সংগ্রামে জয় লাভ করিতেন।

তিনি আর একস্থানে বলিতেছেন ;—"সত্যের সহায় ঈশ্বর, আমরা তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া সত্যের সমরে প্রবৃত্ত হইব। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাই পালন করিব। মানুষ আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ফলাফল গণনা করা অবিশ্বাসের কার্য্য।"

মানুষের মনে খাঁটী ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলে সে-মানুষ পরসেবায় রত না হইয়া পারে না। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় সাধু প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার সেইসংস্বভাব বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং খাঁটি বিশ্বাসের ভূমিতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, আবার সেই বিশ্বাসী জীবনের ফলস্বরূপ তিনি আপন ক্ষুদ্রশক্তি স্বদেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আজীবন খাটুরা-বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করিয়া এবং একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ দ্বারা তাঁহার শিক্ষানুরাগ এবং গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রমজীবীদিগের জন্য 'নৈশবিদ্যালয়', গরীব ছাত্র এবং দরিদ্রদিগের জন্য 'দরিদ্রালয়', যুবকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও নীতি-চরিত্র সংগঠনের জন্য 'পুস্তকালয় (লাইব্রেরী) ও সংবাদ-পত্র পাঠের ব্যবস্থা;

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠীতে সাহায্যদান, দেশমত গঠনের জন্য "কুশদহ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রচার; নানা উপায়ে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে "বামা-বোধিনী" পত্রিকা প্রকাশ এবং ছোট ছোট বালিকাদিগের জন্য বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন; ফলত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তিনি সেই অন্তরের একই ভাব ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অতঃপর "কুশদহ" সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, আত্মকথার সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনের আরো যে-সকল সম্বন্ধ আছে তাহা ক্রমশ বলিব।

কুশদহ সংবাদপত্র—বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় সম্ভবত ১২৯১ সালে "কুশদহ" সংবাদপত্র প্রথমত পাক্ষিক আকারে বাহির করেন। উহার নবোদ্যমে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ধর্ম্মবন্ধু বাবু বসন্তকুমার দত্ত মহাশয়। কিছুদিনের মধ্যেই 'কুশদহ' সাপ্তাহিক হয়, কিন্তু সংবাদপত্র পাঠে স্থানীয় অবস্থা অনুকূল না থাকায় বিশেষত ব্রাহ্ম-সম্পাদিত পত্র সাপ্তাহিক কুশদহ (অর্থভাবে নয়—পাঠক অভাবে) অচল অবস্থায় দাঁড়াইল। তারপর ১২৯২ সালের ১৬ই আশ্বিন হইতে 'ভেরী' নামক একখানি কলিকাতার সাধারণ সাপ্তাহিকের সহিত মিলিয়া "ভেরী ও কুশদহ" বাহির হয়। আরো শেষ অবস্থায় 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নামে বাহির হইয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল 'কুশদহ' চলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনের এ-চেষ্টা নিস্ফল হয় নাই। ১৩১৫ সাল হইতে ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত 'দাসে'র পরিচালনায়

যে-মাসিক 'কুশদহ' প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার পথপ্রদর্শক ক্ষেত্রমোহন।

দশ বৎসর দাসের কুশদহ প্রচার এবং তাহার ফলে ১৩২৪ সালের মাঘ মাসে কুশদহ-সমিতির জন্ম; সমিতির প্রবর্ত্তক বেড়গুম-নিবাসী—কলিকাতা ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট-প্রবাসী বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র ডাক্তার নগেন্দ্রনাথের জীবন্ত উদ্যম-উৎসাহ প্রভৃতি বৃত্তান্ত দাসের শেষ অবস্থার ঘটনা, সুতরাং এখানে তাহা বর্ণিত হইবার বিষয় নহে।

কুশদহ বা কুশদ্বীপ—কুশদহ-সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে কুশদহ নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কুশদহ বস্তু কি তাহা না বলিলে সাধারণের পক্ষে বিষয়টি দুর্ব্বোধ থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য কুশদহ নামের পরিচয় বা কুশদহের ঐতিহাসিক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইল।

২৪ পরগণার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে ই, বি, রেলওয়ে ষ্টেশন সন্নিহিত বিখ্যাত গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের ঐতিহাসিক নাম "কুশদহ"। কুশদহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও সরকারি কাগজ-পত্র, সামাজিক ও জনশ্রুতির প্রবাদবাক্যে অনেক মূল তথ্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি "কুশদহ-সমিতি" কর্ত্তৃক গভর্ণমেণ্ট ম্যাপ অনুসারে সংগৃহীত ২৩৮ খানি গ্রাম লইয়া কুশদহের সীমা নির্দ্ধারিত একখানি স্বতন্ত্র মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

কুশদহের পূর্ব্ব নাম কুশদ্বীপ ছিল। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে কুশদ্বীপ নামে নবদ্বীপ রাজ্যের একটি প্রধান নগরের উল্লেখ দেখা-

যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় 'কুশদহ-সমাজ' নামে একটি বড় সমাজ গঠিত হয়। যে-সমাজে ব্রাহ্মণের বাস ছিল চৌদ্দ-শ ঘর।

নব্য ন্যায়মতের স্থাপয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় মিথিলা-নিবাসী বিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র মহাশয়কে যে আত্মপরিচয় প্রদান করেন তাহাতে তিনি আপনাকে—

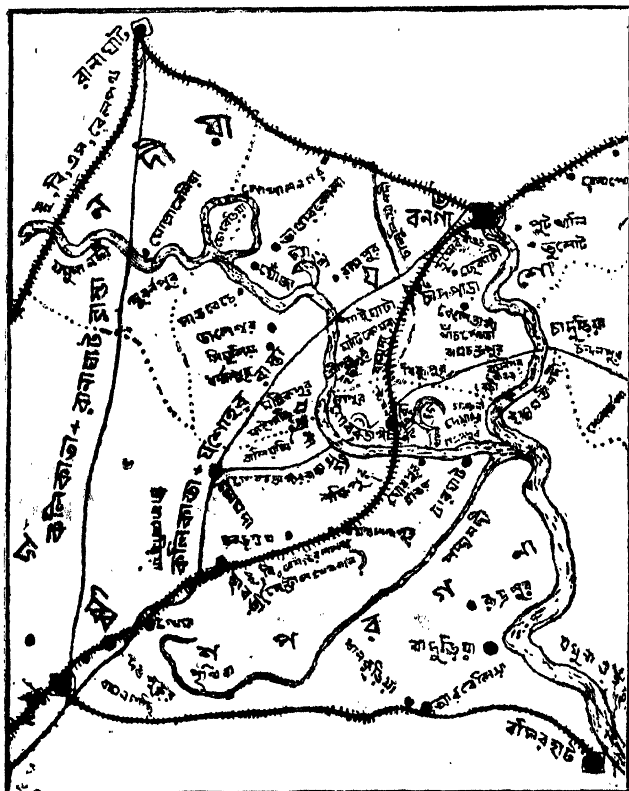
"কুশদ্বীপে মহাদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ
সিদ্ধান্ত তর্কসিদ্ধান্তে শিরোমণি মনীষিনঃ ॥

অর্থাৎ কুশদ্বীপের অন্তর্গত নবদ্বীপ-নিবাসী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কুশদহ নাম কোন্ সময় কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। মাধব সেন ও তাঁহার বংশধরেরা হাজার খৃষ্টাব্দ হইতে দুই শত বৎসরের কিছু বেশী বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপ বারোটি উপদ্বীপে (বারো ভূঁইয়া বিভাগে) বিভক্ত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণবগ্রন্থে কুশদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কুশদহ কুশদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। অথবা পুরাণোক্ত কুশদ্বীপ সম্ভবত মধ্য-এসিয়ার কোনো স্থানকে বলা হইত। হয়ত সমৃদ্ধ কুশদ্বীপ নামের অনুকরণে ইহারও ঐ নামকরণ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বোর্ড-অব-রেভেনিউ নদীয়া জেলাকে ৭২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পরগণার পরিমাণ ফল ও রাজস্ব সংক্রান্ত যে-বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় কুশদহ পরগণার পরিমাণ ফল ১,০৯৪৪৯ অর্থাৎ একলক্ষ সাড়ে নয় হাজার

বর্গ বিঘা, এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৮,৯৮৭৲ অর্থাৎ প্রায় উনিশ হাজার টাকা। ইহাতে চৌবেড়িয়া, সাতবেড়িয়া, ধর্ম্মপুর, জলেশ্বর, মাটকোমরা, ভুলোট, বেড়ী-রামনগর, ইছাপুর, শ্রীপুর,



কুশদহ মানচিত্র

গৈপুর, নাইগাছি, বালিয়ানী, মল্লিকপুর, খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, হয়দাদপুর, গয়েশপুর, ঘোষপুর, চারঘাট, লক্ষ্মীপুর, বেড়গুম প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কুশদহ পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহার অধিকাংশ যশোহর এবং ২৪পরগণার মধ্যে, অল্প অংশ নদীয়ায় অবস্থিত। এ-প্রদেশের মধ্যে কোনো পাহাড় নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ইহা একটি সুজলা সুফলা শ্যামল শস্যক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে নদী খাল বিল জঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আছে। প্রাচীনকালের প্রবলা যমুনা নদীর এখন ক্ষীণধারা দেখা যাইতেছে মাত্র। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়ার নিকট ভাগীরথী হইতে বহির্গত হইয়া বাগেরখালের মধ্য দিয়া পূর্ব্বমুখে সোনাখালি বীরুই চৌবেড়িয়া হইতে গোবরডাঙ্গার নিম্ন দিয়া চারঘাটের পূর্ব্বাংশে ইছামতী নদীর সহিত মিলিয়াছে। যতদিন কুশদহ-মধ্যে প্রবাহিতা যমুনা নদী খরস্রোতা ছিল, ততদিন ইহার ঈদৃশ অবনতি ঘটে নাই। যমুনা নদী মজিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই কুশদহের অবনতি হইয়াছে।

নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, (চাকদহ) এবং কুশদ্বীপের মধ্যে কুশদ্বীপের নামই একসময়ে বিখ্যাত ছিল। যখন সমগ্র হিন্দুস্থান মোগল-সম্রাট আকবর শাহের অধীন—১৫৭৫ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা টোডরমল্ল নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (বর্ত্তমান চৌবেড়িয়া) কায়স্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায়ের সহিত সখ্যতা করেন। রাজা কাশীনাথ

মোগল সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাঠানদিগের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সম্রাট হইতে 'সমরসিংহ' বা সমরশেখর উপাধি লাভ করেন।

কুশদহর মধ্যে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম বিশেষ বিখ্যাত ছিল। ইনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। ইনিই ইছাপুরের চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ। এমন-কি নদীয়া রাজবংশের পূর্ব্বে ইছাপুরের চৌধুরীবংশের খ্যাতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইছাপুর সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্মভূমি নহে। প্রবাদ আছে যশোহর জেলার লাউজানি নামক স্থানে রাজা মুকুট রায়ের একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত রাজ্যের বিধ্বস্তাবস্থায় ঘটনাক্রমে বালক সিদ্ধান্তবাগীশ কুশদহের বিষ্ণুপুর গ্রামে আসেন। তথায় এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত এবং যোগমার্গে অষ্টসিদ্ধিলব্ধ যোগী ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বালক-সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁহার কৃপালাভ করিয়া প্রথমে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, পরে যোগ অভ্যাস করিয়া উক্ত মহাপুরুষের আদেশে সংসারধর্ম্মে প্রবেশ করেন। প্রথমে রাজা কাশীনাথের সাধারণ কর্ম্মচারীরূপে প্রচ্ছন্নভাবেই ছিলেন, তারপর তাঁহার প্রভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কাশীনাথের অন্তে—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য সম্রাট্ আকবরের শেষ জীবনের অতি দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি পুরী

হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর (কাঁচড়াপাড়া) এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের প্রভাবের কথা শুনিয়া তাঁহাকে স্ববশে আনিবার উদ্দেশ্যে একবার মহারাজ সসৈন্যে গোবরডাঙ্গা অঞ্চল আক্রমণ করেন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বিনা-যুদ্ধে যোগপ্রভাব দেখাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। উক্ত ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ গোবরডাঙ্গার পূর্ব্ব-দক্ষিণ-প্রান্তে 'প্রতাপপুর' স্থান খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

জনশ্রুতি-প্রবাদবাক্যে কুশদহর কোনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়। খাঁটুরা গ্রামের পূর্ব্ব সীমানায় 'বাঁমোড়' নামে একটি গোলাকার জলাশয় দেখা যায়, ইহার অপর নাম 'কঙ্কণা' বা 'খাড়ুরা'। মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় স্থানটুকু 'মেদে' বা 'মেদিয়া দ্বীপ' নামে খ্যাত। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐস্থানে রাজা রত্নেশ্বর রায়ের প্রাসাদ ছিল। তৎকালীন বাংলা দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ছিল; শেষে মারহাট্টার (বর্গীর) অত্যাচারে তাহার অধিকাংশ বিধ্বস্ত হয়। রাজা রত্নেশ্বর এইস্থান ত্যাগ করিয়া সপরিবারে জগন্নাথক্ষেত্রে প্রস্থান করেন।

খাঁটুরা ও কঙ্কণা নামের কয়েকটি প্রবাদ-বাক্য শোনা যায়। প্রথমত রাজা রত্নেশ্বরের খোঁয়াড় (গোশালা) এখানে ছিল। খোঁয়াড় হইতে খাঁটুরা। দ্বিতীয়ত তরাব খাঁ নামক জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তির নামানুসারে খাঁ তরাব-খাঁতুরা বা খাঁটুরা। তৃতীয়ত বাঁমোড় জলাশয়টি ঠিক কঙ্কণাকার দেখা যায়. কঙ্কণ

হইতে কঙ্কণা নামই সম্ভবপর মনে হয়। কঙ্কণের অপর নাম 'খাড়ু', খাড়ু হইতে খাড়ুরা—বা খাঁটুরা গ্রামের নাম হইয়াছে।

খাঁটুরা-সন্নিহিত হয়দাদপুর গ্রামের নাম সম্বন্ধে জনশ্রুতি —এখানে পীর হৈদর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির ছিলেন। তাঁহার আস্তানার নিদর্শন এখনো কাছারী-বাড়ির নিকট দেখা যায়। হৈদরের নামানুসারে হদরপুর—বা হয়দাদ-পুর হইয়াছে।

হয়দাদপুরে একটি জমিদারীর কাছারী-বাড়ি আছে। পূর্ব্বে তাহা মুন্সী হবিবল্ হোসেন শার ছিল। গোবরডাঙ্গার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কালীপ্রসন্নবাবুর সহিত মুন্সী হবিবলের বিবাদসূত্রে ভীষণ দাঙ্গা-ফ্যাসাৎ ঘটিয়াছিল। উহা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বকার ঘটনা। কিছুকাল পরে উক্ত জমিদারী বিক্রয় হইয়া যায়। শোনা যায় হবিবল হোসেন ফকিরী লইয়া দেশত্যাগ করেন। তারপর ঐ জমিদারী কলিকাতার পাসী-বাগান-অধিবাসী বসুমল্লিক বাবুরা খরিদ করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ জমিদারী তাঁহাদের ছিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় খরিদ করিয়াছেন।

কুশদহ-প্রবাহিতা যমুনা নদী ব্যতীত আর একটি নদী পূর্ব্বে ছিল। তাহার নাম 'চালুন্দে' অর্থাৎ উহার বিস্তৃতি এরূপ ছিল যে, পরপারে গমনে মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। এজন্য সঙ্গে চাউল ও হাঁড়ী লইতে হইত। প্রবাদ চাউল-হাণ্ডী হইতে চাউল-হাণ্ডে—চালুন্দে নাম হইয়াছিল। এখন উহা চালুন্দের বিলনামে পরিণত হইয়াছে।

তারপর আর একটি প্রবাদ—আছে কুশদহের মধ্যে গোপীপুর বা গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, গোপিল্লীপোতা, কানাই নাট্যশালা—অর্থাৎ কানাই নাটশালপাড়া, ঘোষপুর, গয়েশপুর–অর্থাৎ গবেশপুর, প্রভৃতি গ্রামের নাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বে এখানে কোনো বৈষ্ণব ভাবুক ভক্ত ছিলেন। যিনি যমুনার নীলজলে চালুন্দের শ্বেতবর্ণ জল মিশ্রিত বহুদূর পর্য্যন্ত এক মনোহর দৃশ্য দেখিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন কল্পনা-সূচকভাবে এইস্থানের ঐ সকল নামকরণ করিয়াছিলেন। ফলত নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ কুশদহে অদ্যাপি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

'হরেস্বুড়ীর দ' 'চারঘাট' প্রভৃতি আরো যে-সকল স্থানের এবং মুসলমান পীর-পৈগম্বরদিগের কাহিনী শোনা যায়, বাহুল্য বোধে তাহা উল্লিখিত হইল না।

খাঁটুরা-নিবাসী বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বহু চেষ্টায় কুশদহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া "কুশদ্বীপ-কাহিনী"র ২০০ শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিয়া পরলোকগত হন। বিপিনবাবু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মিয়া দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, শিক্ষার অবস্থায় অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রতিভা থাকিলেও অর্থাভাবে তেমন-কিছু হইতে পারেন নাই। বিপিনবাবু প্রথম যৌবনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অগ্রসর হইতেছিলেন। এমত অবস্থায় কুশদহ-কাহিনী সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। তিনি "সোলজার ওয়াইফ্" ইংরাজী গ্রন্থের একটি অনুবাদ—"সৈনিক সীমন্তিনী"

নামে খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানিও শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

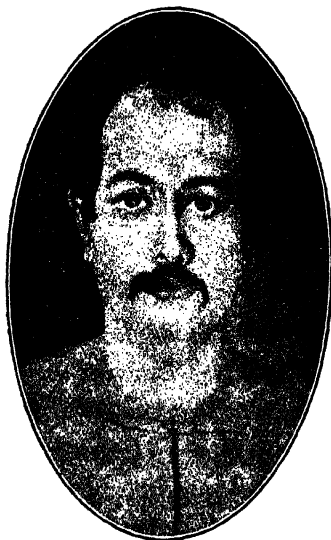
তারপর কুশদহের স্বনামখ্যাত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়—যিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাশীল, তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা এবং সুদক্ষ ব্যবসায়ী—"শ্রী" মার্কা ঘৃত যাঁহার পরিচয়—তিনি নিজ ব্যয়ে তাম্বূলীশ্রেণীর বিবরণসহ "খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ-কাহিনী" পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিয়া ১৩০৮ সালে প্রকাশিত করেন। 'কুশদ্বীপ-কাহিনী'তে অতীত কুশদহের পুরাতন তথ্য অনেক জানা যায়।

যে কুশদহের চৌবেড়িয়া গ্রামে অমর কবি দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম, যে কুশদহের গৈপুর গ্রাম—কুশদহের কৃতী সন্তান স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু (P. N. Bose) মহাশয়ের জন্মভূমি। কথক রামধন শিরোমণি, তৎপুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; কোকিলকণ্ঠ বঙ্গবিশ্রুত ধরণী কথক, তৎপুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, যিনি আধুনিক সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার স্বরূপ এবং বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারের একজন বিশিষ্ট আন্দোলনকারী—ইঁহাদের জন্মভূমি কুশদহের খাঁটুরা গ্রাম।

কুশদহের তাম্বূলীশ্রেণীর স্বর্গীয় অনন্তরাম দত্ত, কালীকুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র দত্ত এবং রামজীবন আশের অতিথিসেবার নিদর্শন বা প্রবাদ আজো বিলুপ্ত হয় নাই। গোবরডাঙ্গার জমিদার মুখোপাধ্যায়-বংশ, দেওয়ান চট্টোপাধ্যায়-বংশ, পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান্ গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য-বংশ এখনো অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছেন।

অতীত কুশদহের কীর্ত্তি-কাহিনীর প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কুশদহবাসী পনেরো আনা লোক 'কুশদহ' নামটি পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। সুতরাং বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় কুশদহ সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা লুপ্ত কুশদহের স্মৃতি জাগরিত করিয়াছেন, এ-কথা একদিন কুশদহবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

প্রজারঞ্জক সারদাপ্রসন্ন—ক্ষেত্রমোহন-প্রসঙ্গ সহ স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লিখিত না



প্রজারঞ্জক সারদাপ্রসন্ন

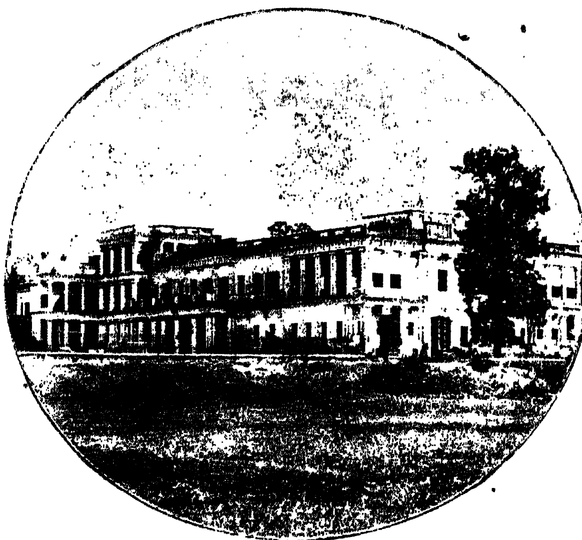
হইলে এ-প্রসঙ্গ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। একদিকে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক-রূপে কুশদহে যেমন বাবু ক্ষেত্রমোহন বিধাতা কর্ত্তৃক 'প্রেরিত'; তদ্রূপ শিক্ষা-বিস্তার এবং জনহিতার্থে আদর্শ জমিদাররূপে সারদাপ্রসন্নবাবুও 'প্রেরিত' হইয়াছিলেন।

সারদাপ্রসন্নবাবু ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৬৯ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পঞ্চত্রিংশ বর্ষ জীবিতকালের মধ্যে বাল্য এবং শিক্ষাকাল ব্যতীত অনধিক পঞ্চদশ বৎসর মাত্র কর্ম্ম-জীবন অনুমিত হয়। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে এতাধিক কর্ম্মময় লক্ষিত হওয়া অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। ইহাই তাঁহার বিশিষ্টতার পরিচয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনেরল্ লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া পত্র লেখেন। তারপর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই ইংরাজী শিক্ষার তরঙ্গ কালীপ্রসন্নবাবুর সময়ে প্রথমে কুশদহে প্রবেশ করে; তারপর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নবাবু পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্নবাবু বালক সারদাপ্রসন্নকে ইংরাজ গৃহশিক্ষক রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। সারদাপ্রসন্নবাবু নিজে শিক্ষিত হইয়াই নিরস্ত ছিলেন না; গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয় তজ্জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুত খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে সে-সময় ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে একমাত্র সারদাপ্রসন্নবাবুই অগ্রণী হইয়াছিলেন।

খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা গ্রামে এখন যেসকল বড় বড় রাস্তা দেখা যাইতেছে অথবা বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপ্যালিটী, এ-সমস্তের মূলে সারদাপ্রসন্নবাবুর হস্ত কার্য্য করিয়াছে - একমাত্র তাঁহারই চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একবার দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ হাজার হাজার লোককে তিনি অন্নদান করিয়াছিলেন। অগ্নিদাহে বা ঝটিকায় গৃহহীন নিঃস্বদিগের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার আতিথেয়তা এতদূর ছিল যে বিদেশী লোকদিগকে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া আহারের জন্য চেষ্টা করিতে হইত না,—বেলা তৃতীয়



গোবরডাঙ্গা—প্রসন্ন ভবন

প্রহর পর্য্যন্ত 'প্রসন্ন-ভবনে' ভোজনশালা খোলা থাকিত। নিজ ব্যয়ে স্কুলগৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বল্পায়ুস্কালের মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে নাই—এখন আর তাহা হইবার আশা নাই।

যে-সকল গুণ থাকিলে লোকরঞ্জক আদর্শ জমিদার হওয়া যায়, বাবু সারদাপ্রসন্নে তাহা ছিল। তাঁহার দানশীলতা প্রভৃতি গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব তাঁহার সহিত বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ প্রসন্নভবন-সন্নিহিত ময়দানে একটি "সূর্য্য-ঘড়ি" (সান্‌ডাইল) নির্ম্মাণ করেন, তাহা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কুশদহের অন্তর্গত চৌবেড়িয়া-নিবাসী অমর কবি স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত সারদাপ্রসন্নবাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। মিত্র-কবি তাঁহার "সুরধনী কাব্যে" লিখিয়াছেন ;—

"দেখিব গোবরডাঙ্গা সারদাপ্রসন্ন,
ধনশালী তমোহীন বন্ধুতাসম্পন্ন ;
পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী,
স্বভাবে সাবিত্রী কিংবা সীতা বিম্বাধরী।"

প্রজারঞ্জক সারদাপ্রসন্নবাবুর পরলোকগমন কালে তদীয় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ক্ষেত্রমণি দেবীর বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর মাত্র ছিল। ইতিমধ্যে তিনি আট-নয়টি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। বৈধব্য অবস্থায় তিনি অন্ন ত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল সেই কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

১৩২৪ সালের ২৬শে চৈত্র কাশীধামে তিনি প্রায় আটাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এই সাধ্বী নারীর পুণ্যস্মৃতি গোবরডাঙ্গা জমিদার-পরিবারে এবং কুশদহে স্মরণীয় বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

রায় বাহাদুর গিরিজাপ্রসন্ন—সারদাপ্রসন্নবাবুর অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার সম্পত্তি যখন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের অধীন, তখন বড়বাবু গিরিজাপ্রসন্ন ও মেজোবাবু অন্নদাপ্রসন্নের বয়স চৌদ্দ ও



বড়বাবু—গিরিজাপ্রসন্ন

বারো। তাঁহাদের ডাকনাম ছিল শশী ও ভূষণ। ইঁহারা তখন মাণিকতলার ওয়ার্ডে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসিয়া তাঁহারা যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন তখন আমিও গোবরডাঙ্গা-স্কুলের ছাত্রাবস্থার বালক।

আমার ঘোড়ায় চড়ার আবদারে পিতা আমাকে একটা ছোট্ট গুজরাটী 'পনী' বাচ্চা-ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। বেলগাছিয়ার বাগানে থাকিতে দম্‌দম্‌-রোডে প্রথমে ঐ-ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করি। তারপর পরিপক্ক অবস্থায় বাড়ি আসিয়া ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া অল্পদিন বেড়াইয়াছিলাম। তদবস্থায় সর্ব্বপ্রথমে বড় বাবু, মেজোবাবু ও তাঁহাদের সম্পর্কীয় আরো কয়েকটি বালকের সহিত যোগাযোগ ঘটে—একথা পূর্ব্বে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। ফলত সেই ক্ষণস্থায়ী অবস্থার পরিণতিকালেও গিরিজাপ্রসন্নবাবু আমার প্রতি আন্তরিক সদ্ভাব পোষণ করিতেন তাহার পরিচয় সময় সময় পাইয়াছিলাম।

"কুশদহ" পত্রিকা প্রচারকালীন একসময় গিরিজাপ্রসন্ন-বাবুর সহিত স্থানীয় বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু কথাবার্ত্তা হয়; সে-দিন সঙ্গে ছিলেন কুশদহ-বৃত্তান্ত-লেখক ইছাপুর-নিবাসী বন্ধুবর পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। নিউনিসিপ্যালিটী—রাস্তা-ঘাট তৈরী বিষয়ে এবং গোবরডাঙ্গা স্কুল বা স্কুল-কমিটী প্রভৃতি সাধারণের কাজে তিনি সাধারণের মতামত গ্রহণ না করিয়া স্ব-ইচ্ছামত যে-ভাবে কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণে যে অভিযোগের ভাব পোষণ করে তাহা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও উষ্ণভাব প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে মিষ্ট ভাষায় সে সমস্ত অভিযোগের এমন সদুত্তর দিয়াছিলেন যে, তাহা অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে। ফলত গিরিজাপ্রসন্নবাবু অত্যন্ত মিষ্টভাষী ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার আর একটি মহৎ গুণ এই ছিল যে, তিনি ম্যালেরিয়া-

পূর্ণ দেশে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে আজীবন রত ছিলেন। তাঁহাতে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদার হিতৈষণার অংশও বিদ্যমান ছিল। ১৩২৫ সালের ১১ই আষাঢ় প্রায় বাষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।



মেজোবাবু—অন্নদাপ্রসন্ন

মেজোবাবু অন্নদাপ্রসন্ন ঈশ্বর-কৃপায় এখনো বর্ত্তমান আছেন। তিনি অনেকদিন হইতে বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে শান্তভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং স্ত্রীবিয়োগ-জনিত শোক-দুঃখের ভাব অন্তরে যাহাই থাক্ বাহিরে তাহাতে তাঁহাকে তেমন ক্লিষ্ট দেখা যায় না।

আমাদের পরস্পরের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তবুও এখনো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে আমাদের সেই বাল্যস্মৃতি মনে হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—ক্ষেত্রমোহন এবং সারদাপ্রসন্ন-



পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

সহ স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও কুশদহ-সমাজে নবযুগের অন্যতম সংস্কারকরূপে সমাসীন ছিলেন। পরন্তু কুশদহ-শিরো-

ভূষণ পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামধন শিরোমণি মহাশয়ের পুত্ররূপে পাণ্ডিত্যগৌরবেও তিনি তাঁহার ততোধিক উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল।

বিদ্যারত্ন মহাশয়, শিরোমণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। এ-পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে যাহা-কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কুশদহ-কাহিনী পুস্তকে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী মধ্যে) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্যান্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া যথাসম্ভব "দাসের আত্মকথা'য় যে-কাল নিরূপিত হইল তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না। তাহা পরে বলিতেছি।

শ্রীশচন্দ্র খাঁটুরার বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বাল্যে নিজ গ্রামে ভগবান বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি কিছু পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের শিরোভূষণ এবং শিক্ষা-বিভাগে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী, তখন কলেজের বিশেষ উন্নতির অবস্থা। স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি যখন ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, শ্রীশচন্দ্র সেই সময়ের একজন প্রধান ছাত্র।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কেবল সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি ইংরাজী ভাষাতে শিক্ষিত হইয়া একদিকে যেমন তাঁহার মনের প্রচলিত ও প্রাচীন কু-সংস্কারমুক্ত হইয়াছিলেন—যাহা কেবল সংস্কৃতজ্ঞগণের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, তেমনি তিনি

গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া কিছু-কাল অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। একসময় তাঁহারই যত্নে ২৪ পরগণাস্থ খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম-সমূহ বসিরহাট মহকুমা হইতে বারাসাত মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং অদ্যাপি তাহাই চলিতেছে; ইহাতে অত্রস্থ অধিবাসী-গণের পক্ষে বিশেষ একটি অসুবিধা দূর হইয়াছে। খাঁটুরা মধ্যবঙ্গ (বর্ত্তমান মধ্য-ইংরাজী) বিদ্যালয় তাঁহার চেষ্টায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকম্পায় গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত হয়। শ্রীশবাবু একসময় গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য করিতে পারেন নাই।

শ্রীশবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেমন একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন, তেমনি তাঁহার একজন স্নেহভাজন বন্ধুও ছিলেন। তাঁহার আকর্ষণে তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিধি কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশবাবুই তাঁহার সহায় হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বিধবা-বিবাহ করেন। ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাবু জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমতী কালীমতী দেবীর সহিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিবাহ হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং মহা সমারোহে কার্য্য সম্পাদিত হয়।

তাঁহার সংস্কৃত রচনা অত্যন্ত সরল ও শ্রুতিমধুর ছিল। শেষ জীবনে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে বাঁমড়-তীরে যে-ঘাট ও মন্দিরাদি

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি সংলগ্ন রহিয়াছে ;—

"শাকে শশাঙ্ক শৈলেন্দৌ খারূঢ়াকঙ্কণা তটে
তীর্থং সূর্য্যমণির্দ্দেবী নির্ম্মমে শ্রীসূরিদং।"

"পঞ্চনব সপ্তশশী সংখ্য শকহায়ণে
ঘট্টতট তোরণ সুশোভি মঠ যুগ্মকে
সূর্য্যমণিরগ্রজনুঃ রামধন গেহিণী
শ্রীশজননীশ যুগমত্র সমতিষ্ঠিপৎ ॥"

শোনা যায় শ্রীশবাবু শ্লোকদুইটি রচনা করিয়া তাহা সংশোধনার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "শ্রীশের রচনা আর দেখিতে হইবে না।"

কিছুদিন পরে নিঃসন্তান অবস্থায় কালীমতী দেবীর মৃত্যু হয়। যে শ্রীশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের জন্য একসময় কত নিন্দা এবং বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, শেষাবস্থায় আবার তাঁহাকেই মন্দির-প্রতিষ্ঠাদির সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রক্ষণশীল দলে স্থান গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের নিকট অবগত হইয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যকে পাপ মনে করিয়া এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই ; ইহা কেবল মাতৃ-অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিয়া মাতৃ-তৃপ্তি-বিধানার্থ করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জন্ম ১২৬৮ সাল; মৃত্যু ১৩০০ সাল। মৃত্যুকালীন বয়স প্রায় ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

মিশিয়া এত ব্যয় করিতেন যে শেষে ঋণী হইয়া পড়েন। তখন নানা কারণে বাঁকিপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন।

তারপর শারীরিক অসুস্থতা বশত চিকিৎসাকার্য্যে পরিশ্রম করিতে না পারিয়া, হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ রচনায় সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন*। হোমিওপ্যাথী এবং এলোপ্যাথী অনেক পুস্তক পাঠ ও অনেক গবেষণা করিয়া এবং রাজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি চিকিৎসকগণের পরামর্শ লইয়া প্রায় বারো চোদ্দ রকম বিষয়ের হোমিওপ্যাথী পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ-সকল পুস্তক প্রণয়ন করিতে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

বসন্তকুমার যখন পুস্তক প্রকাশ করেন তখন আর কাহারো পুস্তক বিখ্যাত ছিল না। বহু পত্রিকা-সম্পাদকগণ তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকসকলের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একসময় তাঁহার পুস্তকের স্বত্ব (copy right) কিনিয়া লইবার জন্য লোকে দশহাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিল। পুস্তক বিক্রয় করিয়া তদপেক্ষা তাঁহার বেশী আয় হইবে ভাবিয়া পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করেন নাই।

তাঁহার জন্মভূমি খাঁটুরাগ্রামে থাকিয়া কিছুদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সে-সময় প্রথম হোমিওপ্যাথী প্রচলিত হওয়ায়, তাঁহার চিকিৎসা এক আশ্চর্য্য রকমের নূতন প্রণালী বলিয়া লোকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিকট আসিত।

ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় বসন্তকে অত্যন্ত ভালো-বাসিতেন। অধিকাংশ কঠিন রোগীদিগের চিকিৎসার সময়

তাঁহাকে সঙ্গে লইতেন। বসন্তকুমারের স্বাভাবিক একটা আকর্ষণে সকলে মুগ্ধ হইত। তাঁহাকে সঙ্গে আনিতে রাজেন্দ্র-



ডাক্তার বসন্তকুমার দত্ত

বাবুকে অনেকে অনুরোধ করিতেন। চিকিৎসায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখিয়া রাজেন্দ্রবাবু আশা করিতেন, বসন্ত

আমেরিকায় পড়িয়া এম-ডি পাশ করিয়া আসিলে এখানে একজন বিখ্যাত ডাক্তার হইবেন। বসন্তকুমার সরল অমায়িক উদারপ্রকৃতি এবং মুক্তহস্ত ছিলেন।”

প্রথমেই বলিয়াছি বসন্তবাবু অত্যন্ত উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। উৎসাহ তাঁহার কর্ম্ম-জগতেই অধিক ছিল—অবশ্য প্রথমে যখন তিনি ধর্ম্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাহাতেও তাঁহার উৎসাহ কম দেখা যায় নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব লাভের জন্য তাঁহার উৎসাহ তদ্রূপ ছিল না, বাহ্যভাবে তিনি অধিক ধুম-ধাম প্রিয় ছিলেন। এ-সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছিলেন;—“যখন কোনো ধূম-ধামের ব্যাপার উপস্থিত হইত—যেমন, নগর-সংকীর্ত্তনের দল কিংবা কোনো ‘মিছিল’ বাহির হইবার সময় কেশববাবু বসন্তকে অনুসন্ধান করিতেন। আবার যখন “সঙ্গত-সভা”য় কোনো গভীরবিষয় আলোচনা চলিতেছে, তখন বলিতেন, ক্ষেত্র এসেছেন?” ফলত মহাপুরুষদিগের গম্ভীর অন্তদৃষ্টি মানব-প্রকৃতি নির্ব্বাচনে এইরূপই দেখা যায়।

বসন্তবাবুর আর্থিক এবং শারীরিক অবস্থায় যখন অবনতি ঘটিল, তখন ধনবান ভগ্নীপতির সাদর যত্ন-মমতার কোনো অভাব হইল না। অর্থাভাবে তাঁহার বাহ্যিক উৎসাহ উদ্যম কিছু খর্ব্ব হইলেও যে স্বাধীনসংস্কার তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বিশেষত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সামাজিকতার সহিত তাঁহার যেটুকু যোগের প্রয়োজন তাহা তাঁহার নিজের এবং ধনবান প্রতিপত্তি-

শালী ভগ্নীপতির পারিবারিক সংশ্রবে থাকায় তাহার কোনো অভাব হয় নাই।

আমি বসন্তবাবুকে ১২৯৪-৯৫ সালে সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের আহিরিটোলার সদর-বাড়ির দরজায় সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

এখন তাম্বুলীসমাজের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সে-সময় সমাজ-বন্ধন যেটুকু ছিল এখন তাহা নাই। লোকের মনের গতিও কতক পরিমাণে উদারভাবের দিকে চলিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত বসন্তবাবুর আরো একটি সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের উভয়ের পত্নী পরস্পর সহোদরা ছিলেন। অর্থাৎ মহাত্মা ক্ষেত্রমোহনের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী—পূর্ব্বে যাঁহার নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে—তিনি এবং বসন্তবাবুর পত্নী ধর্ম্মশীলা পতিতপাবনী, ইঁহারা উভয়ে স্বর্গীয় ভগবতীচরণ দে মহাশয়ের কন্যা। সাধ্বী কুমুদিনী ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য যে-পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা "কুমুদিনী-চরিত" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ণিত আছে।

বাবু বসন্তকুমার দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত্যাগ করিলে ধর্ম্মপ্রাণা পতিতপাবনী, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা হইয়া ঘরে বসিয়া সাধন-ভজনে বৈধব্য জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় একটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ করিয়া এ-প্রসঙ্গ শেষ করিব।

সাধ্বী কুমুদিনী, একুশ বৎসর বয়সে (১২৭১ সালের ৬ই মাঘ

সায়ংকালে) পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার পুত্র শরচ্চন্দ্র নিতান্ত শিশু; শরৎ মাতামহীর নিকট প্রতিপালিত হইয়া ব্রাহ্ম পিতাকে 'দত্ত মশাই' সম্বোধন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর শেষাবস্থায় শরচ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া পিতার সহিত আহিরীটোলার বাড়িতে বাস এবং কার্য্যতঃ পিতার সন্তোষ বিধান করিয়া—পিতা বর্ত্তমানে স্ত্রী এবং কয়েকটি অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। বসন্তবাবুর স্ত্রী (শরচ্চন্দ্রের মাসীমাতা) শরচ্চন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, এবং শেষাবস্থায় একান্নবর্ত্তী হইয়া ঐ আহিরীটোলার বাড়িতেই বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে আত্মীয়বর্গ মনে করিয়াছিলেন 'বসন্তবাবুর স্ত্রী বোন-পো শরতকে বা তাহার পুত্রদিগকে বাড়ির নিজ অংশ দিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ন্যায্য উত্তরাধিকারী ভাগিনেয়কে (সৃষ্টিধর বাবুর পুত্র) দিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রবাবুর আহিরীটোলার বাড়ি—ক্ষেত্রবাবুর আহিরীটোলার বাড়িতে আমি যখন আসিতাম তখন তিনি এবং তাঁহার মামাতো বিধবাভগিনী সরস্বতী সেন ও লক্ষ্মণবাবুর কুমারী-কন্যা স্নেহলতা থাকিতেন। সরস্বতী সেন মহাশয়া খাঁটুরা পালপাড়ার স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র পাল মহাশয়ের কন্যা। বরাহনগরে দেবনাথ (কিংবা শ্রীনাথ) সেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার দেবরকে আমি দেখিয়াছিলাম, তারপর তিনিও মারা যান।

সরস্বতী সেন বিধবা হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। ক্ষেত্রবাবু এবং গণেশবাবু উভয়েই ইঁহার মাসতুত দাদা ছিলেন। গণেশবাবুর নিকট ইনি প্রথমে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন, তারপর যখন গণেশবাবুর বিংশতিবৎসর বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাবালাকে আত্মীয়-আত্মীয়াগণ প্রলুব্ধ করিয়া পিতার অজ্ঞাতে গোপনে হিন্দুসমাজে সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী—প্রায় ৩৫-৩৬ বৎসর বয়স্ক রামতারিণ রক্ষিতের সহিত বিবাহ দেন, তখন লক্ষ্মণবাবু চারবৎসরের শিশুকন্যা স্নেহলতাকে তাঁহার ভগ্নী গোলাপসুন্দরীর হস্ত হইতে লইয়া বেথুনস্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখেন! কিন্তু এত শিশু গ্রহণকরা স্কুলের নিয়ম না থাকায় অভিভাবিকারূপে সরস্বতী সেন মহাশয়া তথায়

থাকেন, এবং নিজে কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া, পরে নিম্ন-শ্রেণীতে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

স্নেহলতা বেথুন স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আদর্শ স্ত্রী-শিক্ষালয় ভিক্টোরিয়াকলেজে কিছুদিন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন বোর্ডিং ছাড়িয়া ইঁহারা আহিরীটোলার বাড়িতে ছিলেন। আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

অল্পদিনের মধ্যে ইঁহাদের সহিত আমার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। ইঁহাদের দৈনিক উপাসনা হইত, তাহাতে যোগ দিয়া উপাসনা-অঙ্গের মধ্যে দুই একটি সঙ্গীত করিতাম!

অন্ধ চুণীলাল মিত্র—এই অবস্থায় একদিন ক্ষেত্রবাবু আমাকে বলেন, "যোগীন্দ্র! তোমার কণ্ঠ বেশ মিষ্ট ও পরিস্কার, তুমি যদি সঙ্গীতশিক্ষা করিতে পারো তবে ভালোই হয়। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতজ্ঞের খুব অভাব এবং সঙ্গীতের জন্য বড় আদর হয়।"

আমি বলিলাম, "তেমন লোক কে আছেন যিনি আমাকে যত্ন করিয়া সঙ্গীত শিখাইতে পারেন।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের একটি বন্ধু আছেন তাঁহার নাম চুণীলাল মিত্র; আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, বোধ হয় তিনি তোমাকে গান শিখাইবেন।"

তারপর একদিন ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "আমি চুণীবাবুকে বলিয়াছি, তুমি শোভাবাজার ৬নং নন্দরাম সেনের গলি পতিরাম রক্ষিতের বাড়িতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে।"

আমি যখন চুণীবাবুর নিকট গেলাম, তখন বেলা অপরাহ্ন।

তিনি নিকটেই বাবু মণীন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে একটি ভদ্রলোককে হারমোনিয়ম-যোগে গানশিক্ষা দিতেছিলেন।

চুণীবাবু অন্ধ, তিনি আমার কথা শুনিয়াই বলিলেন, "হাঁ! আসুন, আমি আপনার কথা শুনিয়াছি।" তারপর সঙ্গীত-সম্বন্ধে আমাদের কিছু কথাবার্ত্তা হইল, তিনি আমাকে একটি গান শুনাইলেন। তারপর আমাকে লইয়া তাঁহার বাসায় আসিলেন।

চুণীবাবুর পরিচয় আমি তাঁহার নিজমুখে যেমন শুনিয়াছিলাম এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তাহা বলিতেছি।

নন্দরাম সেনের গলিতে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা তথায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর বালক চুণীবাবু তাঁহার মাতা এবং ভগিনীগণসহ অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। ষোলোবৎসর বয়সে তিনি একটি এ্যাসিডের বোতল খুলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার দুই চক্ষুতে লাগে। তজ্জন্য তিনি জন্মের মতো অন্ধ হইয়া যান।

ইহারপর একসময় তিনি দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু তিনি ভগবানের নিষেধ শুনিতে পাইয়া সে-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বর-বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। এমন সময় সহসা এক মহাত্মা তাঁহাকে কয়েকটি সারকথা বলিয়া চলিয়া যান। তাঁহার কথায় চুণীবাবুর বিবেক জাগ্রত হইয়া উঠে। তার পর তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া কখনো কখনো ধর্ম্মবন্ধু সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্মালোচনা ও জনসেবার কার্য্যাদি করিতেন। মধ্যে মধ্যে

আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতেন। কিছুদিন তিনি সুবিখ্যাত মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মোহাবসান ও প্রায়শ্চিত্ত—চুণীবাবুর বাসার সদরদরজায় বসিয়া আমাদের কথা হইতে লাগিল। দুই-এক কথার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনার তো হৃদয়াকাশ বেশ পরিষ্কার দেখিতেছি, কিন্তু ঐ এককোণে অল্প মেঘাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে কেন? আপনি কথা কহিতেছেন বেশ, কিন্তু তার মধ্যে যেন কি-একটা কাতরস্বরের রেশ বাহির হইতেছে। আপনার মনেরমধ্যে যেন এখনো কি-একটা গভীর বিষাদ রহিয়াছে বোধ হইতেছে।

আমি তাঁহার এই কথায় আশ্চর্য্যবোধ করিয়া বলিলাম,—ক্ষেত্রবাবু কি আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিয়াছেন?

"তিনি বলিয়াছিলেন, যে আপনি ধনীর পুত্র-পৌত্র ছিলেন, তারপর নিজেও চিনির কারবারে প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থার উন্নতি করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা আপনার বিবেক-বৈরাগ্য উদয় হইয়া, এখন আপনি ধর্ম্মের জন্য বিষয়-কর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনাকে সঙ্গীতশিক্ষা দিবার জন্য ক্ষেত্রবাবু আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—তবে আপনি আমার মনের অবস্থা জানিলেন কিরূপে?

"ঐ যে, আপনার গন্ধে—আপনার শব্দে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। আপনিই বলুন না আপনার মনের

মধ্যে কিছু আছে কি না? খুলিয়া বলুন না আপনার সে বিষয়টা কি?”

আমি তখন স্থিরচিত্তে বলিলাম,—আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন; আমি উপস্থিত বড়ই একটা মনোকষ্টের মধ্যে পড়িয়া আছি, তাহা আপনাকে আজ বলিব। আপনি আমার প্রথমঅবস্থার কথা শুনিয়াছেন, তারপর আমি যখন দোকানের কাজে-কর্ম্মে লিপ্ত ছিলাম, তখন কুসঙ্গে মিশিয়া আমার চরিত্রদূষিত হইয়াছিল। বারোবৎসর বয়সে, এক সাতবৎসরের বালিকার সহিত আমার বিবাহ হয়। আঠারোবৎসর বয়সে আমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারপর আমার স্ত্রী পক্ষাঘাত রোগে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া বরাহনগর তাঁহার পিত্রালয়ে আছেন। আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার এক আত্মীয়ার প্ররোচনায় পুনরায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এমনসময়ে অন্তরে ভগবানের নিষেধ শুনিয়া বুঝিলাম যে ইহা অন্যায় আচরণ। এই উপলক্ষ্যে আমার মনের একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তারপর হইতে আমি স্থির করিয়াছি, আর বিবাহ করিব না, এক স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করা যে অতীব অধর্ম্মকার্য্য ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। আমি পীড়িত হইলে আমার স্ত্রী আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করিতেন এখন আমিও তদ্রূপ করিব। আমি নিজহাতে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিব। তাঁহার মন ভালো আছে, তাঁহার সঙ্গে আমার এখন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের দিন আসিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে ভগবান

ভালোই করিয়াছেন। ইহা এখন আমার সৌভাগ্যের হেতু-স্বরূপ হইবে। এই কল্পনাতেও আমি অতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন অভিমান ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। কি-এক বিকট মোহ ও লজ্জা আসিয়া যেন বাধা দিতেছে। পূর্ব্বে কল্পনায় যে-আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা হারাইয়া এখন সে-বিষয়ে একপ্রকার গূঢ় অপ্রসন্নতা অনুভব করিতেছি।

আমার এইসকল কথা শুনিয়া চুণীবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপনার শ্বশুরালয় বরাহনগর এখান হইতে তো অধিক দূর নয়, আপনি কি এখন সেখানে যাইতে পারেন না?"

আমি বলিলাম, পারি।

"তবে এখনই চলে যান—দেখবেন কি আনন্দ পান। আমি রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এইখানেই থাকিব। সেখানকার খবর আমাকে দিয়া যাইবেন!"

আমি বরাহনগর গেলাম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির নিকটে গিয়া আর যাইতে পারিলাম না। কেমন যেন হইল! আস্তে আস্তে আবার যেমন কলিকাতামুখীন হইলাম আর যেন কলের পুতুলের মতো ফিরিয়া আসিলাম। চুণীবাবুর সঙ্গে আর দেখা করিতেও পারিলাম না। তখনো বলরাম দে ষ্ট্রীটে বাসা ছিল। বাসায় গিয়া, সমস্ত রাত্রি মৃতপ্রায় অবস্থায় অবসান হইল। কিন্তু প্রাতে কোথা দিয়া পূর্ব্বাকাশের সমুজ্জ্বল কিরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার মনেও এক নবআলোক আসিয়া মন

প্রস্তুত হইয়া গেল। আজ নিশ্চয়ই যাইব, সমস্ত অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

বেলা চারটার পূর্ব্বেই বরাহনগর গেলাম। তার পর যাহা হইল তাহা আমার প্রাণে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যিনি এতদিন আমার ভ্রান্তির জন্য এত কষ্ট দুঃখ ভোগ করিতেছেন, আমার সেই সরলপ্রাণা বিকলাঙ্গী পত্নী একবার আমার দর্শনে ও অনুতাপ-বাক্য শ্রবণমাত্রেই সকল কষ্ট ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট বলিলাম,—এখন আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য এখন অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছি। আপনারা আমার গত অপরাধ সকল ক্ষমা করুন। আমি শীঘ্রই আপনাদের কন্যাকে বাড়ি লইয়া যাইব এবং যথাসাধ্য তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিব। শাশুড়ী-মাতা আর কি বলিবেন, তিনি নীরবে প্রসন্নতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু শ্বশুরমহাশয় সাক্ষাতে কোনোরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয় তিনি মনে করিলেন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, তাই এ ভাব হইয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া চুণীবাবুকে সমস্ত সংবাদ দিলাম। এই ঘটনায় তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা যোগ হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম। তাঁহার রচিত ধর্ম্মভাবের দশটি গল্প 'জীবনসঙ্কেত' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়াছিলাম, সেখানি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেওঘর—২৯শে পৌষ সুরেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। তার পর আরো একমাস বলরাম দে ষ্ট্রীটে বাসা রাখা হইল। ফাল্গুন মাসের প্রথমে উপেন্দ্র-সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, এখন রোগ আরোগ্য হইয়াছে, এইসময় বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে ভালো হয়। তাহাতে আমার মনে হইল, যখন এতদূর করা হইয়াছে তখন এটুকুও করা আবশ্যক।

বন্ধু হরিবিহারী সেন যখন 'টেলার সপ' খোলেন, তাহার কিছুদিন পরে বন্ধুবর কালীনাথ রক্ষিতের কথায় বন্ধুদিগের সাহায্যার্থে ঐ-ফারমে একহাজার টাকা জমা রাখি। উপেন্দ্রের চিকিৎসার খরচ সেই টাকা হইতে করা হইতেছিল। যখন বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা হইল তখনো কিছু জমা ছিল সুতরাং সে-বিষয়ে আর কিছু ভাবিবার রহিল না, শীঘ্রই দেওঘর যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। হরিবিহারী ভায়া দেওঘর স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু যোগীন্দ্র বসু বি-এ মহাশয়কে পত্র লেখায় একটি ছোট বাসা-বাড়ি স্থির হইয়া গেল। এবং অন্যান্য বিষয়ে যোগীন্দ্রবাবুর সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া দিল।

ফাল্গুন মাসের প্রথমেই আমরা যাত্রা করিলাম। আমাদের প্রতিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা তাঁহাকে শিবুদাদা

বলিতাম—তাঁহার শরীর একটু খারাপ ছিল এবং তিনি আমাদের কিছু সাহায্য করিবেন, বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল।

আমরা দেওঘরে গিয়া বারো টাকা মাসিক ভাড়ায় যে বাড়ি পাইলাম, সে-বাড়িটি স্কুলের খুব কাছে। একেবারে মাঠের মধ্যে না হইলেও বস্তির বাহিরে অনেকটা ফাঁকা মাঠের দিকে সদর রাস্তার উপর। তখন দেওঘরে এত অধিক বাড়ি-ঘর হয় নাই; সে ১২৯৩ সালের কথা। দুইএক দিনে আমাদের অন্যান্য সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল। আমরা স্বচ্ছন্দেই সেখানে রহিলাম। শিবুদাদার উপর বাসার ভার দিয়া আমি অধিকাংশ সময় স্কুল-বাড়িতেই কাটাইতে লাগিলাম।

এই দেওঘর অবস্থান আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। প্রথমত হেডমাষ্টার যোগীন্দ্রবাবুকে চিরবন্ধুরূপে পাইলাম। দক্ষিণ রাজপুর-সন্নিকট ন্যাতড়ায় তাঁহার বাড়ি। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়দিগের সহিত তাঁহার কিছু সম্পর্ক আছে। যোগীন্দ্রবাবু ধর্ম্মানুরাগী বিনয়ী এবং আত্মগোপনশীল ব্যক্তি।

আমি প্রায় দিন-রাত স্কুল-বাড়িতে ও যোগীন্দ্রবাবুর বাসায় কাটাইতে লাগিলাম। স্কুল-বাড়ি থাকিবার আর একটি কারণ হইল, বাবু চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামক একটি যুবক—তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের, এখানে স্কুলে থার্ড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু-ভাব হইয়া গেল। কেবল তাহা নহে—সে-সময় তিনি যেন আমার জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া দেওঘরে আমাকে সঙ্গদান করিলেন। কয়েকদিন বাদে তিনি প্রত্যহ ম্যাট্‌সিনির ইংরাজী জীবনী পড়িয়া আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। কয়েকদিন শুনিতে

শুনিতে যেখানে শুনিলাম, তরুণ যুবক ম্যাট্‌সিনি আপন স্বদেশ ইয়ং ইটালীর স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া কালো পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; একদিন তাঁহার সহপাঠিগণ জিজ্ঞাসা করিল, ম্যাট্‌সিনি, তুমি সর্ব্বদা এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান কর কেন ? তিনি বলিলেন, আমার দেশ এখন পরাধীন, আমি যতদিন ইটালীর স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে না পারিব ততদিন আমি এই মৃতাশৌচ-চিহ্ন ধারণ করিব।

আমি এই বাণীর মধ্যে কি শুনিলাম,—কি বুঝিলাম—তাহা এখন কোন্ ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করিব ? বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার যেন আশা পাইলাম ! কোন্ নিদ্রিত ভাব জাগ্রত হইল ! কিন্তু এখন বৃথা কুণ্ঠাবোধ করিয়া কি সত্য গোপন করিব ? বিধাতা যাহা শুনাইয়াছিলেন তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব ? সেই স্বর্গীয় ভাব তো আমার সম্পত্তি নয়, সে-ভাব যাঁহার দেওয়া, তিনি যদি সেই সমাচার সকলকে শুনাইতে বলেন, তাবে আমি কি করিব ? ম্যাট্‌সিনির সেই কালো পরিচ্ছদ-ধারণ-বাক্যে আমার প্রাণ যে গুরু-গম্ভীর গাঢ় মেঘাবরণে ঢাকিয়াছিল, তাহা সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া পড়িল। এখানে আমি ইহাই বুঝিলাম, গভীর বিষয়ের জন্য—মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইরূপে চিরব্রতধারী হইতে হইবে। এইদিনে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইল—আহত হইলাম। দেশের জন্য—স্বজাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে—চিরবৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিতে হৃদয়-নিহিত ভাব-কুসুম ফুটিয়া উঠিল।

যোগীন্দ্রবাবুর বাসায় প্রতিদিন প্রার্থনা হইত। তার মধ্যে

তিনি দু'-একটি সঙ্গীত করিতেন। সঙ্গীত-রচনায় এইসময় যেন তাঁহার শক্তি বিকশিত হইতেছিল। আর তাঁহার যে কবিত্ব-শক্তি—যাহার ফল "মাইকেল মধুসূদনের জীবনী" বা মেঘনাদবধকাব্য-সমালোচনা, তাহারও যেন এইসময় সূচনা হইতেছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'একাদশ অবতার' একখানি ব্যঙ্গ-কাব্য তাঁহার রচনা সেইসময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আর আমাদের প্রার্থনার মধ্যে সঙ্গীত করিতেন নীলরতন বাবুর একটি ভগিনী—কুমারী নীরোদা, তিনি তখন তথায় ছিলেন। আমাদের তখনকার সেইসকল প্রার্থনা—প্রাণের সেই অনাবিল স্রোত, সঙ্গীত-তরঙ্গের মধুর প্রবাহে প্রবাহিত হইত। সে সুন্দর স্মৃতি, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

যোগীন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিয়া মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দর্শন করিলাম। তাঁহার কথাবার্ত্তা আমি চুপ করিয়া শুনিতাম, আর তাঁহার সেই অপূর্ব্ব 'হাসি' দেখিতাম, তেমন গালভরা কৌমুদী-সিক্ত মধুর হাস্য বুঝি আর কখনো কোথাও দেখি নাই।

অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত—চৈত্রমাসে গোবরডাঙ্গার বাড়ি হইতে এক পত্র পাইলাম। পত্রখানি শচীন্দ্র লিখিতেছে, "দাদা এইবার আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, সম্প্রতি এখানে কারখানা-পটীতে আগুন লাগিয়া আঠারো উনিশটি চিনির কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। তার মধ্যে আমাদের কারখানার-বাড়িও গিয়াছে। নিজেদের সমস্ত গিয়া, আরো যদি অপরের দেনা হইতে হয়, সেইটিই বড় ভাবনার কথা।"

এইসময় ঈশ্বর-কৃপা বায়ু বুঝি এমনই বহিতেছিল, যে এই

ভীষণ সংবাদে আমার মন তেমন বিচলিত হইল না। ক্ষণকালের জন্য একবার মনে হইল, তবে কি আবার অর্থচিন্তা করিতে হইবে। পরক্ষণে মনে হইল, না; তাহা আর সম্ভব নহে। যদি দেনাই কিছু দাঁড়ায়, বরাহনগরের বাড়িখানা আছে তো, তাহাই বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। সে-বাড়ি না থাকিলে সংসারের বিশেষ এমন-কি ক্ষতি হইবে—বরং ভালোই হইবে! যতীন্দ্র ঐ-বাড়িতে থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র সংসারের সূচনা করিতেছে, সে-পথ বন্ধ হওয়াই ভালো। তারপর সংসার আছে —তিনভাই সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে, যাহা হয় হইবেই। তবে উপস্থিত এক ভাবনা, এত করিয়া উপেন্দ্রকে আরোগ্য করা গেল, এখন হঠাৎ এই সংবাদে যদি তাহার মনটা ভাঙিয়া পড়ে, এই ভাবিয়া সেদিন সহসা তাহাকে এ-সংবাদ শোনানো হইল না। উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইলাম। এ-কথা সে-কথার পর প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহাকে এমন কথা বলিলাম, উপস্থিত আমাদের যে বিষয় আশয় আছে, তাহা যদি দৈবক্রমে নষ্ট হইয়া যায় তবে কি করা যাইবে? তাহাতে উপেন্দ্র উত্তর করিল, কেন যাইবে? আর যদিই যায় তাতে আর ভাবনা কি? আপনি তো আমাদিগকে এখন মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, ভগবান্ যা করেন তাহাই হইবে।

তার পরদিন কিম্বা আরো একদিন বাদে উপেন্দ্র বলিল,—দাদা, আমরা যে সর্ব্বস্বান্ত হইব তাহা কি আপনি জানিতে পারিয়াছিলেন? এই দেখুন আমাকে সুরনাথ ভট্টাচার্য্য পত্র লিখিয়াছে, গোবরডাঙ্গার কারখানাপটী পুড়িয়া—আমাদেরও

কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, হাঁ, আগেই পত্র পাইয়াছিলাম, তাই তোমার মন-প্রস্তুতির জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলাম। ইহার পরই দণ্ডীদাদার পত্র পাইলাম, তিনি লিখিতেছেন "সমস্তই গিয়াছে, তবে কারখানায় স্থানাভাবে ঘটনার পূর্ব্বদিন দলুয়া চিনির একশত চুপড়ি বাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আর পোড়ার মধ্যে কতকটা পাওয়া যাইবে, যাহা হউক তুমি শীঘ্র বাড়ি আসিতে চেষ্টা করিবে।"

উপেন্দ্র একপ্রকার সুস্থ হইয়াছে। এখন এখানে গরম পড়িতে আরম্ভ হইল, তা'ছাড়া এই ঘটনা উপস্থিত, সুতরাং আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয় মনে হইল। কিন্তু সহসা একেবারে বাসা তোলা হইল না। শিবুদাদা ইতিপূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিলেন! কয়েকদিনের জন্য যোগীন্দ্রবাবুর বাসায় উপেন্দ্রকে রাখিয়া আমি একবার বাড়ি আসিলাম।

বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, পোড়ার অবশিষ্ট মাল পরিষ্কার করিয়া কলিকাতায় পাঠানো এবং কারখানার কাজ যত শীঘ্র শেষ হয় তাহার চেষ্টা দণ্ডীদাদা করিতেছেন। আমি বাড়ির সকলকে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিলাম। প্রতিবাসিগণ যাঁহারা কারখানায় টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা টাকা পাইবেন বলিয়া দিলাম। অধিকন্তু মাসীমাতাঠাকুরাণীর শরীর অত্যন্ত খারাপ দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন বাদে পুনরায় দেওঘরে আসিলাম। কিন্তু নানাকারণে আর আমাদের সেখানো অধিকদিন থাকা হইল না। বৈশাখ মাসেই আমরা বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভগিনী ত্রৈলোক্যতারিণী—বৈশাখমাসের প্রথমে দেওঘর হইতে বাড়ি আসিয়া আমার প্রথম কাজ চিনির কারখানার দেনা পরিশোধ করা, কিন্তু যতদিন অবশিষ্ট চিনি বিক্রয় হইয়া দেনার হিসাব স্থির না হইতেছে, ততদিন আমার কিছু করিবার রহিল না, সে-কাজ দণ্ডীদাদার হাতে ছিল।

সুরেন্দ্রের মৃত্যুর পর আমার ভগিনী ত্রৈলোক্য অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া পড়ে। বিশেষত তাহার কোনো সন্তানাদি না থাকায় একটা সান্ত্বনার কারণও ছিল না। তদ্ব্যতীত পূর্ব্ব হইতে নানাপ্রকার কুসংস্কারে সংসারে তাহার মন ভালো ছিল না, এখন তাহার অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। দিনরাত তাহার ক্রন্দন-রবে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিলাম।

কিছু পূর্ব্ব হইতে স্বভাবত আমার একটি অভ্যাস হইয়াছিল, যেদিন মনে কোনো গুরুতর চিন্তার উদয় হইত, কিম্বা শারীরিক অবস্থানুসারে মধ্যে মধ্যে দিনে উপবাস করিয়া দিনান্তে একবার আহার করিতাম। তাহাতে চিন্তার একাগ্রতা হইত। একদিন দেখিলাম, ত্রৈলোক্য রাগে দুঃখে অভিভূতা হইয়া সমস্তদিন অনাহারে পড়িয়া আছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হইল। আমিও সমস্তদিন আহার না করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করা কর্ত্তব্য, কি করিলে এ অশান্তির প্রতীকার হইতে পারে। এমনভাবে সংসারে আর থাকা যায় না।

সমস্তদিনের পর একটা আশার আলোক পাইলাম, তাহাতে মনের গ্লানি অনেকটা চলিয়া গেল। বাড়ির ভিতর যে-ঘরে ত্রৈলোক্য শুইয়াছিল সেখানে আসিয়া বলিলাম, দেখো, আজ আমিও উপবাস করিয়া সমস্তদিন তোমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, সংকল্প করিয়াছিলাম যতক্ষণ তোমার জন্য কোনো সদুপায় স্থির করিতে না পারি ততক্ষণ আহার করিব না, এখন তোমার জন্য ভগবানের কিছু ইঙ্গিত পাইয়াছি, তুমি উঠিয়া আহারাদি করিয়া এসো। আমিও আহার করিতে যাইতেছি, আসিয়া তোমাকে সমস্ত বলিব।

যে শোকে-বিষাদে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, সে আমার এই কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল, এবং আমি আহার করিলে সেও আহারাদি করিল।

রাত্রে তাহাকে বলিলাম, আমি বুঝিতেছি, তোমার এই চির অশান্তি দূরের আর কোনো উপায় নাই, এক উপায় আছে, যদি ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারো। আমি দেখিতেছি, এ-সংসারে থাকিয়া তোমার শান্তিলাভের কোনো সম্ভাবনা নাই; তোমার মনের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। তুমি যদি ইচ্ছা করো, আমি তোমাকে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে অর্থাৎ তোমার মামাশ্বশুর ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি লইয়া যাইতে পারি। সেখানে গিয়া তুমি যদি লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারো, এবং ঈশ্বরোপাসনাদি শ্রবণ করো, তবে তোমার ভালোই হইবে; বিশেষত ক্ষেত্রবাবু তোমার পিতৃতুল্য; সেখানে তোমার কোনো কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার কথায় ত্রৈলোক্য

কহিল, আমি ছোটবেলা মামাশ্বশুর-বাড়ি গিয়া শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি উপাসনা করেন, আমার মনে এখন সেইকথা হইতেছিল, সেই উপাসনা শুনিলে আমার মন ভালো হইবে। আপনিত সেখানে যান। আমি বলিলাম, তবে কালই তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইব, কিন্তু আগে সাবধান করিয়া দিতেছি, এ-কথা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না—সঙ্গে অধিক কিছু লইবারও প্রয়োজন নাই। সামান্য বস্ত্র দুই-একখানা লইবে মাত্র এবং প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, আহারান্তে দু'টার ট্রেণে তোমাকে লইয়া যাইব।

এই কথার পর রাত্রে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমি কিরূপ কাজে অগ্রসর হইতেছি; ইহা বিনা-বাধায় সম্পন্ন হইবার নয়, ইহাতে নিন্দা অপমানেরও সম্ভাবনা অনেক আছে। তখনই মনে হইল, আমি সত্যের পক্ষ হইব বলিয়া একদিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, সমস্ত জীবনব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ঈশ্বরের পথে যাইতে নরনারীকে সাহায্য করিব। তবে আজ নিজের ভগিনী ঘরের বাহির হইলে নিন্দা হইবে বলিয়া ভাবিতেছি কেন? যদি আর কোনো নারী আজ ঈশ্বরের পথে—ব্রাহ্মসমাজে যাইতে চায়, আমি কি তাহাকে সাহায্য করিব না? তাহা যদি করি, তবে ইহাকেও করিব না কেন? ঈশ্বরের পথে আপন পর কে? সকলেই সমান। এইরূপ ভাবে মনে খুব বল পাইলাম। মনে হইল, যত বাধাবিঘ্নই আসুক, সকলই কাটাইতে হইবে।

পরদিন যখন আমরা যাত্রা করিব, তখন উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, দিদিকে কোথায় লইয়া যাইবেন? আমি

তাহার ভাব বুঝিয়াছিলাম, সে এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নহে। তাই বলিলাম, পরে জানিতে পারিবে। এ-কথায় তাহার মন সন্তুষ্ট হইল না, কোনো বাধা দিতেও পারিল না, কেমন একরকম হইয়া গেল। মা বলিলেন, বাবা, যাহাতে ভালো হয়, তাহাই করিয়ো। আমি বলিলাম, ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

প্রথম পরীক্ষা—গৃহত্যাগ—তারপর ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি ত্রৈলোক্যকে রাখিয়া পরদিন আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, আমার জন্য অগ্নিপরীক্ষা প্রস্তুত। উপেন্দ্রের মন ভয়ানক উত্তেজিত হইয়াছে, তৃতীয় সহোদর শশীন্দ্র আজো পর্য্যন্ত আমার সাম্‌নে উচ্চরবে কথা কহে নাই, উপেন্দ্র তাহাকেও সঙ্গে লইয়াছে। আমাকে দেখিয়া উপেন্দ্র বলিল, "দিদিকে এখনি বাড়ি আনা হউক, নচেৎ আপনি এ-বাড়ি হইতে চলিয়া যান।" দ্বিতীয় প্রস্তাবই আমার পক্ষে সহজ, কারণ পূর্ব্ব হইতে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দমনে আমি মধ্যে মধ্যে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বেলা এগারো কিম্বা সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ি হইতে মন্দিরে অসিলাম। মনে আছে, পিতা সকল বিষয়ে নীরব থাকিয়াও আমার গৃহত্যাগ আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু উপেন্দ্র তখন সে-কথায় কর্ণপাত করিতে পারে নাই। আহারের জন্য মাতাঠাকুরাণী বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

পরদিন উপেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বরাহনগর হইতে যতীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি আসে এবং ত্রৈলোক্যকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে। তাহাতে ক্ষেত্রবাবু বলেন,

"তোমার দাদা আসিয়া লইয়া গেলেই ভালো হয়।" এবং ত্রৈলোক্যও স্ব-ইচ্ছায় আসিতে সম্মত নহে, তখন উপেন্দ্র বাড়ি আসিয়া মাসীমাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া জোর করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া বাড়ি ফিরাইয়া আনে, আমিও পরদিন একবার বাড়ি আসিলাম।

আমাকে দেখিয়া ত্রৈলোক্য আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমি ফিরিয়া আসিয়া ভালো কাজ করি নাই, আপনি আমাকে পুনরায় আর একবার লইয়া চলুন, আর আমি বাড়ি আসিব না। আমি বলিলাম, এখন থাকো, পরে যাহা হয় হইবে। তার পর তাহার জ্বর ও অল্প বসন্ত হইয়া একমাস গত হইল।

ত্রৈলোক্য একবার কলিকাতায় আসিয়াই হউক, অথবা সংসারের চির-অশান্তির জন্যই হউক, তাহার মন পূর্ব্বের ন্যায় সংসারে থাকিতে চাহিল না। কলিকাতায় আসিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে শশীন্দ্র একদিন ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া তাহার সহিত কলহ করিল। তাহার সামান্য গহনা ও অর্থাদি যাহা ছিল, সমস্তই কাড়িয়া লইল। তাহার কথা এই যে, যেমন সংসারে ছিলে, তেমনিভাবে যদি থাকো ভালো, নচেৎ বাড়ি হইতে আজই চলিয়া যাও, তোমার জন্য আর আমরা অশান্তি ভোগ করিতে চাই না।

এই ঘটনায় ত্রৈলোক্য একেবারে অধীর হইয়া আমাকে বলিতে লাগিল, আমি কিছুই চাইনা, নিঃসম্বলে ঈশ্বরের পথে যাইব, আমাকে আর একবার সাহায্য করুন।

আমি দেখিলাম, এবার তাহার মন আরো প্রস্তুত হইয়াছে,

এখন অবহেলা করা আমার পক্ষে উচিত নয়; কিন্তু এবার লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যদিও শচীন্দ্র যাইতে বলিয়াছে, কিন্তু তাহার আন্তরিক ইচ্ছা তাহা নহে। বিশেষত উপেন্দ্র অত্যন্ত বিরোধী। এখন ভগবানের উপর নির্ভর ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রহিল না। আমি ত্রৈলোক্যকে বলিলাম, দেখো, এবার তোমার যাওয়া সহজ নহে, বাড়ি-শুদ্ধ সকলেই বাধা দিবেন। আমি সকলের বাধা ও সকলকে উপেক্ষা করিয়া তোমাকে কিরূপে লইয়া যাইব? অতএব আমি তোমাকে এজন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলি, যদি তিনি তোমাকে যাইতে সাহায্য করেন তবে বুঝিব, তাহাই সত্য এবং তাহাতেই তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ হইবে। আমি গোরুর গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব, রাত্রি দুইটার ট্রেণে যদি তোমার যাওয়া নিরাপদ হয়, তবে হইবে, নচেৎ নয়।

ত্রৈলোক্য যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল, কিন্তু বাহিরে সেভাব গোপন রাখিল। তথাপি বাড়ির সকলে বুঝিলেন যে, আজ রাত্রে ইহারা যাইতে পারে। একটার সময় মন্দিরের মালী আস্তে আস্তে গাড়ি লইয়া ডাকিল। এদিকে ত্রৈলোক্য আসিয়া বলিল, সকলে এখন নিদ্রিত, এই যাইবার সময়, আর একবার সহায়তা করুন।" আমি ঈশ্বরের পথ আর পরিত্যাগ করিব না।

আমরা ক্ষেত্রবাবুর বাসায় আসিলাম, এবার কেহ ফিরাইতে চেষ্টা করিল না।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—ত্রৈলোক্য ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি অল্পদিন

থাকার পরেই দেখা গেল, সে সেখানে থাকিতে অনিচ্ছুক। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে সে কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয় না; শেষে বোঝা গেল, এখানে তাহার মন বসিতেছে না। সে চিরদিন যেসকল কুসংস্কারের মধ্যে গঠিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই পরিবারের সংস্কার ও উচ্চ ভাবের সহিত সে সহসা মিশিতে পারিতেছে না। ইঁহারা যেসকল বিষয়ে প্রফুল্লতার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, ত্রৈলোক্য মামাশ্বশুরের সামনে তাহাতে যোগ দিতে পারে না, তাঁহাদের সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতেও পারে না। সুতরাং সে সর্ব্বদা একলা একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আপনার বিষাদিত অন্তর লইয়া কাটায়। কোনো উচ্চ বিষয়ে তাহার তেমন ধারণা নাই, গত সংসারের মায়া-মমতার চিন্তাতেই তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এই ঘটনায় আমি মহাপরীক্ষায় পতিত হইলাম। তাহাকে এখন কোথায় রাখি, কিসে তাহার মনে ভালো বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা হইবে, এবং নিরাপদে সে জীবনের উন্নতি-পথে চলিতে পারিবে। তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহই বা কিরূপে হইবে? আমি তো অর্থ উপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। নিজের অন্ন-জলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু ত্রৈলোক্যর মনের অবস্থা তো সেরূপ নহে। তাহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে, এখন কোন্ পথে ইহাকে কোথায় লইয়া যাই।

ত্রৈলোক্য আমাকে বলিতে লাগিল, আমিও বুঝিলাম সে আর এখানে থাকিতে পারিতেছে না। তখন ভাবিতে লাগিলাম,

মানুষকে ঈশ্বরের পথে ডাকা বা আনা খুবই ভালো কাজ, কিন্তু মানুষ গড়া কাজটা বড় সহজ নহে। মানুষের সম্মুখে ভালো বিষয় ধরিতে হইবে বটে, কিন্তু ধরিলেই যে সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে তাহা তো নয়। তাহার অন্তরে তেমন ইচ্ছা আগ্রহ থাকা আবশ্যক। নচেৎ সে ভালোকে বুঝিতেই পারিবে না। যাহাহউক এই পরীক্ষা আমার পক্ষে তখন বড়ই গুরুতর বোধ হইল। প্রথমে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের ভাবে বিমল আনন্দ পাইয়া, এ আবার কি অশান্তি! তারপর মনে হইল আমার জীবনের আর একটি গুরুতর শিক্ষার অধ্যায় বোধ হয় এই ঘটনায় আরম্ভ হইল। কেবল আনন্দে হর্ষে সুখে স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মজীবন গড়ে না, জীবনে দুঃখের পরীক্ষাও মধ্যে মধ্যে থাকা চাই। জীবন-যজ্ঞে অশান্তি রূপ ঘৃতাহুতি দিবার আবশ্যক আছে। তাই বুঝি ভগবান্ আমাকে এই ঘঠনায় ফেলিয়া গড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে ইহাতে মনে বড়ই আঘাত লাগিল, কারণ আমি যাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া এমন আনন্দ পাই, আর আমার ভগিনীকে ইঁহারা কত যত্ন করেন, অথচ এখানে সে থাকিতে চাহে না! ইহা অপেক্ষা আর তো আমার কোনো ব্রাহ্মবন্ধু-পরিবার দেখি না যেখানে আমি তাহাকে রাখিতে পারি; তবে কোথায় লইয়া যাই কি করি, ভাবনায় পড়িলাম।

কোনো উপায় স্থির করতে না পারিয়া কয়েকদিনের জন্য আমার নির্জ্জন সাধন-ক্ষেত্র খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে ত্রৈলোক্যকে আনিলাম। সেখানে বেশীদিন তাহাকে রাখাও সুবিধাজনক নহে। ইতিমধ্যে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ খাঁটুরায় আসেন। তিনি

তাহাকে মঙ্গলগঞ্জে লইয়া গেলেন, কিন্তু সেখানেও তাহার থাকার সুবিধা হইল না। শেষে আবার খাঁটুরায় আনিলাম। তারপরই মাঘোৎসব আসিল—সেই উপলক্ষ্যে আমরা কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন উৎসবের আনন্দে কাটাইলাম। যখনই ত্রৈলোক্যের জন্য অত্যন্ত ভাবনা হইতে লাগিল, তখনই নিরুপায়ের উপায় একমাত্র ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে লাগিলাম।

প্রায় উৎসবশেষের একদিন মফঃস্বলের একটি ব্রাহ্ম বন্ধু আমার এই অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বরাহনগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা-আশ্রম করিয়াছেন। আপনি সেখানে আপনার ভগিনীকে রাখিতে পারেন। তিনি সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া এবং এমন-কিছু শিক্ষা করিতে পারেন, যাহাতে নিজের ভার নিজেই বহন করিতে পারিবেন, সেখানে ধর্ম্মভাব বিকাশ এবং সুশিক্ষা লাভ হইতে পারে—সাধারণভাবে এমন ব্যবস্থাও আছে।

বন্ধুমুখে এই সংবাদ শুনিয়া পরদিনই বরাহনগরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার আশ্রমের নিয়মাদির বিষয় জানিয়া এবং তৎকালীন আশ্রমে প্রায় চল্লিশটি মেয়ে আছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশান্বিত হইলাম। কিন্তু আশ্রমে থাকা থাওয়া ইত্যাদিতে ব্যয় মাসিক দশ টাকা করিয়া দিতে হয়। আমার তখন সে সংস্থান নাই, কিন্তু কি করি, তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে আমি কি প্রার্থনা করিব? তবে একটু জানাইলাম যে, আমার সেরূপ অবস্থা নহে,' অথচ ভগিনীটিকে

যেমন করিয়াই হউক এখানে রাখিতেই হইবে। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, এজন্য আমি মাসিক দুইটাকা সাহায্য করিব। আটটাকার হিসাবে তোমাকে দিতে হইবে। আমি তাহাই স্বীকার করিয়া ত্রৈলোক্যকে বুঝাইয়া বলিলাম, এখানে থাকিয়া তুমি যাহাতে কিছু লেখাপড়া শিখিতে পার তাহার চেষ্টা কর, নচেৎ তোমার জন্য আমাকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে।

তারপর খাঁটুরায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একমাস পরে আটটাকা পাঠাইতে হইবে। কিন্তু কয়েকদিন পরে একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে ত্রৈলোক্য লিখিয়াছে—দাদা, আপনি আমার জন্য নিশ্চিন্ত হউন, আপনাকে এখানে কিছুই দিতে হইবে না। বাবা (শশিপদবাবু) প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, আপনি খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজে থাকেন, ক্ষেত্রবাবু, লক্ষ্মণবাবু অর্থশালী ব্যক্তি, অবশ্য আপনার জন্য তাঁহারা অর্থ দিবেন। কিন্তু তিনি আমার নিকট শুনিলেন যে, আপনি কোনোরূপ বন্দোবস্তের মধ্যে থাকেন না, কেবল ভগবানের জন্য তাঁহার দ্বারের ভিখারী হইয়াছেন। এইকথা শুনিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিতে বলিলেন।

এই পত্র পাইয়া ভগবানের কৃপায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এই ঘটনায় সেবাব্রত মহাশয়ের সহিত আমার একটা বিশেষ যোগ সংস্থাপিত হইল। সেবাব্রত মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনী নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চেষ্টা করিলাম।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—বরাহনগর গ্রামে ১২৪৬ সালের মাঘমাসে শশিপদ বাবুর জন্ম। ইঁহার পিতা স্বর্গীয়



সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা গঙ্গামণি দেবী। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে।

শশিপদবাবুর উর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বরাহনগর গঙ্গাতীরে থাকিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তিনি একজন যোগীপুরুষ ছিলেন। বরাহনগর-অধিবাসিগণ এখনো সসম্মানে তাঁহার কুটীরের স্থান নির্দ্দেশ করেন। অকিঞ্চন ব্রহ্মচারীর ভ্রাতুষ্পুত্র রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গঙ্গাস্নান-উপলক্ষ্যে বরাহনগর আগমন করেন, সেই হইতেই তিনি বরাহনগরের অধিবাসী হইয়াছিলেন।

শশিপদবাবু পাঁচবৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তিনি প্রথমে পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পারিবারিক অস্বচ্ছলতা-নিবন্ধন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আটটাকা বেতনে শিক্ষকতাকার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহে পণগ্রহণ তাঁহার পক্ষে সহজ কথা—আজ যে পণ-প্রথা নিবারণের জন্য কত চেষ্টা চলিয়াছে, আর সেই বহু পূর্ব্বে তিনি সহজজ্ঞানে এই অন্যায় কার্য্য নিজের জীবনে হইতে দেন নাই।

বিবাহের পরেই তিনি বুঝিলেন, তাঁহার বালিকা-স্ত্রীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। জীবনের মহৎ কার্য্যে—যাবতীয় উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে সঙ্গিনী করিতে হইলে বিদ্যাহীন অবস্থায় তাহা সম্ভবে না। সে-সময়ে সম্মিলিত পরিবারে স্ত্রীর সহিত স্বামীর দিবসে সাক্ষাৎ হওয়া—তাহার উপর স্ত্রীকে স্বামী নিজে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত নিন্দার কথা ছিল। কিন্তু

তিনি এ-কার্য্যে ঐসকল বাধা অতিক্রম করিয়াছিলেন—এমন-কি স্ত্রীকে কেবল লেখাপড়ায় নয়,—এতদূর উন্নতমনা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে যখন ইংলণ্ডে গমন করেন তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করেন। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র (ঐ একমাত্র পুত্রই এখন বর্ত্তমান) এ্যালবিয়ান রাজকুমার, যিনি সিবিলিয়ান হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে কোচিনরাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন,—তিনি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বিধাতার বিধানে শশিপদবাবুর পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী দেবী অকালেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান।

তারপর শশিপদবাবু কর্ম্মময় জীবনে বিধাতার ইচ্ছায়, আর এক ধর্ম্মশীলা সেবাপরায়ণা সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপত্নী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ছয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যমা বনলতা দেবী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে "অন্তঃপুর" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শশিপদবাবুর শিক্ষার ফলে তাঁহার সকল কন্যাই গুণবতী আদর্শচরিত্রা হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী গিরিজাকুমারী দেবী বিধবাশ্রমের বিভিন্ন প্রকৃতির অগঠিতমনা নানা শ্রেণীর বিধবা এবং সধবাগণসহ (কাহারো কাহারো সঙ্গে দুই একটি সন্তান) নিজের মেয়েদের লইয়া সমানভাবে সকলের মাতৃবৎ হইয়া ঠিক এক পরিবারভুক্ত সন্তান-সন্ততির ন্যায় সকলকে পরিচালনা করিতেন। আমার ভগ্নীকে দেখিতে গিয়া কতদিন আশ্রমের এইরূপ কার্য্যের পরিচয় পাইতাম। আজ তিনি পরলোকে—কিন্তু তাঁহার কথা আজো আমার মনে জাগরূক

রহিয়াছে। কন্যাগণের মধ্যে এখন একটিমাত্র জীবিতা, আর সকলেই পরলোকে। একটি কুমারীকন্যা ইন্দুবালার জীবনে অল্প বয়সেই আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।

শশিপদবাবু জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেবাব্রতে আজীবন অটল থাকিয়া সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন।

তারপর যিনি একদিন দৈন্যের পীড়নে শিক্ষাত্যাগ করিয়া আটটাকা বেতনের কার্য্য করিতে বাধ্য হন, তিনি সেই অবস্থা হইতে পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া পর-জীবনে জনহিতার্থে লক্ষাধিক মুদ্রা কেমন করিয়া ব্যয় করিলেন! ইহাকেই তো বলে যোগবল! অবশ্য তিনি দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে চাকরীও করিয়াছিলেন, তাহা তো অনেকেই করেন, কিন্তু এরূপ মিতাচারী মিতব্যয়ী সংযমী সৎকর্ম্মশীল কয়জন হইয়াছেন?

শশিপদবাবু শ্রমজীবী গরীব জনসাধারণের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এখন কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হইয়াছে

একসময় সুরাপান নিবারণ জন্য তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার সুফল এখনো বরাহনগর অঞ্চলের অধিবাসিগণ ভোগ করিতেছে।

সেই কোন্ এক সময় বালিকা-স্ত্রীর শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিধবাশ্রম পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার আজীবন চেষ্টা চলিয়াছিল।

তারপর তাঁহার জনসেবার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রেমের চক্ষে সকলকে সমান দর্শন করিয়া সকলেরই সেবা করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে সমাজে নীচজাতীয় ব্যক্তি যাহারা তিনি তাহাদিগের প্রতিও কর্ত্তব্যপালনে কুণ্ঠিত হন নাই। এ-সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি,—ফুলঝারি নামক একজন মেথর ও তাহার স্ত্রী শশিপদবাবুর বাড়িতে কাজ করিত। এই মেথর-দম্পতি বড়ই ভালো লোক ছিল। তাহারা মেথরদিগের ব্যারাকে বাস করিত। শশিপদবাবু তাহার অসুখের কথা শুনিয়া মনে করিলেন, আমার কোনো বন্ধুর অসুখ হইলে আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম। এই মেথর আমার যেরূপ সেবা করে সেরূপ সেবা আর কেহই করিতে পারে না। তাহার এই অসুখের সময় তাহার প্রতি কি আমার কোনো কর্ত্তব্য নাই? দুইদিন এই চিন্তা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তৃতীয় দিনে তিনি পোষাক পরিয়া কলিকাতায় যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে কে-যেন আঘাত করিয়া বলিল, "কৈ তুমি তো গেলে না," শশিপদবাবু সেই বেশেই ব্যারাকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মেথরেরা একেবারে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া উঠিল। তিনি ফুলঝারির বিছানার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্য অর্থ দিয়া আসিলেন।

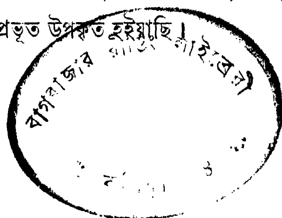
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া তারপর বরাহনগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তিনি সমাজচ্যুত ও ছয়পুরুষের বসতবাড়ি পরিত্যাগ করিতে

বাধ্য হন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট চিরদিন প্রিয় ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ তিনি উচ্চ ভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, কোনোদিন সংকীর্ণতার ভাব তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি যেমন ব্রাহ্মসমাজকে, তেমনই হিন্দু-সমাজ, খৃষ্টীয়-সমাজ, মুসলমানসমাজ প্রভৃতি সকলসমাজ দেখিয়াছেন এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে মৌলিক সত্য আছে, এই বিশ্বাসটিই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল।

তিনি ১২৮১ সালে বরাহনগরে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামে একটি সভাস্থাপন করেন। এই ধর্ম্ম সভায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক একত্রে বসিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু কেহ অপর ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারিতেন না। শশিপদবাবুর শেষ জীবনে এই ভাবের পরিণতি সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মিলনের স্থল "দেবালয়" ও তাহার কার্য্য।

এই কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া প্রথমেই নিজের চৌতল বাড়ি ও তাহার সমস্ত আয় দেবালয়-সমিতির কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমণ্ডলী "সেবাব্রত" উপাধি দান করিয়াছিলেন।

ভগবানের কৃপায় আমি এমন মহাত্মার সঙ্গলাভে, তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম এবং কর্ম্মজীবনে প্রভূত উপকৃত হইয়াছি।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ—ত্রৈলোক্যকে শশিপদবাবুর আশ্রমে রাখিয়া আমি আপাতত সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম। সেখানে তাহার লেখাপড়া ও কিছু শিল্পশিক্ষা হইতে লাগিল।

এদিকে শ্বশুরবাড়ি-সম্বন্ধে মনোমালিন্য দূর হইবার পর, শ্বশুরমহাশয় নিজে আমার স্ত্রীকে আমাদের বাড়িতে আনিয়া দিলেন। কিন্তু স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিব বলিয়া যে সঙ্কল্প ছিল, বাড়িতে সকলের মধ্যে থাকিয়া কার্য্যত তাহা করিতে পারিতাম না। সময় সময় তাঁহার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা দ্বারা তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।

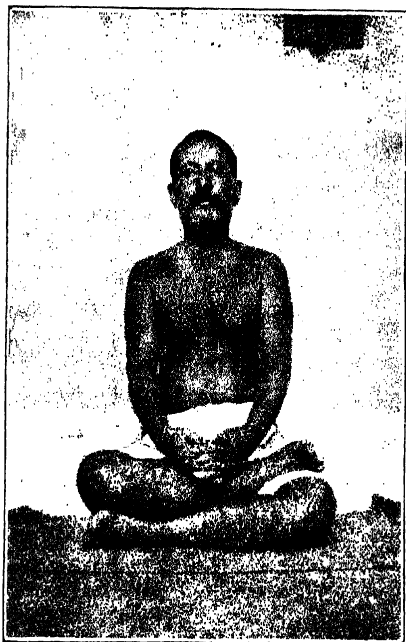
পিতাঠাকুর তো সাংসারিক কোনো কথার মধ্যেই থাকিতেন না। মাতাঠাকুরাণীও অতিশয় সরলপ্রকৃতির ছিলেন। আমার ধর্ম্ম-মতান্তরের জন্য তিনি কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই; তবে বিষয়-কর্ম্মত্যাগের সময়ে সাংসারিক ক্ষতিবোধে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাইরাই আমার বিরোধী হইল। তাহার মধ্যে ছোট দুইভাইএর মনের ভাব যাহাহউক, এ-পর্য্যন্ত আমার সাম্‌নে কোনো কথা বলিতে পারে নাই। উপেন্দ্রই হইল আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সামাজিক এবং সাংসারিক স্বার্থরক্ষায় আমার সঙ্গে তাহাকেই কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইল।

উপেন্দ্রের ধর্ম্মভাব ছিল। সরলভাবে আমার অনুসরণও করিত। রামকৃষ্ণবাবুর ফারম হইতে যে-অর্থ পাইয়াছিলাম, যখন আমি বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইলাম, তখন সেই সমস্ত অর্থই সংসার-প্রতিপালনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয় তাহা দেখিয়াই উপেন্দ্রের মনে তখন স্বার্থ-ঘটিত মনোবিকার উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু চিনির কারখানা অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইয়া মূলধন ব্যতীত যখন আরো কিছু দেনার সম্ভাবনা দাঁড়াইল, এবং আমি চিরদিনের জন্য সংসারের, বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, তখন উপেন্দ্রের মন দমিয়া গেল। তখন আর সে পূর্ব্ব সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিল না; বরং বিরক্ত ও ক্রোধের বশীভূত হইতে লাগিল। এ-অবস্থায় স্বার্থরক্ষার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দিনের সংঘর্ষে একটি অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাই প্রথমে বলিব। ক্ষেত্রবাবুর আহিরীটোলার বাড়িতে যেদিন আমি ত্রৈলোক্যকে রাখিয়া বাড়ি আসিলাম, সেদিন উপেন্দ্র অতিশয় উত্তেজিত হইয়া আমাকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলে; এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেদিন তাহার সঙ্গে বাদানুবাদ না করিয়া প্রায় মধ্যাহ্নকালে আহারাদি না করিয়াই মন্দিরে চলিয়া আসি। তাহার পর বোধ হয় তিন-চারদিন আর বাড়িতে যাই নাই। কিন্তু ক্রমে মনে হইল, বাড়িতে থাকিব না বটে তবু যতক্ষণ আমার স্ত্রী-পুত্র সেখানে আছে এবং তাহাদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্যও রহিয়াছে, ততক্ষণ

আমি বাড়ি যাইব না কেন? এই মনে করিয়া একদিন বাড়ি আসিলাম। প্রথমে নীচের ঘরে বসিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। উপেন্দ্র তাহা উপর হইতে দেখিল। তারপর উপরে যে-ঘরে আমার স্ত্রী থাকিতেন, আমি সেইদিকে যাইতে দেখি, ভিতর হইতে সিঁড়ির দরজা বন্ধ। অন্যদিকে গিয়া দেখি সে-দিকেও ঐরূপ বন্ধ, তখন আমি বুঝিলাম উপেন্দ্রই এইরূপ করিয়াছে, আমি উপরে যাইতে না পারি এই তাহার অভিপ্রায়। তখন আমার মনে হইল, এ কি অন্যায়! এরূপ সংকীর্ণ ভাব তাহার কেন? আমি তো বাড়ি থাকিতে আসি নাই, তবে এরূপ করিবে কেন! তখন আমার মনেও একটু উত্তেজনার ভাব আসিল। আমি একেবারে সদরবাড়ির তেতালার সিঁড়ির পথে সর্ব্বোপরি ছাদের উপর দিয়া দ্বিতলে আমার স্ত্রী যে-ঘরে আছেন সেই ঘরের দিকে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। সিঁড়ির শেষ দরজা—যাহা অতিক্রম করিলেই ছাদে যাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে তাহাও বন্ধ। তখন আর কি করিব, মন্দিরে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু মনে কেমন একটা কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে কে যেন আমাকে চালিত করিয়া আর একবার সেই ছাদের দরজার নিকট লইয়া গেল। তখন আরো সবলে দরজার কপাট ধরিয়া টানিলাম। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! এই-যে-দরজা বন্ধ ছিল, এখন কে খুলিয়া দিল? তবে কি উপেন্দ্রই খুলিয়া গেল? কৈ সে তো আসে নাই! এই ঘটনাকে কোনো অহৈতুক ক্রিয়া বলিয়া আমার মনে না হইলেও ভগবানের সেই অভাবনীয়

কৃপায় আমার এই বিশ্বাস হইল, আমি যে-পথে যাইতেছি, এইরূপে ভগবান্ আমাকে সকল সঙ্কটে জয়যুক্ত করিবেন। তার পর, স্ত্রীর সহিত কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া মন্দিরে চলিয়া আসিলাম।



উপেন্দ্রনাথ

ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে প্রস্থানের কিছু পূর্ব্বের একখানি ছায়াচিত্র (ফোটোগ্রাফ) গৃহীত ছিল, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের মধ্যে তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়া আনন্দ হইল।

তৃতীয় পরীক্ষা জয়—ব্রহ্মমন্দিরে নির্জ্জনসাধনায় প্রথমে সহজজ্ঞানে এই বুঝিলাম, ভগবান্ পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, আমার অন্তরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে প্রাণ দিয়া পিতা, প্রভু, অথবা মা জননী বলিয়া ডাকিলে তাঁহার স্পর্শ প্রাণে অনুভূত হয়। তাঁহার কৃপাগুণে তাহাই হইতে লাগিল। প্রাণে প্রাণেই তাঁহাকে বুঝিতে লাগিলাম। সময় সময় প্রাণ বিগলিত হইতে লাগিল। সকলসময় কেবল আপনার ভিতর আপন মনে একান্তে চিন্তা করিতেই ভালো লাগিত। তদুপযুক্ত স্থানও পাইয়াছিলাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসার হইতে বাধা পাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আর একটি পরীক্ষা উপস্থিত হইল।

চিনির কারখানার দগ্ধাবশিষ্ট উদ্ধার করিয়া দণ্ডীদাদা অবশেষে ১৬৫০৲ টাকা দেনার হিসাব দিয়া আমাদের সংসার হইতে পিতা, কন্যা লইয়া আবার খাঁটুরার বাড়িতে গেলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ায় তিনি আশঙ্কা করিলেন—আমার সঙ্গে এক-সংসারে থাকিলে যথাসময়ে কন্যার বিবাহে হয়ত বেগ পাইতে হইবে। তা-ছাড়া আমি যখন বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম তখন আর কিরূপে এ-সংসারে থাকিবেন।

ভ্রাতা উপেন্দ্রও দেখিল, দাদার উপার্জ্জন আর পাইব না, অধিকন্তু এই সাড়ে ষোলশত টাকা দেনার ভার গ্রহণ করিতে হয়, অতএব এ-দেনা দাদার স্কন্ধে দিয়া পৃথক হওয়াই শ্রেয়! কিন্তু চিন্তা ও কল্পনা মাত্রেই পৃথক হওয়া তো সহজ নয়, তখনো আমার স্ত্রী-পুত্র সংসারে রহিয়াছে, সবই সমানভাবে চলিতেছে; কেবল আমিই নিজে গৃহ ছাড়িয়া মাঠের মাঝখানে আসিয়াছি।

প্রথমেই আমি পাওনাদারগণকে বলিলাম, এই দেনা আমি এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। আমার হাতে আর নগদ টাকা নাই, আছে কেবল বরাহনগরে একখানি বাড়ি। তাহা বিক্রয় করিয়া দিলে সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবে। আমি প্রস্তুত আছি, সকলে সম্মত হইলে বাড়ি বিক্রয় হইতে পারে।

পাওনাদারেরা দেখিলেন উপেন্দ্রই বাড়ি বিক্রয়ে অসম্মত, কাজেই উপেন্দ্রকে সকলে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র সর্ব্বদা তাগাদার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সকলকে লইয়া বরাহনগর গেল। পিতা বিরক্ত হইয়া প্রথমে সকলের সঙ্গে বরাহনগর যান নাই। শেষে বাধ্য হইয়া গিয়াছিলেন।

বাড়ি হইতে আমার বিকলাঙ্গী পত্নীকে লইয়া যাইতেও উপেন্দ্রকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল—তিনিও কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে গিয়া তিনি আরো কষ্টে পড়িয়াছিলেন।

আমি ব্রহ্মমন্দিরে থাকি, এইসকল ঘটনার কিছুই জানিতে পারি নাই। পরে শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। কেন-না, এতটা করা উপেন্দ্রের উচিত হয় নাই। যাহাহউক তখন চুপ করিয়াই রহিলাম।

উপেন্দ্রের এই কার্য্যের ফল আরো বিপরীত হইল। একটি স্ত্রীলোকের পাঁচশত টাকা পাওনা ছিল। তিনি বরাহনগরে গিয়া তাগাদা করিয়া সকলকে অতিশয় উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। আমার মুখে সকলে একই কথা শুনিয়া আমার নিকট কেহ তাগাদা করেন নাই।

একদিন আমি উপেন্দ্রের পত্র পাইলাম—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল। "দাদা, একবার আসুন, আমরা আর এখানেও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। সকলের সম্মতিক্রমে বরাহ-নগরের বাড়ি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে। গঙ্গাধর সেন মহাশয় বাইশশত টাকায় বাড়ি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি আসিয়া দলিলে সহি দিয়া যান।"

আমি এই পত্রের উত্তরে লিখিলাম। বাড়ি বিক্রয়ের টাকা লইয়া কে দেনা মিটাইবেন তাহা আগে স্থির কর। উপেন্দ্র লিখিল, "আমরা লইয়া সমস্ত কার্য্য করিব।" আমি লিখিলাম, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা সঙ্গত হইবে না, একজন মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া এই কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন। এইকথার মীমাংসা করিতে দুই-একবার উপেন্দ্র আমার নিকট আসিল। শেষ বাদপ্রতিবাদের পর স্থির হইল, আমাদের উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে উমেশদাদা টাকা লইয়া দেনা মিটাইয়া দিবেন।

উমেশদাদার হাতে টাকা দিতে উপেন্দ্র প্রথমে আপত্তি করে, শেষে ঐ-কথাই স্থির হয়। এইসকল ব্যাপার লইয়া প্রায় দুই-তিনমাস পর্য্যন্ত অশান্তির আঘাত পাইয়াছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় সকলকার্য্যই ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় শেষে প্রভূত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। পাওনাদারেরা সকলে সম্পূর্ণ টাকা পাইলেন। এজন্য উমেশদাদা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রতি তাঁহার ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ।

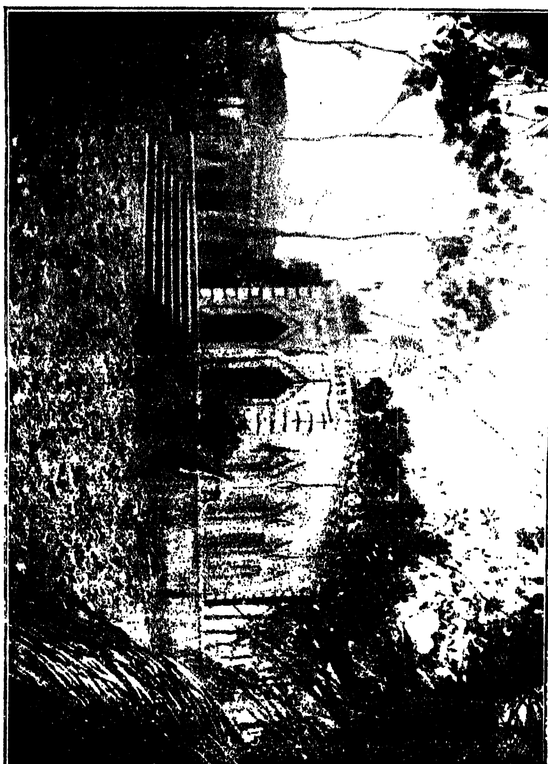
ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির—কোন্ দুর্লক্ষ্যসূত্রে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া পড়িলাম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুরেন্দ্র-শোকে ব্যথিত হৃদয় লইয়া প্রথম দিনে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার প্রথমে গাহিয়াছিলাম "দে মা স্থান শান্তিনিকেতনে" বস্তুত দাসের জন্য এই সাধনক্ষেত্র ব্রহ্মমন্দির বিধাতা যেন অগ্রেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই মন্দিরে অবস্থানের পূর্ব্ব পরিচয়ে বলিয়াছিলাম ;—

স্থানটি বড়ই অনুকুল হইল, অথচ কাহারো প্রস্তাবে বা কাহারো অনুমতি লইয়া এখানে আসি নাই। এখানে থাকিলে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিভাজন ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় সন্তুষ্ট, ইহাই কেবল বুঝিয়াছিলাম। আমি স্ব-ইচ্ছাতেই এখানে থাকিতে লাগিলাম।

মুক্ত প্রান্তর-মধ্যস্থিত ব্রহ্মমন্দিরের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এবং উন্নত চূড়া যেন উর্দ্ধাঙ্গুলী-সঙ্কেতে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নাম স্মৃতি-পথে আনিয়া দিতেছে। আমি প্রাতঃসন্ধ্যার স্নিগ্ধ শান্ত সমীরণ প্রবাহে প্রশস্ত রোয়াকে কখনো পাদচারণা বা উপবেশন, কখনো শয়ন, স্বাধীন-মুক্তভাবে স্থিতি করিতে লাগিলাম। আত্মচিন্তা, আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কত লুপ্ত স্মৃতির জাগরণে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কত সৎসঙ্কল্পে হৃদয় ভরিয়া উঠিত! আবার কখনো-বা স্বতঃউৎপন্ন শান্তি-সুখস্পর্শে

ভাবমগ্নাবস্থায় স্বচ্ছন্দেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। দিনান্তে একবার স্বহস্তপ্রস্তুত সাদাসিধারকমে খেচরান্ন বা ভাতে



বাঁটরা ব্রহ্মমন্দির

ভাত মাত্র আহার—তাহাতেই তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলাম; মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে শনিবারে ক্ষেত্রবাবু আসিতেন, কোনো বারে তৎসঙ্গে সরস্বতী সেন মহাশয়া

এবং স্নেহলতাও আসিতেন, উপাসনা হইত; আনন্দে দিন কাটিয়া যাইত। রবিবার থাকিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইতেন।

বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস এবং শুভ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচারোদ্দেশ্যে ঐকান্তিক যত্ন এবং অর্থব্যয়ে এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১২৮৫ সালের ৬ই আষাঢ় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার আছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন কতিপয় প্রচারকবন্ধু-সহ খাঁটুরায় আগমন করিয়া স্বয়ং এই মন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। একখণ্ড নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমির উপর ফলপুষ্পবৃক্ষলতা-পরিশোভিত উদ্যান-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত।

বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ এই মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু তাঁহার আত্ম-জীবনীর একস্থানে বলিয়াছেন—"যখন বসন্তকে হারাইলাম, তারপরই বিধাতা লক্ষ্মণকে আনিয়া দিলেন।"

পিতার অসন্তোষ জন্মিবার আশঙ্কায় মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে লক্ষ্মণবাবুকে অর্থব্যয় করিতে ক্ষেত্রবাবু নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এ-কথা আমি ক্ষেত্রবাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির-সাধনক্ষেত্রে সাতবৎসর অবস্থিতি করিয়া পরবর্ত্তীকালে বহু ঝটিকা-ঝঞ্ঝাবাতে আমার যে-ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছিল, তাহা যদি বিধাতা এমন শান্তিময় স্থানে রাখিয়া দৃঢ়মূল না করিতেন, তবে যে তাঁহার লীলাবিধান ব্যর্থ হইয়া যাইত।

প্রত্যাদেশ—ব্রহ্মমন্দিরে নির্জ্জনবাসে সাধনাবস্থার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় একদিন একটি ঘটনা ঘটে। ফলত সেটি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বিশেষ ঘটনা। কিন্তু যে-দিন তাহা সংঘটিত হয়, তারপর তাহার ধারণা আর মনের মধ্যে তেমন স্পষ্ট ছিল না। তারপর যখন খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে থাকার সময়ে আত্মচিন্তা-নিরত মনের শান্তভাব স্থায়ী হইতে লাগিল, তখন আবার সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠিল! সে-কথা পরে বলিতেছি।

পূর্ব্বে যখন মহাপুরুষগণের চরিত পাঠ করিয়া ধর্ম্মবিষয় চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহারও পূর্ব্বে যখন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজের উপর আমার আস্থা চলিয়া গেল, তখন মনে হইয়াছিল, কোন্ ধর্ম্ম অথবা সাধনার কোন্ পথ ঠিক? পরমহংস-প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম "যত মত ততো পথ" আমার অন্তঃকরণ যে-ধর্ম্ম চাহিতেছে তাহা একমাত্র ঈশ্বরের পথ হওয়া চাই; ক্রমশ মনে হইতে লাগিল ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই এক ঈশ্বরের সাধন-পথ।

আর একটি কথা স্বভাবত আমার মনে হইত, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হইবে না কেন? এ-সংসার কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়? তবে ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে সংসারের বাহিরে যাইতে হয় কেন? আমি এমন ধর্ম্মসমাজ চাই যাহার পারিবারিক গঠন ঈশ্বরপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একসময় দেখিলাম, খৃষ্টীয়সমাজে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সকলে মিলিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের বন্দনা—প্রার্থনা সদুপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া জনসেবার ভাবে সমস্ত

দিনের কার্য্য করেন; বালকবালিকাদিগকে শিশুকাল হইতে সুশিক্ষিত এবং ধর্ম্মভাবে গঠিত করিবার কতরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে তো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরেচ্ছায় খৃষ্টের জন্মবৃত্তান্তে যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম, তবে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিকতত্ত্বে দ্রোণ-মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম, পাণ্ডব-জন্ম-বৃত্তান্তের আদর্শ, ভূরী ভূরী অস্বাভাবিক বর্ণনায় অবিশ্বাস হইল কেন? জানি-না, ঈশ্বরের কোন্ করুণায় প্রথমেই এমন-এক বিজ্ঞান-ঘন দৃষ্টি কোথা হইতে পাইলাম যে, বেদ বাইবেল যতবড় ধর্ম্মশাস্ত্র হউক তাহাতে যদি কোনো অবৈজ্ঞানিক অস্বাভাবিক কথা থাকে তাহা কখনো সত্য হইতে পারে না, এই হইতে সমস্ত কুসংস্কার যেন আমার নিকট ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ঈশ্বরের সাধন-পথ বলিয়া বুঝিলাম, তার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক অবস্থার মধ্যেও দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজের নরনারীমাত্রেই শিক্ষিত; এখানে বালকবালিকার ধর্ম্মনীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সপরিবারে ঈশ্বরোপাসনা হইয়া থাকে। এখানে যেমন জ্ঞান ও ভক্তির সাধনা আছে, তেমনি প্রেম ও স্বাধীনতার ভূমি আছে। তখন আমার মনে হইল ব্রাহ্মধর্ম্মই উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, আর সব ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক —এক-একটি মহাপুরুষের নামে কল্পিত। কিন্তু মহাপুরুষরা কাহার ভজনা করিতেন, কাহার কথা বলিতেন? তাঁহারা কি আত্মপূজা প্রচার করিয়াছিলেন? যিশুখৃষ্ট কি কোথাও বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার নামে উপাসনা করিবে? গৌরাঙ্গ

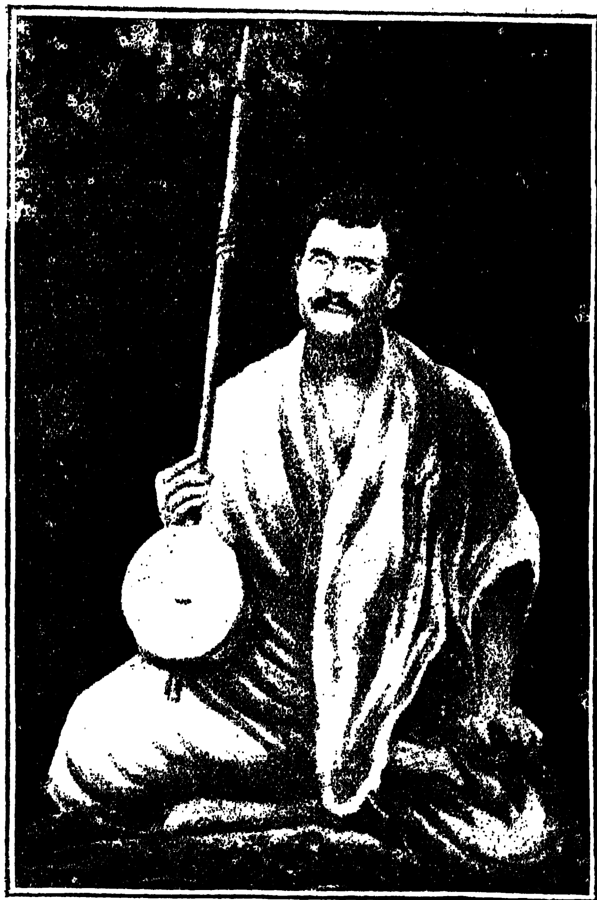
কি বলিয়াছিলেন, তোমরা আমাকেই হরির আসনে বসাইবে? তা-ছাড়া ভারতবাসী একধর্ম্ম—এক সমাজগত না হইলে স্বাধীন হইতে পারিবে না।

আমি যাহা বিশ্বাস করিতে চাই তাহা আমার বিশ্বাসে একেবারে নিরেট (Solid) হওয়া চাই, তার মধ্যে একবিন্দু 'অতএব' 'যেহেতু'র স্থান থাকিবে না। মনের এইরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি টান দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইসময় একদিন মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, ব্রহ্মমন্দিরে লোক প্রবেশ করিতেছে—সেদিন রবিবার, উপাসনা আরম্ভ হইবে। আমিও ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপাসনার কথা শুনিতে লাগিলাম, উপাসনা খুব ভালো লাগিল ক্রমে ভাবে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল।

আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; তা-ছাড়া তাঁহার অবস্থিতি কালে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম এমন ধারণাও আমার ছিল না,—তবে কিছুদিন পূর্ব্বে (আমার মনের এই পরিবর্ত্তিত কালে) একতারা-হাতে উপাসনা অবস্থায় কেশবচন্দ্রের সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি ছবিতে দেখিয়াছিলাম। সেদিন বেদীতে বসিয়া যিনি উপাসনা করিতেছিলেন তাঁহাকে তখন আমি চিনিতাম না। পরে যখন প্রচারক মহাশয়দিগকে চিনিয়াছিলাম, তদনুসারে মনে হয় আচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ই ছিলেন। কিন্তু উপাসনা-কালীন আমি অন্তরচক্ষে দেখিলাম, কেশবচন্দ্র বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন। সমস্ত উপাসনার মধ্যে আমার অন্তরে

এইরূপ একবাণী ফুটিয়া উঠিল, "তুমি এই মহাপুরুষের অনুসরণ



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

করো, বর্ত্তমান সময়ে ইহার জীবনে ধর্ম্মসমন্বয় হইয়াছে, তুমি আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা খুজিতেছ তাহা ইহার মধ্যে পাইবে।” উপাসনা ভাঙিয়া গেল। মন্দির হইতে চলিয়া আসিলাম, ঐ-বাণীও অন্তরে ডুবিয়া গেল। তাহার কতদিন পরে অবস্থা এবং চিন্তার অনুকূল সময়ে অর্থাৎ খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে অবস্থান-কালে ঐ-বাণী অন্তরে জাগিয়া উঠিল, তাহা প্রথমে বলিয়াছি।

তারপর ক্রমশ অভিজ্ঞতার অবস্থায়—চিন্তার বিভিন্ন তরঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে কতকথা—কুচবিহার বিবাহের নিন্দাবাদ—সমালোচনা কতই শুনিয়াছি; সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার মহত্ত্বে স্থির বিশ্বাস রাখিতে পারেন নাই—‘মানুষ হিসাবে সকল মানুষই সমান’, এইরূপ ধারণাটা যাঁহাদের খুব প্রবল ছিল, তাঁহাদের অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ভাবও বুঝিয়াছিলাম। অন্যদিকে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের আগাগোড়া জীবনসাক্ষী সহগামী অনুগত বিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধু—তন্মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়—যাঁহাতে কোনো পক্ষের অন্ধ বিশ্বাস দৃষ্ট হইত না, যিনি বিবেকী জ্ঞানী স্বাধীনচেতা ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহার উপাসনার ভিতর দিয়া এবং মুখের কথাপ্রসঙ্গ-মধ্যে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এবং ‘নববিধান’-তত্ত্বে তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস ছিল, এসমস্ত শুনিবার, চিন্তা করিয়া বুঝিবার সুযোগ আমার অল্প ঘটে নাই। তারপর ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়—যিনি কুচবিহার বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াছিলাম, তা-ছাড়া আমি প্রথম হইতে শেষ

পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রকে মনুষ্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ঐ বাণী—"ইনিই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসমন্বয়কারী মহাপুরুষ" এই প্রত্যাদেশে কোনোদিন আমার অবিশ্বাস ঘটে নাই।

আমি কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মভাবের 'অনুকরণ' কিম্বা অনুসরণও করিতে কখনো চেষ্টা করি নাই—আমার সাধ্য শক্তির বিষয়ও তাহা নহে। আমি চিরদিন ভগবানের দিকে তাকাইয়া নিজ বিবেক এবং নিয়তির পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবানের-বিধানে আমাতে যে-ধর্ম্মবিশ্বাস বা আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আমার স্বদেশ—জন্মভূমিতে (বা তাহার বহিরে যদি কিছু) যথাসাধ্য প্রচার করিয়া বন্ধুগণের প্রাণে প্রীতিসদ্ভাব বিস্তার করিতে আজীবন যত্ন করিয়াছি। বিশেষভাবে কেশবচন্দ্রের কিংবা সমস্ত সাধু মহাজনগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন্ বৈজিক শক্তিতে দাসের ক্ষুদ্র ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে সে-বিচার দাসের উদ্দেশ্য ও শক্তি-সাধ্যের অতীত; দাসের আত্মকথার ইতিহাসে দাসের ধর্ম্মজীবন, যে-বিশ্বাসধারায় উপকৃত, ধর্ম্মপিপাসু ভবিষ্যৎ বংশের জন্য তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া, আজ সেই বিশ্বাস-যোগে মুক্ত-আকাশের 'পাখীর দলে' মিলিতে চলিয়াছি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র ও মঙ্গলগঞ্জ—উমেশ দাদার মুখে ভক্ত লক্ষ্মণচন্দ্রের উচ্চান্তঃকরণের কথা শুনিয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র মঙ্গলগঞ্জ দেখিবার ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য বনগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া ঘটনাক্রমে তখন আর যাওয়া হইল না। তারপর যথা-সময়ে লক্ষ্মণচন্দ্র খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া আমাকে সাদর আলিঙ্গন দানে প্রাণের প্রীতি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। এবং একদিন বৈরাগীর ব্যবস্থামত কাটাইলেন। তখন বুঝিলাম তিনি যে কেবল বিচক্ষণ বিষয়ী বা ধর্ম্মশীল দাতা তাহা নহেন, তিনি প্রেমিক ভক্ত এবং প্রচ্ছন্ন বৈরাগী, বৈরাগ্যভাবে তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহ যথেষ্ট। যাইবার সময় আমাকে মঙ্গলগঞ্জে যাইতে একান্ত অনুরোধ করিয়া গেলেন।

কয়েকদিন বাদে—বোধ হয় সামান্য কোনো উপলক্ষ্যে মঙ্গলগঞ্জে গেলাম। তখন বনগ্রামের ঘাটে মঙ্গলগঞ্জে যাইবার জন্য সর্ব্বদা নৌকা প্রস্তুত থাকিত, সুতরাং তজ্জন্য কোনো অসুবিধাই ছিল না।

বনগ্রাম মহকুমার ছয়ক্রোশ পশ্চিমে ইছামতী নদীর দক্ষিণ কূলে মঙ্গলগঞ্জ অবস্থিত। লক্ষ্মণবাবু তদীয় পিতা মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয়ের নামানুসারে স্বীয় জমিদারী কাছারী-

সংক্রান্ত কার্য্যক্ষেত্রের 'মঙ্গলগঞ্জ' নামকরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এইস্থান নদীতীরস্থ শ্মশানঘাটবিশেষ ছিল। লক্ষ্মণবাবু নিজে এইস্থান নির্ব্বাচন করিয়া বিস্তৃত ক্ষেত্রের তিন-দিকে পরিখাবেষ্টিত ফলফুলশস্যক্ষেত্রস্থ উদ্যান-বাটিকা, 'প্রচারাশ্রম' ও দ্বিতল কাছারীবাড়ি-সম্বলিত এক মনোরম স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মঙ্গলগঞ্জের পূর্ব্বের অবস্থা এখন আর নাই ; লক্ষ্মণচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে সে অবস্থা চলিয়া গিয়াছে।

বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ আমাপেক্ষা সাত-আট বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নীও তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। তারপর তিনি একমাত্র শিশু-কন্যা স্নেহলতাকে রাখিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। লক্ষ্মণবাবুর আত্মীয়া সরস্বতী সেন মহাশয়া স্নেহলতাকে চারবৎসর বয়সে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

লক্ষ্মণবাবু আঠারো বৎসর বিপত্নীক অবস্থায় জমিদারী কার্য্যে সদ্ভাবে প্রজাপালন, মঙ্গলগঞ্জের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও নানা জনহিতকর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে যখন লক্ষ্মণচন্দ্রের যোগ হইল এবং আমি যখন মঙ্গলগঞ্জে গেলাম, তখন তাঁহার শিশুপুত্র সুমঙ্গলচন্দ্র, আর তাহার কনিষ্ঠা নিতান্ত শিশু কন্যা সুপ্রভাকে দেখিয়াছিলাম মাত্র। তারপর তাঁহার আরও চার কন্যা ও কনিষ্ঠ একপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শুনিয়াছিলাম, মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয় জীবিতকালেই লক্ষ্মণবাবুকে জমিদারীর কার্য্যভার অর্পণ করেন। পিতার অনভিপ্রেত ব্রাহ্মসমাজের কাজে বা নিজের রুচিমতো খরচ-পত্রের স্বতন্ত্র স্বোপার্জ্জিত অর্থাগমের জন্য মাতুল ক্ষেত্রবাবুর নিকট হইতে কিছু মূলধন লইয়া একটি নীলকুঠীর কার্য্য আরম্ভ করেন। তারপর ঐ নীলকুঠীর কাজে প্রভূত অর্থাগম হইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু ও লক্ষ্মণবাবু মিলিতভাবে অর্থাৎ একের অর্থে, এবং অন্যের পরিশ্রমে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা "মঙ্গলগঞ্জ-মিশন-ফণ্ড" নামে এক দাতব্য-ভাণ্ডার স্থাপন করেন। এ-প্রদেশে শিক্ষাবিস্তার ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সাহায্যদান, খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের মালীর বেতন, ও উৎসবাদির ব্যয় এবং অন্যান্য সৎকার্য্যের জন্য দান সমস্তই ঐ-মিশন-ফণ্ড হইতে নির্ব্বাহ হইত। আমি যখন মঙ্গলগঞ্জে যাই তখন মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মঙ্গলগঞ্জের নীলকুঠী ছাড়া তখন আরো দুইটি (বাঘাডাঙ্গা ও জয়পুর) নীলকুঠীর কার্য্য চলিতেছিল।

স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় ধর্ম্মভাবের পরিচয়-স্বরূপ একটি কাজ ছিল—গোপনে দান। খাঁটুরা প্রভৃতি গ্রামের নিঃস্ব ভদ্র গৃহস্থ-মধ্যে তাঁহার কতকগুলি নিয়মিত মাসিক সাহায্য, তাঁহার মৃত্যুর পরেও লক্ষ্মণবাবু কিছুদিন পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছিলেন। ঐ মাসিক দানের টাকা (বোধ হয় পঞ্চাশ টাকার কিছু বেশী) মাসে মাসে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে আমার নিকট পাঠাইতেন, আমি তাহা বিলি করিয়া দিতাম।

আমি প্রথমবারে কয়েকদিন মঙ্গলগঞ্জে থাকিয়া খাঁটুরায় ফিরিয়া আসি। তারপর মধ্যে মধ্যে আমার যাওয়া ও লক্ষ্মণ-বাবুর খাঁটুরায় আসা চলিতে লাগিল। তখন কলিকাতা হইতে নববিধান-প্রচারক মহাশয়গণ সর্ব্বদাই মঙ্গলগঞ্জে আসি-তেন। তাহাতে নিয়মিতরূপে উপাসনার একটা জমাট ভাব রক্ষিত হইত। সেই বিশেষ ভাবের উপাসনাদির মধ্যে যোগ দিয়া আমি সাধনপথে অনেক উপকৃত হইয়াছিলাম। বস্তুত সেইসময় হইতে উপাসনাতত্ত্বের ভিতরকার ভাবে আমার আকর্ষণ জন্মিয়া-ছিল। সাধনভজনের এমন সানুকূল স্থান ও অবস্থার সমাবেশ সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন মঙ্গলগঞ্জে সমাগত কয়েকটি যুবক-কর্ম্মচারীও ঐ-উপাসনায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের চরিত্র ও ধর্ম্মভাবের উন্নতি ঘটিবার সুযোগ হইয়ছিল। তন্মধ্যে অমৃতলাল ঘোষ একজন—যিনি পরিণামে "ঘোষ এণ্ড সন্স" নামে জুয়েলারী দোকান করিয়া বিখ্যাত ও ধনশালী হইয়াছিলেন।

আমার মঙ্গলগঞ্জে যাওয়া এবং লক্ষ্মণবাবুর খাঁটুরায় আসা, ইহা একটি শুভ সংযোগের ঘটনায় পরিণত হইল। আমরা সর্ব্বদা একত্রে ভগবানের নাম (উপাসনা প্রার্থনা) করিতে করিতে আমাদের প্রাণের ধর্ম্মভাব ও তাহার প্রচার-স্পৃহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। দু-একটি ধর্ম্মবন্ধুসহ বা আমরা উভয়ে খালিপায়ে গৈরিক উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক 'একতারা'-যোগে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে প্রত্যূষে এক এক গ্রামে গমন করিতে লাগিলাম। কখনো গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা গৈপুর ইছাপুর

পর্য্যন্ত, কখনো মঙ্গলগঞ্জের সন্নিহিত এক এক গ্রামে—একবার গোপালনগর গরীবপুর রাণাঘাট শান্তিপুর পর্য্যন্ত, একবার অমৃতলাল ঘোষের দেশে খুলনা জেলার থেঁসেরা কাটিপাড়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করা হয়।

লক্ষ্মণচন্দ্র যখন সাধনভজন—ধর্ম্মপ্রচারে মন দিতেন তখন তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। আবার যখন কাছারীতে বসিয়া বিষয়কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেন, তখন মনে হইত তিনি ঘোর বিষয়ী। যখন সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন —নিয়মিত পরিচারক-পরিচালক থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে নিজ হস্তে তাহাদের স্নান-আহার করাইয়া দিতেন, তখন মনে হইত তিনি ঘোর সংসারী। মনে হয় সমন্বয়ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার জীবনে এইরূপেই বিকশিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দদল—সর্ব্বপ্রথমে চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) মহাশয়ের সঙ্কলিত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তকে—ব্রাহ্মসমাজের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিয়াছিলাম, যোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে রক্ষণশীল সভ্যগণের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি উন্নতিশীল যুবকদলের জাতিভেদ-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া প্রথমে মতভেদ ঘটে, তাহার ফলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে আর একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত হয়। ইহার পর ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ সমস্ত ভারতব্যাপী হইয়া পড়ে।

তারপর যেদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের মধ্যে শুনি, "যদি এভবে পার হবে ছাড় বিষয়-কামনা," বোধ হয় সেই সময়েই একথা শুনিয়াছিলাম যে, কেশববাবুর কন্যার সহিত কুচবিহার রাজার বিবাহ-সূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গণ্ডগোল হইয়া কেশববাবুর সমাজ হইতে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে আর এক পৃথক সমাজ হইয়াছে। তারপর ক্ষেত্রবাবু ও খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গে যখন আমার যোগ হইল, তখন হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভেদভাবের আমূল ইতিহাস-বৃত্তান্ত উভয় সমাজের দিক হইতে বিভিন্নভাবে অবগত হইতে লাগিলাম। ক্ষেত্রবাবু ও লক্ষ্মণবাবু যে কেশবচন্দ্রে বিশ্বাসী ছিলেন, অবশ্য তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিছুদিন পরে দেখিলাম, কেশবচন্দ্রের অনুগামী প্রচারকদলের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তেজস্বী স্বাধীনচেতা জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁহার চাল-চলন উপাসনা-প্রণালী, অন্যান্য প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত ভিন্ন রকমের। ক্রমে তাঁহার উপাসনার ভিতর হইতে ইহাও অনুভব করিলাম যে, কেশবচন্দ্রে তাঁহার যে বিশ্বাস তাহা উজ্জ্বল জ্ঞানমূলক। নববিধানমণ্ডলীর মধ্যে প্রতাপবাবুর অনুগামী উদারভাবাপন্ন কতকগুলি সাধক ছিলেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথমে মনে হয়। আমাদের ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় আজীবন প্রতাপবাবুর অনুগত ধর্ম্মবন্ধু ও তাঁহার ভাবাপন্ন ছিলেন। সে সময় এইসমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ গভীরাত্মাদিগের উপাসনা ও

প্রসঙ্গাদির সঙ্গী হইতে পারিয়া সাধন-পথে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম সাধারণের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইলেও তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রের সহসাধক অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মও ছিলেন। ক্ষেত্রবাবুর যোগে ও স্বভাবত তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় হইল। ভেদভাব নাকি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রেই জন্মিয়াছিল, কুচবিহার-বিবাহ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যাহাহউক এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রচারিত ভাবধারা—ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে "নববিধান" নামে ঘোষণা করেন। তখন উভয় সমাজের মধ্যে রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে আরো পার্থক্য হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ভেদভাব আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন-কি—এখন যে এই উভয় দলের মধ্যে কদাচ দুই-একটি বিবাহ হইতেছে তখন তাহা হইত না। লক্ষ্মণবাবুর বিধবাবিবাহ—যে-কথা লক্ষ্মণচন্দ্র-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া সঙ্ঘটিত এবং অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—সম্ভবত তাহা ঘটনাক্রমেই হইয়াছিল।

আমি যখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর আসিয়া পড়িলাম তখন এইসমস্ত ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বুঝিবার সুযোগ আমার পক্ষে বিশেষরূপে ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে তিনটি বিভাগের ভাবে এবং উপাসনা-প্রণালীতে যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হইল। নববিধান-মণ্ডলীর সাধনভজন—উপাসনা-প্রণালীর সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধন-প্রণালী ও ভাবের যে-পার্থক

তাহাও বুঝিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মসমাজের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মতভেদ সম্বন্ধে ভাবের ভিতর দিয়া তখন যাহা বুঝিয়াছিলাম এখন তাহার উপর সংক্ষিপ্ত ভাষায় এই বলিতে পারি যে, প্রাচীন ধর্ম্মধারায় উপনিষদ-ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভক্তির সাধনায়—অর্থাৎ ভগবত-লীলাবিধান-তত্ত্বে এবং একেশ্বরবাদমূলক শুষ্ক জ্ঞানের বিচারে যে-ভেদ বা বিরোধ, তাহা প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজেও প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহাহউক আধ্যাত্মিকতার পার্থক্যের জন্য উভয় বিভাগের সামাজিক অঙ্গে মেলামেশা—আদান-প্রদান বন্ধুতার মধ্যে বিশেষ বিরোধভাব রাখিতে আমার ভালো লাগিত না। তথাপি ঘটনাক্রমে প্রথমে নববিধান-মণ্ডলীর অনুগত পক্ষ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার অনুগামী বিশ্বাসী প্রচারকদলে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়া একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়। তারপর সেই বিচ্ছিন্নতা দূর হইয়া পরস্পরের মধ্যে যাহাতে মিলন হয় তজ্জন্য কতিপয় প্রচারক এবং মণ্ডলীর কয়েকজন বিশিষ্ট সাধক-ভক্ত অনেকদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তখন মণ্ডলীর সাধনভজন-উপাসনার মধ্যে একটা সজীবভাব চলিয়াছিল। আমি সেইসময় সেইঅবস্থায় প্রথমত ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গসূত্রে প্রচারকদল এবং মণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত ও সংযুক্ত হইয়াছিলাম।

সম্ভবত ১২৯৫ সালের শেষভাগে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ এই প্রচারকদলের মিলনসাধনার্থে সমস্ত প্রচারককে মঙ্গলগঞ্জে সাদর-আহ্বান করিয়া এক উৎসবের আয়োজন করেন। তাঁহার

উদ্দেশ্য ছিল—সপ্তাহকাল সকলে একত্রে অবস্থিতি ও একত্র উপাসনাদি করিয়া সদ্ভাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মণ্ডলীর বিধিব্যবস্থা ও উপাসনা-মন্দিরের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবেন।

লক্ষ্মণচন্দ্রের এ-চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত প্রচারক ও উপাসক-মণ্ডলীর বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মঙ্গলগঞ্জে আগমন করিয়াছিলেন। সেই বিরাট আয়োজনের মধ্যে ভজনানন্দের সঙ্গীরূপে আমিও ছিলাম।

ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় পুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথমাবস্থার জ্ঞানগত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সামঞ্জস্যের আকারে লীলাবিধান-তত্ত্বমূলক যে-আদর্শ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি বিশেষ আদর্শ তাঁহার স্বদলে ধর্ম্মসাধন। এ-পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক জগতে গুরুশিষ্য-মূলক ধর্ম্মের যে প্রকার অসম্পূর্ণ আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'গুরু ভিন্ন মুক্তি নাই' এই বদ্ধমূল সংস্কার অবিসংবাদীভাবে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানযুগে ঐ-সংস্কারমুক্ত—এক নূতন আদর্শ—এক পরমগুরু অন্তর্য্যামী পুরুষের আদিষ্ট বিশ্বাসী ভক্তদল-গঠনের জন্য-নেতারূপে পৃথিবীতে কেশবচন্দ্রের আগমন। তাঁহার সে-কার্য্য—সে-আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আজ যুগ-ধর্ম্ম-প্রভাবেই জগতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতামূলক সমন্বয়-আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে।

এখানে কেশবদলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা আমার নিজ উক্তিদ্বারা না দিয়া "কেশবচরিত" হইতে আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কেশবচন্দ্র দলপতি এবং নেতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে নেতৃত্ব করিতে এরূপ আর কেহ পারেন নাই। ১৮৬১ সালে বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৬৩ সালে তাহাতে যোগ দেন। তদনন্তর ৬৪ সালে অমৃতলাল বসু, ৬৫ সাল হইতে উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ গুপ্ত, তাহার পর যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌরগোবিন্দ রায় ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কান্তিচন্দ্র মিত্র, দীননাথ মজুমদার, প্রসন্নকুমার সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, রামচন্দ্র সিংহ, কেদারনাথ দে, কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ। ইহার মধ্যে অন্নদা, যদুনাথ, বিজয়কৃষ্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ জন তাঁহার সঙ্গে শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন।

এতগুলি ভদ্রসন্তান এই কলিযুগে বিষয়কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের চরণ সেবার্থে জীবন উৎসর্গ করিলেন ইহা সামান্য ঘটনা নহে। কেহ কাহারো নিকট পরিচিত ছিলেন না, ভিন্নজাতি, ভিন্ন অবস্থা; বিধাতা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া এক পরিবারে আবদ্ধ করিলেন। অন্যূন বিশবৎসর কাল এই দলের উপর কেশবচন্দ্র কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতির উচ্চ আদর্শ এই দলের মধ্যে যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য তিনি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতকগুলি ভক্ত প্রস্তুত করা তাঁহার বিশেষ কাজ ছিল। এক প্রত্যাদেশের স্রোত সকলের মধ্যে বহিবে, স্বাভাবিক বিচিত্রতা প্রেমে সমান হইয়া যাইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

তজ্জন্য একস্থানে বাস, একঅন্ন ভোজন, একনিয়মে অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন।

প্রচারদলের বহির্ভাগে আর একদল সাধক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সমাজের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কার্য্যের সহায়। এই দুইটি দলের জীবন, কেশবচরিত্রের ছাঁচে এক প্রকার গঠিত হইয়াছে। তিনি যে-সকল নূতন নূতন সত্য এবং ভাবরস প্রচার করিতেন, তাহা ইঁহাদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই প্রতিবিম্বচ্ছটা আবার কেশব-হৃদয়ে পুনঃ প্রতিফলিত হইত।

এইদলটি কেশবচন্দ্রের কৃষি ক্ষেত্র বিশেষ। তাঁহার দ্বারা অনেকগুলি ভক্তাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে। সকলের গঠন সমান হয় নাই বটে, কিন্তু অন্তত পঞ্চাশটি নরনারীর মুখচ্ছবিতে কেশব কারীগরের নামাঙ্কিত আছে। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের ছাঁচে গড়া জীবন দেখিলেই যেমন চেনা যায়, বর্ত্তমান সময়ে কেশব-স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে তেমনি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায় ইঁহারা কেশব সেনের লোক। উত্তরপাড়ায় সংকীর্ত্তন হইতেছে, পরমহংস রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া বুঝিতে পারিলেন, এ কেশবসেনের দল ; ইহা ভাড়াটে লোকের গান নয়। * * *

কেশবচন্দ্রের গঠিত দলের ইতিহাস অতি মনোহর। দলস্থ ব্যক্তিগণ এক এক কার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ। নববিধানের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার উপযোগী গুণ ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে। কেহ মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী মৌলবী, কেহ

সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কেহ খৃষ্টীয়ানধর্ম্ম এবং ইংরাজী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, কেহ পরিশ্রমে পটু, কেহ যোগী, কেহ ভক্ত, কেহ গায়ক, কেহ বাদক, কেহ উপদেশলেখক, কেহবা সেবক। এইরূপ লোকের সভায় কেশবচন্দ্র নিয়ত বিহার করিতেন। তিনি স্বয়ং যেরূপ স্বর্গবিদ্যালয়ে সাধু মহাজনদিগের নিকটে বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকারে ঐ-সকল বিদ্যা বিস্তার করিতেন।

দল ভিন্ন তাঁহার দিন চলিত না; প্রতিদিন তিনি সদলে মিলিয়া উপাসনা করিতেন। এই দলই তাঁহার নিদ্রিত মহত্ত্ব এবং গূঢ় ধর্ম্মভাব বিকাশের উপলক্ষ্য। সদলে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিয়া যেমন কৃতকার্য্য হইলেন, তেমনি উৎসাহ-আশাও ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

দলের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার ধর্ম্মমত বিস্তার করিতেন, আর কয়েকজন তাঁহার এবং প্রচারকপরিবারের সেবায় ও প্রচারকার্য্যালয়ে থাকিতেন। আত্মীয় ভাই বন্ধু অপেক্ষা অধিকতর স্নেহে ইঁহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে দলস্থ বন্ধুগণের সঙ্গে প্রাত্যহিক উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে আহারাদির পর লেখাপড়া, লোকদিগের সহিত আলাপ করা কিংবা কোনো সভায় যাওয়া, ইহাতেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত। রজনীতে কখনো সবান্ধবে সাধন-ভজন, প্রকাশ্য উপাসনাকার্য্য সম্পাদন, কখনো অন্যবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। অপর বন্ধুরা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া রাত্রি

দশটার সময় কেশবচন্দ্রের দরবারে একত্রিত হইতেন। সে দরবারে না উঠিত এমন বিষয় ছিল না। রাজনীতি, সাধনতত্ত্ব, সমাজসংস্কার, চরিত্রশোধন—পরনিন্দা সকল বিষয়েরই আলোচনা হইত। কখনো কীর্ত্তন, কখনো আমোদজনক গল্প হাস্যকোলাহল, কখনো তর্ক-বিতর্ক, নানা বিষয়ের অভিনয় দৃষ্ট হইত। একদিন এ-দল কি সুখের আলয়ই ছিল! পার্থিব কোনো সম্বন্ধ নাই, অথচ যেন সকলে সহোদর ভাই অপেক্ষাও আত্মীয়। তাঁহাদের প্রতি কেশবচন্দ্রের স্নেহপ্রীতি মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও মধুর ছিল, কত ভালোবাসিতেন তাহা জানিতেও দিতেন না, বাহিরে যদি একগুণ দেখাইতেন, ভিতরে দশগুণ চাপিয়া রাখিতেন। সুতরাং সে-প্রেম বড় ঘনতর এবং সুমিষ্ট ছিল।

এক-একবার বন্ধুদিগকে লইয়া তিনি যেন ভেল্কীবাজী করিতেন; এই দলটি ছিল অগ্নির সন্তান। সর্ব্বদা অগ্নিময় উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে সকলের জীবন অতিবাহিত হইয়া আসিয়াছে। হয় লোকনিন্দা, বিপক্ষের আক্রমণ এবং অপমানের পীড়ন, না-হয় ভক্তি-প্রেমের উৎসাহ; একটা-না-একটা উত্তেজক বিষয় সর্ব্বাদাই এ-দলের মধ্যে কার্য্য করিত।

এই দলের মধ্যে পড়িয়া কেশবচন্দ্র আপনার পুত্রকলত্রদিগকে দেখিবার অবসর পাইতেন না। রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত বন্ধুদিগের সঙ্গে কাটিয়া যাইত। অন্তঃপুরে আহারে বসিয়াছেন, সেখানে দুইজন সহচর বসিয়া আছেন। বিছানায় শয়ন করিলেন, সেখানেও দুই জন বন্ধু পা মাথা টিপিতেছেন। হয়তো টিপিতে টিপিতে তাঁহারা আগেই সেখানে

ঘুমাইয়া পড়িলেন। এরূপ অদ্ভূত দল পৃথিবীতে কেহ কোথাও দেখে নাই। ভালো প্রসঙ্গ হউক আর না হউক, কোনো কাজ থাকুক-না-থাকুক, প্রচারকদল কেশবের সঙ্গ ছাড়ে না।

আচার্য্য গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন, দুই-একজন কাছে বসিয়া গল্প করিতেছেন, লিখিবার অবসর দিতেছেন না; কিন্তু তাহা পড়িবার জন্য ব্যাকুল। তথাপি তিনি লিখিতেন, আর কথার উত্তর দিতেন। তাঁহারা দুইপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট না থাকিলে যেন কর্ত্তব্য কার্য্যের হানি মনে করিতেন। কেহ মশা তাড়াইতেছেন, কেহ ধূলিধূসরিত মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছেন, কেহ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় নাক ডাকাইতেছেন। এমন সময় একহস্তে জলের ফেরুয়া, একহস্তে তাম্বুলকরঙ্ক আচার্য্য প্রবেশ করিলেন। নিদ্রিত বন্ধুদিগকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আগমন শব্দে তাড়াতাড়ি কেহ-বা জাগিয়া উঠিতেন, কেহ-বা ভাণ করিতেন, যেন জাগিয়াই আছেন। গুরু মহাশয়ের ভয়ে ছেলেরা যেমন করে সেরূপ ভাবও কতকটা ছিল। ইহা আমোদের মধ্যে গণ্য হইত। মশা তাড়াইবার কালে কেহ-বা দশ-বিশ গণ্ডা মশার প্রাণ বধ করিতেন। দল যে-ঘরে বসিতেন সেখানে মশার আমদানিও কিছু বেশী-ছিল। আচার্য্য মশা মারিতেন না; চেয়ারে বসিয়া ধৈর্য্য সহকারে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় করিতেন।

কেশবচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট হাউসে কিংবা অন্য কোনো সাহেব-বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, বন্ধুরা অপেক্ষা করিতেছেন। রাত্রি

দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে, তবু একবার গল্পের জমাট বাঁধে এজন্য ছলে কৌশলে সকলকে আটকাইয়া রাখিতেন; এমন দিন কতই গিয়াছে। হয়ত গভীর রাত্রি সময়ে এমন এক কথা তুলিলেন যে দুই এক ঘণ্টা তাহাতে কাটিয়া গেল। কাহারো কাহারো ঘুমে চক্ষু ভাঙিয়া পড়িত, এজন্য তাঁহারা ভালো কথায় প্রায়ই যোগ দিতে সক্ষম হইতেন না, নানা রংএর লোক, কেহ একবিষয়ে গুণবান্ অন্য বিষয়ে দুর্ব্বল, কিন্তু সকলের সমবায়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক দেহ প্রস্তুত হইয়াছিল।

ভগবানের যোগাযোগ—মনুষ্য শাসন পীড়ন করিয়া বল পূর্ব্বক ইহা গড়েও নাই, রাখিতেও পারে না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত একত্র বাস, সকলে যেন এক রক্ত মাংস, এক আত্মা। কেশবচন্দ্রের গৃহ প্রচারকগণের বাসস্থান, তাঁহার জননী সকলেরই জননী। ক্রমে ক্রমে এই পরিবারের সঙ্গে সকলের একটি সুমিষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। দুই পাঁচজন লোক দিন রাত্রি কেশবের নিকট পড়িয়াই আছেন। আচার্য্যের সেবায় তাঁহারা চিরদিন সমান উৎসাহী ছিলেন। কেশবচন্দ্র এ-দলের বন্ধন-রজ্জু এবং প্রধান স্তম্ভ—তাঁহাকে ভালোবাসিব, সেবাভক্তি করিব, তাঁহার প্রিয় হইব এ-ইচ্ছা প্রত্যেকেরই ছিল। কারণ, কেশবের ন্যায় প্রিয়দর্শন, কোমলস্বভাব, মহৎচরিত্র গুণবান ক্ষমতাশালী প্রেমিক জনের প্রিয় অনুগত হইবার ইচ্ছা কাহার না হয়? কিন্তু তিনি কেবল তাহা চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, দলস্থ প্রত্যেককে ভালোবাসাই আমার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা।

প্রচারকগণ যে পরস্পরকে ভালো বাসিতেন না, তাহাও নহে। ভালোবাসা শ্রদ্ধা আন্তরিক বন্ধন বেশই ছিল, সময়ে সময়ে তাহার বিনিময়ে প্রত্যেকেই স্বর্গভোগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রেম-পরিবার স্থাপনপক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর হইতে প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয়কে কেশবচন্দ্র একপত্রের মধ্যে লিখিয়াছিলেন,—"আত্মার যোগই প্রকৃত যোগ, শরীর সম্বন্ধে নিকটে কিংবা দূরে থাকিলে লাভ ক্ষতি নাই; আত্মার গভীরতম প্রদেশে যে-সম্মিলন হয় তাহাই প্রার্থনীয়। যদি আমরা সকলে ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিয়া আন্তরিক যোগে তাঁহার সঙ্গে গ্রথিত হই, তাহাহইলে পরস্পরের মধ্যে যে-আধ্যাত্মিক প্রণয় হইবে তাহাই যথার্থ স্থায়ী প্রণয়, তাহা সংসার দিতেও পারে না, লইতেও পারে না। কখন কোন্ স্থানে কোন্ অবস্থাতে আমাদের থাকিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; যদি তাঁহার কার্য্যে সকলে নিযুক্ত থাকি, তিনিই আমাদের যোগসূত্র-রূপে আমাদের হৃদয়কে পরস্পরের নিকট রাখিবেন।

প্রচারক-পরিবারগণের দারিদ্র্য কষ্ট সমধিক ছিল। স্ত্রী-লোকেরা সেজন্য যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিতেন। কেশব-চন্দ্রের সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছিল না, অথচ তাঁহার মুখের দুইটি কথায় তাঁহাদের হৃদয়ভার দূর হইয়া যাইত। এমনি তাঁহার কোমল হৃদয়, দুঃখী দুঃখিনীরা সেখানে গিয়া প্রাণ জুড়াইত। কি-এক মিষ্ট আকর্ষণ ছিল, সে-কথা আর বলিয়া উঠা যায় না।

(১) স্বদলে কেশবচন্দ্র, (২) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (৩) উমানাথ গুপ্ত, (৪) মহেন্দ্রনাথ বসু, (৫) অমৃতলাল বসু,



‘প্রেরিত’ প্রচারকদল

(৬) অঘোরনাথ গুপ্ত, (৭) গৌরগোবিন্দ রায়, (৮) কান্তিচন্দ্র মিত্র, (৯) ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, (১০) প্যারীমোহন চৌধুরী,

(১১) প্রসন্নকুমার সেন, (১২) গিরিশচন্দ্র সেন, (১৩) কেদারনাথ দে, (১৪) দীননাথ মজুমদার, (১৫) বঙ্গচন্দ্র রায়, (১৬) রামচন্দ্র সিংহ।

খৃষ্টীয় শাস্ত্রে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, হিন্দুশাস্ত্রে গৌরগোবিন্দ রায়, বৌদ্ধশাস্ত্রে অঘোরনাথ গুপ্ত, মুসলমান শাস্ত্রে গিরিশচন্দ্র সেন, শিখধর্ম্মশাস্ত্রে (গুরুমুখী ভাষভিজ্ঞ) মহেন্দ্রনাথ বসু এবং সঙ্গীতের কার্য্যে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বিধিপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

প্রচারকগণের মধ্যে গৌরগোবিন্দ রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমানাথ গুপ্ত, অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দীননাথ মজুমদার, প্যারীমোহন চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র সেনকে 'প্রেরিত' প্রচারক, এবং কান্তিচন্দ্র মিত্রকে প্রচারক-পরিবারের প্রতিপালক এবং মহেন্দ্রনাথ বসু, রামচন্দ্র সিংহ, প্রসন্নকুমার সেনকে তৎকার্য্যের সহকারী পদ প্রদান করেন।

প্রতাপচন্দ্র বোম্বাই দেশে, অমৃতলাল মাদ্রাজে, অঘোরনাথ পাঞ্জাবে, দীননাথ বেহারে, গৌরগোবিন্দ উড়িষ্যা এবং উত্তর বাংলায়, প্যারীমোহন ও গিরিশচন্দ্র পূর্ব্ববাংলায়, ত্রৈলোক্যনাথ এবং উমানাথ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রচারকগণের নামের প্রথমে (সমতাজ্ঞাপক) ভাই ; এবং প্রচারক নামের সঙ্গে "প্রেরিত" উপাধি প্রদান করিয়া তৎসঙ্গে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক স্বভাবে যাঁহার যে-বিশেষত্ব দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে তদ্রূপ আখ্যায় চিহ্নিত করিয়াছিলেন ;—

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (পাশ্চাত্য জ্ঞান)

উমানাথ গুপ্ত (বিশ্বাস—faith)

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (ভক্তি)

অঘোরনাথ গুপ্ত (যোগ)

গৌরগোবিন্দ রায় (দীনতা)

অমৃতলাল বসু (সদুদ্যমা ভক্তি)

কেদারনাথ দে (শান্ত সাধক—quiet devotee)

গিরিশচন্দ্র সেন (ইস্‌লামনিষ্ঠা)

বঙ্গচন্দ্র রায় (অনুকরণ—imitation)

কান্তিচন্দ্র মিত্র (অভিভাবক-প্রতিপালক)

মহেন্দ্রনাথ বসু ও রামচন্দ্র সিংহ (সহকারী)

প্রসন্নকুমার সেন (কার্য্যোদ্ধারক)

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (সঙ্গীতাচার্য্য)

দীননাথ মজুমদার (বাদক)

প্যারীমোহন চৌধুরী—(উপদেশ-লেখক—reporter)

কয়েক বৎসরকাল পর্য্যন্ত আনন্দের সহিত দলটি চলিয়াছিল। কেশব সেনের দলের একতা উৎসাহ দর্শনে কত লোক প্রশংসা করিত। একটি মহাশক্তি বলিয়া তাঁহাদের মনে হইত। এই কয়টা লোককে সঙ্গে লইয়া কেশব-কারীকর কত কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন! এখন লোকে যে যাহা বলে বলুক কিন্তু এই দলটি অসাধারণ ছিল।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মমন্দিরে সাতবৎসর—১২৯৩ সালের শেষ হইতে ১৩০০ সালের অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত প্রায় সাতবৎসরকাল আমি খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গে সংযুক্তভাবে অবস্থিতি করি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মঙ্গলগঞ্জে—কখনো-বা কলিকাতা আহিরীটোলায় ক্ষেত্রবাবুর বাড়িতে—কখনো নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ে প্রচারক মহাশয়দিগের সঙ্গে, কদাপি অন্যত্র ধর্ম্মবন্ধু সঙ্গে, এইরূপে দুই এক মাস পর্য্যন্ত মন্দিরে অনুপস্থিতিও ঘটিত!

আমি প্রথমে যখন ব্রহ্মমন্দিরে আসি তখন ধান্যক্ষেত্রস্থ খড়বনের এক পূর্ব্বসীমায়, সম্মুখে নিম্ন প্রাচীর আর তিনদিকে কাটার বেড়াবেষ্টিত উদ্যান-মধ্যে ব্রহ্মমন্দির, এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে দেওয়ালহীন চারিদিক খোলা অবস্থায় একখানি আটচালা ঘর মাত্র ছিল। উদ্যানে যে সামান্য বৃক্ষলতাপুষ্প রোপিত হইয়াছিল, খড়ো জমিতে তাহার বৃদ্ধির লক্ষণ বড় দৃষ্ট হইত না।

শনিবারে কলিকাতা হইতে ক্ষেত্রবাবু আসিয়া ঐ আটচালা ঘরে রন্ধন পানভোজনাদি—কিংবা—কলিকাতা হইতে প্রস্তুত খাদ্য যাহা আনিতেন, মন্দির-সংলগ্ন—(মেয়েদের বসিবার) পার্শ্বের ঘরে বসিয়া তাহা পানভোজন ব্যতীত রাত্রিযাপনও করিতেন। মন্দিরে পানভোজন এবং শয়ন নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি স্থানাভাবে তিনি সে-নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে সরস্বতী সেন মহাশয়া এবং স্নেহলতা আসিলে তাঁহারা ঐ পার্শ্বের

ঘরেই থাকিতেন। তখন ক্ষেত্রবাবু মন্দিরেই শয়ন করিতেন। পূর্ব্ব হইতে এই অবস্থায় চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তখনো পর্য্যন্ত তেমন স্থানাভাব বোধ হয় নাই। মুক্তস্থানে মন্দির এবং প্রশস্ত রোয়াক পাইয়া স্থানাভাবের দিকে আমার তখন কোনো লক্ষ্যই ছিল না।

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু চণ্ডীবাবু—আমি প্রথমে কিছুদিন একাকী থাকার পর অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা একটি ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গ পাইলাম, তাঁহার নাম চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস বিক্রমপুর। ইনি আমার সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এইরূপ শুনিয়াছিলাম। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা অল্পই পাইয়াছিলেন। তারপর যৌবনের প্রারম্ভকালেই বিবাহিত অবস্থায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। একদা তাঁহার শ্বশুরালয়ে ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত কথায় তাঁহার শ্যালক অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিঃস্কৃত করিয়া দেন।

চণ্ডীবাবু স্বভাবত অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন, সুতরাং বিনাবাক্যব্যয়ে একবস্ত্রে গৃহের বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাকায় বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি নববিধান প্রচারক মহাশয়দিগের নিকট আসিয়া পড়েন; কিছুদিন তথায় তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনাদিতে যোগ দিয়া শান্তি লাভ করেন। তারপর মঙ্গলগঞ্জে আসিয়া কিছু দিন তথায় সাধন-ভজনের ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তদবস্থায় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং সহজেই বন্ধুতা ঘটে।

তারপর একদিন সহসা দেখি চণ্ডীবাবু খাঁটুরায় আসিয়া

উপস্থিত। তখন এখানে একমুষ্টি তণ্ডুল সংস্থান ব্যতীত ভাণ্ডারে আর বেশী কিছু থাকিত না, কিন্তু বাগান কুড়াইয়া জ্বালানি কাষ্ঠ—আর কতকগুলি শীর্ণ কদলীবৃক্ষে এক-একটি মোচার অভাব প্রায় ঘটিত না, মোচাভাতে-ভাতেই তখন আমাদের আহারের পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইত। সে-অবস্থার কথা ভাবিলে এখনো যেন বিস্ময় বোধ হয়! কাঙালের সঙ্গে কাঙাল বন্ধুর মিলনানন্দে আমাদের মনে শারীরিক অভাববোধ স্থান পাইত না। চণ্ডীবাবুর সহিত সেই অল্পদিনের সঙ্গ-সূত্রে আজীবন আমাদের বন্ধুতা চলিয়া আসিয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে চণ্ডীবাবুর শ্যালকমহাশয় স্বীয় ভগ্নীকে ভগ্নীপতির নিকট প্রেরণ করেন। তারপর চণ্ডীবাবু ব্রাহ্ম গৃহস্থ বৈরাগীর অবস্থায় সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীসহ সাধন-ভজন করিতে করিতে পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় স্থানে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ঈশ্বরকৃপায় উপস্থিত তাঁহার পাঁচকন্যা-জামাতা ব্রাহ্ম সমাজে এক একটি প্রতিষ্ঠ ব্রাহ্ম পরিবার। জ্যেষ্ঠা নির্ম্মলাবালা, জামাতা শশিভূষণ মিত্র ফরিদপুরে, মধ্যমা চারুবালা ও জামাতা ডাক্তার প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার রেঙ্গুনে, আর তিন কন্যা-জামাতা কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। সম্ভবত ১৩১৩সালে খুলনায় অবস্থানকালে চণ্ডীবাবুর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে; তজ্জন্য তাঁহার শান্ত ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তিনি অদ্যাপি সংসারের সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া অসিতেছেন। কিছুদিন বাদে চণ্ডীবাবু এখান হইতে অন্যত্র গমন করেন।

ইতিমধ্যে একবার ক্ষেত্রবাবু আসিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সারদা বন্দ্যোপাধ্যাকে বলেন, "আটচালা ঘরের দেওয়াল দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে," তজ্জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের জমিতে একটা 'চৌকা' কাটাইয়া দেওয়ালের জন্য মাটি তোলা হয়। তখন আগত বর্ষাকাল ছিল, সুতরাং শীঘ্র বৃষ্টির জলে চৌকা পূর্ণপ্রায় হইল। এই মাঠের মাঝে শুষ্কক্ষেত্রে জল পাইয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। এই ঘটনার পর ক্রমে আরো কিছু মাটি তুলিয়া সমস্ত গাছের গোড়ায় দেওয়া হইতে লাগিল, তাহাতে যেমন বৃক্ষরাজীর শ্রীবৃদ্ধির হেতু ঘটিল তেমন ছোট খাট একটি পুষ্করিণীর সূচনা হইল। এইসকল ঘটনার মধ্যে প্রায় ১২৯৪ সাল শেষ হইয়া আসিল।

"মঙ্গলালয়" নির্ম্মাণ—ক্রমে যখন প্রচারক এবং বন্ধুবান্ধবগণ মঙ্গলগঞ্জে যাওয়া-আসার পথে বা কলিকাতা হইতে এখানেও মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন, তখন নিতান্তই স্থানাভাব হইতে লাগিল। বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া 'মঙ্গলালয়' নামক বাটী নির্ম্মানার্থে দুইহাজার টাকা দান করেন। কোন্ স্থানে কি-ভাবে বাড়ি নির্ম্মিত হইলে তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইবে এইবিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত না হওয়াতে এ-পর্য্যন্ত লক্ষ্মণবাবুর সেই শুভ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সময় লক্ষ্মণবাবু, ক্ষেত্রবাবুকে বলেন,—"মামা, ব্রহ্মমন্দিরের সংলগ্নভাবে 'মঙ্গলালয়' প্রস্তুত হউক।" মঙ্গলালয় দেশের হিতার্থে সাধারণ কাজের জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজেরও

সাহায্য হইবে এইকথা ক্ষেত্রবাবুর নিকট প্রথমে শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হই। তারপর ক্ষেত্রবাবু আমাকে বলেন, "যোগীন্দ্র, তুমি যদি এই কাজের ভারগ্রহণ করো তবে লক্ষ্মণ এখনি বাড়ির কাজ আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ক্ষেত্রবাবুর এই প্রস্তাবে আমি উৎসাহ আগ্রহ সহকারে মঙ্গলালয় নির্ম্মাণকার্য্যের সম্পূর্ণ রূপে ভার গ্রহণ করি।

মঙ্গলালয় নির্ম্মাণকার্য্যে আমার সম্মতিসূচক সংবাদ অবগত হইয়া মঙ্গলগঞ্জ হইতে লক্ষ্মণবাবু বাড়ির একখানি নক্সা (প্ল্যান) ও তাহার আনুমানিক ব্যয় (এষ্টিমেট) চার হাজার টাকার ফর্দ্দসহ এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন, "যোগীন্দ্র বাবু, নমস্কার, এখন দেখা গেল দানের দুইহাজার টাকায় একটি গুদাম-ঘর ব্যতীত আর বেশী কিছু হয় না, বাবার নামে কাজটিকে মনোজ্ঞভাবেই করিতে চাই। আপনি এই কাজের ভারগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তাহার মধ্যে বিধাতার ঈঙ্গিত অনুভব করিয়া সুখী হইয়াছি।"

ইতিপূর্ব্বে মন্দিরের দক্ষিণে সংলগ্ন একখণ্ড জমি সহজ-সুলভে পাইয়া ক্ষেত্রবাবু নিজ নামে তাহা খরিদ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ-জমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হইল।

১২৯৪ সালের শেষে কাজ আরম্ভ হইয়া, ১২৯৬ সালের মধ্যে নির্ম্মাণ শেষ হয়। তারপর বাড়ি প্রতিষ্ঠাকার্য্য-উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রচারক এবং ক্ষেত্রবাবু ও লক্ষ্মণবাবুর পরিচিত দেশহিতৈষী দুই-চারজন ভদ্র মহোদয় ঐ-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এবং স্থানীয় তাম্বুলীশ্রেণীর বর্দ্ধিষ্ণু—যাঁহারা কখনো ব্রাহ্মসমাজের ছায়া স্পর্শ করিতেন না, এমন ব্যক্তিগণ এবং দেশের সাধারণ ভদ্রাভদ্র বহু জনসমাগমে সে-দিবস মঙ্গলালয় প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়গণ সময়োপযোগীভাবে বক্তৃতা এবং শাস্ত্রপাঠাদি করিয়া অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে—পূতচিত্তে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া যখন ঐ-গৃহ উৎসর্গ করেন, তৎকালীন তাঁহার মুখশ্রী এবং গাম্ভীর্য্যোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমি আনন্দাশ্রু-নেত্রে ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া—আমার বৎসরাধিককালের পরিশ্রম স্বার্থক মনে করিয়াছিলাম।

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত এবং তিনশত টাকার উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তকও পুস্তকাধার সহ মঙ্গলালয় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বাড়ি নির্ম্মাণ এবং আনুসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের জন্য লক্ষ্মণচন্দ্র এ-সম্বন্ধে প্রায় সাতহাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণচন্দ্র যখন যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা আন্তরিক ভাবে সম্পন্ন করাই তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল। মঙ্গলালয় প্রতিষ্ঠার পর এ-দিকে তাঁহার আরো দৃষ্টি পতিত হইল। আমার ঠিক স্মরণ হয় না, মঙ্গলালয় নির্ম্মাণের কিছু পূর্ব্বে বা সেই সময়েই ব্রহ্মমন্দিরের উত্তরে আরো একখণ্ড (কম-বেশ আড়াই বিঘা) জমি ঐ পূর্ব্ব নিয়মে সহজে পাওয়া গেল।

জমি লওয়া সংক্রান্ত কথার মধ্যে লক্ষ্মণবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলেন, "মামা, জমি পাইলে হাত-ছাড়া করিবেন না, মঙ্গলগঞ্জের আমের কলম পাঠাইয়া সদ্য আপনার বাগান তৈরী করিয়া দিব।" জমি লওয়ার পর লক্ষ্মণবাবু মঙ্গলগঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে এমন সমস্ত বড় বড় সজীব আমের চারা ও গোলাপের কলম পাঠাইলেন যে, সত্বরই উত্তরদিকের জমিতে এক উৎকৃষ্ট আম্র প্রভৃতি ফলের বাগান-পত্তন এবং মঙ্গলালয়-সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণ গোলাপক্ষেত্রে সুশোভিত হইল। এদিকে মঙ্গলালয় লাইব্রেরীতে পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠে গোবরডাঙ্গা গৈপুর প্রভৃতি গ্রামের শিক্ষিত যুবকগণের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ দৃষ্ট হইল; ফলত গ্রামের বাহিরে ফাঁকা মাঠে শরীর ও মন উভয়েরই এ-টি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বসংগৃহীত বাংলা পুস্তকগুলি যাহা মন্দিরের পার্শ্বের ঘরে একটি আলমারীতে ছিল তাহাও মঙ্গলালয় পুস্তকালয়ের সঙ্গে রাখা হইল।

লক্ষ্মণচন্দ্রের সীমলা-শৈল অভিযান—মঙ্গলালয় নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় সহসা শুনিলাম লক্ষ্মণবাবু সপরিবারে দলবল-সহ শীঘ্র সীমলা-পাহাড় যাইবেন। সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক হওয়া আমার পক্ষে অসঙ্গত ছিল না, কিন্তু আমার মনে হইল এই রাজসিক ব্যাপারের সঙ্গে ভ্রমণে শান্তিলাভ হইতে পারে না।

তারপর লক্ষ্মণবাবুর একপত্র পাইলাম। তাহাতে আমাকে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—"চলুন, এমন

সুযোগ জীবনে হয়তো আর ঘটিবে না; একবার হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া ভগবানের নাম করিয়া আসি। মঙ্গলালয়ের কাজ তো শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন যোগীমামা (ক্ষেত্রবাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ দত্ত) ও রামমিস্ত্রীর উপর ভার দিয়া গেলেও চলিবে।" লক্ষ্মণচন্দ্রের এই প্রস্তাবেও আমার মন প্রস্তুত হইল না। পূর্ব্বে কোনো পুস্তকে পড়িয়াছিলাম,— "আরব্ধ কার্য্য সমাপন না করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবে না।" ঐ-প্রবচনটি সহসা সেইসময় মনে হইল। তারপর লক্ষ্মণ-বাবুকে এইরূপ লিখিলাম,—মঙ্গলালয়ের এখনো যে-সমস্ত কাজ বাকি আছে, তাহা ফেলিয়া গেলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, আপনি যাত্রা করুন, পরে গিয়া যোগ দিতে চেষ্টা করিব।

তারপরই লক্ষ্মণচন্দ্র এক বিরাট আয়োজন-সহ সীমলা-শৈল যাত্রা করিলেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা (তখন তাঁহার যমজ কন্যাদ্বয় কয়েকমাসের মাত্র, প্রথম পুত্র, তারপর তিনকন্যা) ও ভৃত্যগণ ব্যতীত দুই-তিনটি কর্ম্মচারী এবং প্রচারক বন্ধুবান্ধবও দুই চারটি—অবশেষে ক্ষেত্রবাবু পর্য্যন্ত যাত্রা করিলেম।

সস্ত্রীক-সসন্তানে লক্ষ্মণবাবু নিজে এবং মাতুল ক্ষেত্রবাবুর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ এক কামরা ভাড়া (রিজার্ভ) করিলেন। প্রচা-রক বন্ধুবান্ধব ও কর্ম্মচারীদিগের জন্য মধ্যম শ্রেণী, অবশিষ্ট ভৃত্য-দিগের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ব্যবস্থা হইল। সুতরাং এই অভিযানের আনুসঙ্গিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন হইবে না। শুনিয়াছিলাম এই ভ্রমণ-ব্যাপারে লক্ষ্মণ-চন্দ্রের চারহাজার টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল।

প্রথমে ক্ষেত্রবাবুর পত্রে সকলের সীমলায় পৌছা-সংবাদ-সহ বুঝিলাম আমার অনুমান সত্য হইয়াছে। তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "এতগুলি লোক আর কচি সন্তানদের লইয়া লক্ষ্মণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।" তারপর তাঁহার শেষ কয়টি কথা আমার চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এখানে উপাসনার আসন করিতে হয় না, প্রকৃতিদেবী শিলাতলে আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মন সহজেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে। ইচ্ছা হয় এইখানে এইভাবেই দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে মিলাইয়া যাই, কিন্তু অপটু শরীরের জন্য ভাবনা হয়।"

তারপর আমি লক্ষ্মণবাবুকে একপত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছেন? সঙ্গে সঙ্গে তাহার এইরূপ উত্তর আসিল: "ভীড় কমিয়া গিয়াছে, এইসময় আসুন।" আমি আবার লিখিলাম; এখন যাইতে পারি, কলিকাতায় গিয়া পত্র দিব।

কলিকাতায় আসিয়া দেখি, ক্ষেত্রবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে অন্যান্য সংবাদ সহ শুনিলাম, অপর সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, ছোট ছোট সন্তানদের লইয়া লক্ষ্মণেরও থাকা উচিত ছিল না, এখন সেখানে শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতাপবাবুও নামিয়া আসিলেন, তিনিও লক্ষ্মণকে সেখানে এ-অবস্থায় থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ যখন যাহা বুঝিবে তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনিবার পাত্র সে নয়।"

কলিকাতায় আসিয়া আমিও লক্ষ্মণবাবুর একপত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "সেই যদি আসা হইল, তবে একজন গায়ক ও একজন বাদক সঙ্গে লইয়া আসুন, পশ্চিম

প্রদেশে বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে ভগবানের নাম করিয়া যাইব, আর এমন সুযোগ ঘটিবে না। খরচ-পত্রের টাকা মামার নিকট লইবেন তাঁহাকে লিখিলাম। আমাকে ফিরিয়া যাইতে সকলেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু এত আয়াস স্বীকার করিয়া যে-জন্য আসিলাম এখন ভয়ে ফিরিয়া যাইব !"

গায়কের জন্য চুণীবাবু এবং প্রসিদ্ধ খোলবাদক ব্রাহ্ম বন্ধু হরলাল ভায়াকে সহজেই পাইলাম। কাশীর ঠিকানায় পত্র পাইব লক্ষ্মণবাবুকে ইহা জানাইয়া আমরা তিনজনে যাত্রা করিলাম। দেওঘর ও বক্‌সর হইয়া কাশী পৌছিয়া লক্ষ্মণবাবুর এইরূপ টেলিগ্রাম পাইলাম। "এখানে খুব শীত পড়িয়াছে আমি লাহোরে অপেক্ষা করিব, আপনারা শীঘ্র তথায় আসুন।"

বৃন্দাবন পর্য্যন্ত আসিয়া চুণীবাবু বলিলেন, "আমার বুকে সর্দ্দি বসিয়া কষ্ট হইতেছে আমি আর অগ্রসর হইতে পারিব না, এই দেখুন বোধহয় জ্বরও হইয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দিন আমি বাড়ি ফিরিয়া যাইব।" হরলালও বলিলেন, "অন্ধ মানুষকে একলা ছাড়িয়া দিতে পারি না, অতএব আপনি যান, আমরা আর যাইতে পারিব না।"

এ-অবস্থায় আমারও একা যাইতে আর উদ্যম রহিল না, পাকেচক্রে পড়িয়া মনঃভঙ্গ হইয়া গেল; সুতরাং সকলেই ফিরিয়া আসিলাম। বৃন্দাবন হইতে এই সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ-জন্য তিনি একেবারে বিরক্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরে সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গণেশ-ভবন—ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় বগুড়ায় অবস্থানকালে মঙ্গলালয়-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে খাটুরায় আসিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আমি গণেশবাবুর কথা সর্ব্বপ্রথমে ক্ষেত্রবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম। সম্ভবত তিনিও ক্ষেত্রবাবুর পত্রে আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ-সংক্রান্ত সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। গণেশবাবুর সহিত আমার আত্মীয়-সম্পর্কও ছিল। অতঃপর তিনি অনেকদিনের পর স্বদেশ—জন্মভূমিতে আসিয়া সহসা অভাবনীয়রূপে মঙ্গলালয় ও এই আনুসঙ্গিক বিষয় দেখিয়া-শুনিয়া একেবারে বিস্ময়ানন্দে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইসময় আমাকে বলেন, "যোগীন্দ্র, এই তো ঠিক হইয়াছে, আমারও এখানে একখানি বাড়ি তোমাকে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আমার অনেকগুলি কন্যা, মঙ্গলালয়ের ন্যায় আমারও অনেক ঘরের প্রয়োজন, তবে আমার তো টাকা বেশী নাই—দুইহাজার পর্য্যন্ত আমি দিতে পারিব।

তারপর ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গণেশবাবুর বাড়ি নির্ম্মাণের আয়োজন হইল। আরো উত্তরাংশে একখণ্ড দুইবিঘা আন্দাজ জমি পাওয়া গেল। কিন্তু ঐ-জমির একজন সরিক অনুপস্থিত থাকায় দলিলে তাঁহার স্বাক্ষর বাকি রহিল। এজন্য ক্ষেত্রবাবু আমাকে বলেন, "জমির দলিল অসিদ্ধাবস্থায় তাহার উপর বাড়ি নির্ম্মাণ আরম্ভ করা উচিত নয়, তজ্জন্য বিলম্ব না করিয়া বাড়ির জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন, তাহা উত্তরের শেষ সীমা হইতে লইয়া বাড়ি আরম্ভ হউক।" তাহাই করা হইল।

১২৯৭ সালে ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের বাড়ি নির্ম্মাণ শেষ হইলে, তিনি সপরিবারে খাঁটুরায় আগমন করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শরৎবালার নামকরণ বোধ হয় একই দিবসে সম্পন্ন করা হয়। গণেশবাবুর বাড়ি নির্ম্মাণের জন্য প্রথমত বোধ হয় বাইশ শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে পাঁচশত টাকা তিনি লক্ষ্মণবাবুর নিকট ধার লইয়াছিলেন।

ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অন্যূন দ্বাদশবৎসরকাল সপরিবারে এই গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মধ্যমা কন্যা কুমারী সরলাবালা বি-এ গিরিডিতে সুলভ মূল্যে একখানি বাড়ির অংশ ক্রয় এবং তাহার সংস্কার করিয়া বাসোপযোগী করেন। গণেশবাবু শেষে নানাকারণে খাঁটুরার বাড়ি হইতে গিরিডির ঐ বাড়িতে আসিয়া সপরিবারে স্থায়ীভাবে গিরিডি-প্রবাসী হইয়াছিলেন। তারপর তিনি সেখানেই দেহত্যাগ করেন। ১৩:৩ সালের আশ্বিন মাসে গিরিডিতে তাঁহার সহিত যখন আমার শেষ দেখা হইয়াছিল। তখন তিনি শয্যাগত ছিলেন।

গণেশবাবুর একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র, বৃদ্ধা জননী ও ভগিনীগণ-সহ গিরিডি-প্ররাসী হইয়াও দেশের সঙ্গে যেটুকু সম্বন্ধ ছিল, খাঁটুরার বাড়ি বিক্রয় করাতে তাহা নিঃশেষ হইয়াছে।

ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় খাঁটুরা গ্রামে তাম্বুলী-শ্রেণীর বিখ্যাত রক্ষিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জানি-না কি-সূত্রে তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষাপথে আসিয়া ডাক্তারী পড়িয়া

ছিলেন। বালককাল হইতে তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। পরিণতবয়সে সুশিক্ষার সহিত সৎপথাবলম্বী হইয়া তিনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মভীরু সজ্জন ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। গণেশবাবু ইংরাজীভাষার সঙ্গে সংস্কৃতভাষানুরাগীও ছিলেন। পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

শুনিয়াছিলাম ক্ষেত্রবাবু, বসন্তবাবু, গণেশবাবু ও লক্ষ্মণবাবু ব্যতীত আরো পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আর একব্যক্তি তখনকার আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবাপন্ন—ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণসখা আশ। তাঁহার কথা আমি ক্ষেত্রবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অনেক সঞ্চিত ছিল।

পুত্র বিনয়ভূষণ—আমি শূন্যহস্তে একবস্ত্রে ব্রহ্মমন্দিরে আসি। একখানি বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া বুঝিলাম ইহাতেও চলে। এই ঘটনায় আমি অভাব সঙ্কোচ করিতে এক ঈঙ্গিত পাইয়াছিলাম। ক্রমে তাহা স্বভাবে পরিণত হইয়া সাধনপথে অনেক আনন্দ পাইয়াছি।

বরাহনগরের বাড়ি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করার পর ভাইরা আপন আপন উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে পৃথকভাবে দায়ীত্ব গ্রহণ করিল। তখনও পর্য্যন্ত মাতা ঠাকুরাণীর হস্তের অলঙ্কার নিঃশেষিত হয় নাই।

ভুবন রক্ষিত মহাশয়ের কন্যাটি মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে বরাহনগরবাসী রাজকুমার পাল (ইনি পূর্ব্বে আমাদের

দোকানে কর্ম্মচারী থাকিয়া জ্যেঠামহাশয়ের দোকানের অংশীদার হইয়াছিলেন) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত উপেন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইয়াছিল। এবং বরাহনগরবাসী শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শশীন্দ্রেরও বিবাহ হইয়াছিল। তারপর আমি যখন বাড়ি হইতে ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া পড়িলাম, তখন ন-দিদি আমার অমতে যতীনের স্কুল ছাড়াইয়া জিদ করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এ-বধূটিও স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের দৌহিত্রী, সুতরাং ইঁহারা পরস্পর মাসী-বোনঝি ছিলেন। আমার অমতে যতীনের বিবাহ হওয়ায় মাতাঠাকুরাণী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট বধূকে একখানি গহনা দিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইতে ত্রুটী করেন নাই।

সাংসারিক এইরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভ্রাতাদিগের নিকট পুত্র বিনয়ভূষণকে রাখা আমার অনুচিত মনে হইতে লাগিল। এই চিন্তা মনে উদিত হইবার পরে একদিন আমার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ বোধ হওয়ায় আমি বাড়ি গিয়া সেদিন আর মন্দিরে ফিরিয়া আসিতে পারিলাম না। জ্বর অবস্থায় চার-পাঁচদিন বাড়ি রহিলাম। সেইসময়ে একদিন বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা বিনয়, তুমি কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা করিবে? তাহাতে সে সহজেই সম্মত হইল। তারপরই তাহাকে কলিকাতায় আনিলাম। অবশ্য সংসার হইতে বিনয়কে লওয়ার সময় মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন এবং উপেন্দ্রও বিনয়কে বাড়ি ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

সেইসময় শ্রদ্ধেয় কান্তিবাবু, গৌরবাবু প্রভৃতি কতিপয় নববিধান-প্রচারক কেশববাবুর 'কমলকুটীর' ছাড়িয়া বিডন ষ্ট্রীটে প্রসন্নকুমার সেন প্রচারক মহাশয়ের জামাতা বাবু মন্মথনাথ দত্ত এম-এ মহাশয়ের 'কেশব-একাডেমী' নামক স্কুল-বাড়িতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কেশব-একাডেমীর পশ্চাৎবর্ত্তী কেদার দত্তের গলিতে ছেলেদের জন্য এক বোর্ডিং হইয়াছিল। বিনয়কে কান্তিবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার পর তিনি বিনয়কে ঐ বোর্ডিংএ রাখিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ইহা ১২৯৬ সালের ঘটনা।



বিনয়ভূষণ

বিনয়কে বাড়ি হইতে কলিকাতায় আনিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বলিয়াছিলাম, কলিকাতায় আমি তোমার কাছে সর্ব্বদা থাকিতে পারিব না। অনেক সময় বোর্ডিংএ ছেলেদের সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এ-কথায় সে সম্মত হইয়াই কলিকাতায় আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে বোর্ডিংএ রাখিয়াই আমি খাঁটুরায় ফিরিয়া যাই

নাই; তখন শারদীয় উৎসবও আগতপ্রায় হইয়াছিল। আমি প্রচারক মহাশয়দিগের সঙ্গে থাকিয়া উপাসনাদিতে যোগ দিতে লাগিলাম।

ধর্ম্ম-দীক্ষা প্রসঙ্গ—আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলসূত্রগুলি প্রায় পূর্ব্বে বলিয়াছি। অবতারবাদ, মূর্ত্তিপূজা, অভ্রান্ত গুরুতে বিশ্বাস প্রথম হইতেই আমার ছিল না। হৃদিস্থিত পরমাত্মাই এক-মাত্র সদ্‌গুরু; তিনি অন্তরে থাকিয়া উপদেশ দান করেন, বিবেক-কর্ণে তাহা শোনা যায়, এ-বিশ্বাস প্রত্যক্ষভাবেই পাইয়াছিলাম। আবার সেই পরমগুরুই আমার মঙ্গলের জন্য কোনো মনুষ্যকেও গুরুরূপে পাঠাইতে পারেন, তিনি অভ্রান্ত ঈশ্বর-স্বরূপ নহেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ এবং উপদেশ আমার পরিত্রাণ-পথের সহায়। তাঁহাকে মহাপুরুষ, বিশেষমনুষ্য, আচার্য্য, উপদেষ্টা বলিতে পারি। এ-বিশ্বাসও প্রত্যক্ষভাবে পাইয়াছিলাম।

এইসময় উপাসনার মধ্যে অন্তরে এইরূপ একটি অনুভূতি জাগিল, আমার অন্তরে যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস, সেই বিশ্বাস অনুরূপ যে-মণ্ডলীর সহিত বিশেষভাবে যোগ অনুভব করিতেছি, প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিয়া সেই মণ্ডলীতে যোগ দেওয়া উচিত। এ-অনুষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তাহাকে যদি ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ বলা যায়, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই—বরং তাহাই সঙ্গত। তখন এই সত্য বুঝিলাম; তারপর শারদীয় উৎসবের দিনে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আচার্য্যরূপে বিধিপূর্ব্বক আমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মদীক্ষা বা নববিধান মণ্ডলী-প্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বে আমি যখন পাপে তাপে অশান্তিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, তখন আমাদের কুলগুরু 'ঠাকুর মহাশয়' গোবরডাঙ্গায় আগমন করেন। সে-সময় আমাদের আত্মীয়বর্গের অনেকগুলি স্ত্রীলোক এবং পুরুষ দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহা একটি পবিত্র ভাব; ইহা আমার গ্রহণ করা আবশ্যক। তারপর আমিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তনের স্রোতে তাহা চলিয়া গিয়াছিল।

পরে এ-কথা ঠাকুর মহাশয়কে বলিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলেন :—"আমরা যে-মন্ত্র দিয়া থাকি তাহা সাংসারিক লোকের জন্য। তুমি তো সংসারের অতীত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথ ধরিয়াছ, সে-জ্ঞান আমাদের আছে কিনা সন্দেহ। তোমার ভালোই হইবে।" তিনি অত্যন্ত সরলভাবে এই কথাকয়টি বলিযাছিলেন, তাহা আমার আজো স্মরণ আছে।

গুরুঠাকুর স্বর্গীয় রাসবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাস ছিল যশোহর জেলার বেজোডাঙ্গা গ্রামে। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ, নানাকারণে বাসস্থান ছাড়িয়া অনেকদিন হইল সপরিবারে বরাহনগরে বাস করিতেছেন। তিনি যখন প্রথমে গোবরডাঙ্গায় আসেন, তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রীতি-সদ্ভাবের যোগ চলিয়া আসিয়াছে। তিনি "কুশদহ" পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

যোগকুটীর প্রসঙ্গ—বরাহনগরের বাড়ি বিক্রয় হইয়া গেলে, উপেন্দ্র আমার বিকলাঙ্গী পত্নীকেও তাঁহার পিত্রালয় হইতে সকলের সঙ্গে বাড়ি আনিয়াছিল। এই সময় আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী মারা যান। এইবার আমার পত্নী আমার সঙ্গে প্রান্তরে কুটীরবাসিনী হইতে প্রস্তুত হইলেন। আমার নিকট মন্দিরে আসিবার ইচ্ছা যেন পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হইয়াছিল। তথাপি যেটুকু জড়তা ছিল, এবার পুত্র বিনয় বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসার সঙ্গে তাহা কাটিয়া গিয়াছিল। তারপর একদিন তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয় জানাইয়া বলিলেন,—"আমাকে আর এখানে ফেলে রেখো না; তোমার কাছে আমার কোনো কষ্ট হবে না—দিনান্তে ভগবান্ তোমাকে যা দেন, তার থেকে 'একমুঠো' দিয়ো, আমি তার বেশী আর কিছু চাইব না।" তাঁহার সেই কাতরোক্তি-কয়টি আমার চিরদিন মনে আছে।

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দুইহাতের দুইগাছা বালা ছাড়া বাঁম হাতের উপরিভাগে একছড়া সোনার তাবিজ-অবশিষ্ট যাহা ছিল, দেখি তাহা খুলিতেছেন, আর বলিতেছেন—"এই লও, আমার আর গহনায় দরকার কি? এই তাবিজ ছড়া অমুক (হারাণ) কামারের দোকানে বিক্রী করে শীঘ্র একখানা ঘর তৈরী করো। আমি আর এ-বাড়িতে থাকবো না।

অতঃপর ক্ষেত্রবাবুকে সমস্ত জানাইয়া মন্দিরের পশ্চিম-উত্তরাংশে ইটেরদেয়াল খড়ের চাল একখানি কুটীর প্রস্তুত হইল। তখনো পর্য্যন্ত গণেশবাবুর বাড়ি তৈরী শেষ হয় নাই; মজুর-মিস্ত্রীরা আমাদের কুটীর তৈরী করিতে আন্তরিক যত্নসহকারে

পরিশ্রম করিয়াছিল। বস্তুত কুটীরখানি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন--দেখিতেও বেশ সুন্দর হইয়াছিল। এই কুটীর "যোগকুটীর" নামে অভিহিত হয়। ইহা ১২৯° সালের ঘটনা। তারপর আমাব বিকলাঙ্গী পত্নী ভগবানের পথে আমার সাধনসঙ্গিনী হইতে ব্রহ্মমন্দিরে কুটীরবাসিনী হইলেন।

এইসময় আর এক ঘটনা ঘটে। সহসা একদিন উমেশদাদা আসিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি লক্ষ্মণবাবুর নীলবীজ খরিদ করিতে কানপুর যাইতেছি। বরাহনগরের বাড়ি বিক্রয়ের দরুণ এখনো দুইশত কয়েক টাকা আমার নিকট আছে, এ-টাকা আমি আর কাহাকে দেবো—তুমিই লও। এই কথা বলিয়া দাদা টাকা দিয়া গেলেন।

দণ্ডীদাদা সাড়ে ষোলোশত টাকা দেনার ফর্দ্দ দিয়া, পিতা ও কন্যাকে লইয়া খাঁটুরার বাড়িতে গেলেন, এ-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ দেনা ব্যতীত দাদার স্ত্রীর গহনা বিক্রয়ের দরুণ দুই শত টাকা চিনির কারখানায় দাদার কন্যা নারায়ণদাসীর নামে জমা ছিল, দাদা নিজ হাতে ঐ-টাকা দেনার হিসাবে যোগ করেন নাই বটে, কিন্তু বস্তুত উহা দেনার মধ্যে গণ্য।

একদিন রাত্রিকালে নবনির্ম্মিত—মঙ্গলালয়ে বসিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি তাহার মধ্যে এই দেনার কথা আমার মনে উদিত হইল; এ-দিকে তখন নারায়ণদাসীর বিবাহ হইয়াছে সুতরাং ঐ দুই শত টাকার পরিমাণ একখানি গহনা তাহাকে দেওয়া হইল। উমেশদাদাকে বলিয়া বরাহনগরের বাড়ি বিক্রয়ের টাকা হইতে এ-টাকাও দেওয়া হইয়াছিল।

বরাহনগরের বাড়ি বিক্রয়ের টাকা লইয়া দেনা মেটাইতে উমেশদাদা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, এ-কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার মধ্যে পিতাঠাকুর এবং মাসীমাতা (তাঁহার তো পৈতৃক ভিটা) হইতে উপেন্দ্র পর্য্যন্ত সকলের আবদার মেটাইতে উমেশদাদা সকলকেই যথাসম্ভব কিছু কিছু অর্থ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উমেশদাদা টাকা দিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি মনেও করি নাই যে, সমস্ত খরচ করিয়া এখনো দাদার নিকট অবশিষ্ট কিছু আছে। ভগবানের করুণায় এই অর্থপ্রাপ্তিতে আরো একটি বিষয় মনে জাগিল।

ছোট ভাই যতীনের পড়া ছাড়াইয়া এত শীঘ্র তাহার বিবাহ দিতে আমার মত ছিল না সত্য। কিন্তু তখন মনে হইল বধূটিতো আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ বটে। অন্য দুইটি ভ্রাতৃবধূ যাহাহউক পৈতৃক অর্থেই যথাসম্ভব সালঙ্কারা হইয়াছিলেন। এখনও সেই পৈতৃক অবশিষ্ট অর্থ যখন আমার হস্তগত হইল তখন সেই পরিমাণেও একখানি অলঙ্কার তিনি পাইবেন না কেন? আমার অমতে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বধূটি কি আমার স্নেহবঞ্চিতা হইবেন? তাহা তো হইতে পারে না। এই ভাব প্রাণে উদিত হওয়ায় সাশ্রুনয়নে বড়ই আনন্দ পাইলাম।

তারপর ঐ টাকার মধ্যে একখানি গহনা (সম্ভবত দুইগাছি বালা) প্রস্তুত করিয়া বরাহনগরে যতীনের শ্বশুর (প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের) বাটীতে গিয়া বধূমাতাকে ঐ গহনা দিয়া আসিয়া ছিলাম।

ভগবানের স্পর্শ পাইয়া একদিকে যেমন নিজ অন্তরে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তৎসংস্পর্শে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেক সময় সদ্ভাববিকাশ হয়, তাহার নিদর্শনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঐ গহনার ব্যয় বাদে যাহা-কিছু অবশিষ্ট (দশ-বিশ টাকা) ছিল তাহা যোগকুটীর নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল।

যোগকুটীরবাসিনী হইবার পর আমার বিকলাঙ্গী পত্নীর দিন দিন মনের প্রফুল্লতা এবং শারীরিক উন্নতিও কতকটা দৃষ্ট হইয়াছিল। নিজ হাতে তাঁহার সেবা করিতে যে-ইচ্ছা একদিন হইয়াছিল, এতদিনে তাহা সফল হইল।

ইনি বরাহনগরের অন্তর্গত বনহুগলি-পল্লীস্থ শশিপদ বাবুর বালিকাবিদ্যালয়ে পিতার যত্নে যে অল্পদিন পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে এখন নিজ-চেষ্টায় সহজ সহজ পুস্তক পাঠ করিয়া এবং উপাসনা-প্রার্থনায় যোগ দিয়া কিছু কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ক্ষেত্রবাবু কিম্বা প্রচারক মহোদয়গণ আসিলে মন্দিরের উপাসনায় তাঁহাকে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিতাম। মধ্যে মধ্যে ছুটিতে কলিকাতা হইতে বিনয় এবং বরাহনগর হইতে ত্রৈলোক্য আসিলে কয়েক-দিনের জন্য আমাদের এই নির্জ্জন কুটীর আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

তাঁহার শরীরের স্বাভাবিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটায় মনের একটি সহজ সরল অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। সাময়িক আনন্দ বা রাগ দুঃখ অল্পেই হইত, অল্পেই যাইত। ফলত মনটি ভালো ছিল বলিয়া সহজানন্দ ভাবটিই স্থায়ী হইত।

প্রবাসী সারদাপ্রসাদ—আমি সর্ব্বপ্রথমে ক্ষেত্রবাবুর মুখেই সারদা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম শুনিয়াছিলাম। তিনিও সুদূর প্রবাসে থাকিয়া আমার বিষয় ক্ষেত্রবাবুর পত্রেই অবগত হইয়াছিলেন। খাঁটুরা-দত্তবাড়ির পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ি ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দত্তপরিবারের পুরোহিত বংশের একজন ছিলেন। এবং তৎসম্পর্কে ক্ষেত্রবাবুকে খুড়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু পরস্পর বয়সে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

পূর্ব্বে এমন একটা সময় ছিল যে, অনেক বাঙালী যুবক (পলাতক ছেলে) পশ্চিম প্রদেশে গিয়া A. B. C. D. পড়া বিদ্যার জোরে ভালো ভালো চাকরী পাইয়া পরিণামে যশস্বী এবং ধনশালী হইয়াছিলেন। আমাদের সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় সেই শ্রেণীর একজন। তাঁহার কথা পরে বলিতেছি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী শিবাণী দেবী অল্পবয়সে বিধবা হইয়ছিলেন। তারপর তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারের সহিত প্রবাসবাসে বহুদিন অবস্থিতি এবং বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া ছিলেন। তিনি বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিদেশে সৎসঙ্গ-সৎশিক্ষার সংস্রবে থাকিয়া এবং নিজের সদ্ভাব-প্রণোদিত স্বভাববশত উচ্চ-সংস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট দাসের কথা অবগত হইয়াছিলেন। শিবাণী দেবী বয়সে এবং জন্মভূমি সম্বন্ধে আমার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। আমাদের সে পরোক্ষভাবের আদান-প্রদান প্রত্যক্ষে ঘটিল, বহুকাল পরে যখন তিনি খাঁটুরার বাড়িতে আসিলেন।

এক প্রখর মধ্যাহ্নে পূজনীয়া শিবাণী দেবী খাটুরা-ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া নির্জ্জন প্রান্তরস্থ 'যোগকুটীর'বাসী বিকলাঙ্গী পত্নী-সহ দাসকে দেখিয়া বলেন, "যোগীন্দ্র, আজ যেন 'পঞ্চবটী' আসিয়াছি মনে হইতেছে।" তিনি যে উচ্চ উপমা দ্বারা তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে ভাব-স্মৃতি দাসের অন্তরে চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছে। বস্তুত যাঁহাদের মন বড় তাঁহারা অন্যের মধ্যেও মহৎভাব দেখিতে পান। তারপর আমার স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় সস্নেহভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, "তুমি ষষ্ঠীপালের মেয়ে?"

আমাদের প্রবাসী সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৈতৃক গুরু-পুরোহিতের বৃত্তি ছাড়িয়া মিসনরী স্কুলে সামান্য ইংরাজী পড়িয়া তরুণবয়সেই পশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন। প্রথমে সামান্য অবস্থা হইতে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে ক্রমশ উচ্চপদে উন্নীত হইয়া স্থানপরিবর্ত্তন-সহকারে শেষে লাহোর সুপারিণ্টেণ্ডিং আফিসে আড়াই শত টাকার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এবং পঁইত্রিশ বৎসর কার্য্যান্তে অবসর গ্রহণ করিয়া, তারপর বাইশবৎসর পর্য্যন্ত মাসিক একশত পঁচিশ টাকা পেন্‌সন্ ভোগ করিয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমাবধি ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয়—সে-এক বিচিত্রব্যাপার। যদিও তাঁহার ধর্ম্মভাব সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণ, তিনি যখন যে-সম্প্রদায়ের সংস্রবে আসিয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে একমাত্র সত্যের দিকই দেখিতেন এবং

তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সেইভাবেই সে ধর্ম্ম প্রচার করিতে উৎসুক হইতেন।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—

"১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া দিল্লী, আম্বালা অমৃতসর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে ফিরোজপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্ট চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে বদলী হন। এই বৎসরে তাঁহার বাটীতে 'লাহোর ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদাবাবু তাহার আচার্য্য হন। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি পঞ্চনদবাসীর যে ঘোর বিদ্বেষ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল; এক্ষণে বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাহা বহুল পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। স্থানীয় অনেক বাঙালী ও পাঞ্জাবী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সারদাবাবুর সম্পাদকতায় এবং পণ্ডিত ভানুদত্ত বসন্তরাম প্রমুখ বর্দ্ধিষ্ণু পাঞ্জাবীগণের সহায়তায় বাঙালী বালকদিগের জন্য বাংলা ও ইংরাজী নাইটস্কুল এবং পাঞ্জাবীদিগের জন্য "সৎসভা" প্রতিষ্ঠিত হইল। সারদাবাবু গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মোপলক্ষ্যে পাঞ্জাবের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

কাংড়ার ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ ওয়াজীর আলী খান ও সর্দ্দার আমিনচাঁদ বাহাদুরের সহায়তায় তিনি কাংড়ায় আঞ্জুমান সভা স্থাপন করিয়াছেন। জলন্ধরে রেভারেণ্ড গোলোকনাথের সহায়তায় একটি সাধারণ পাঠাগার ও বক্তৃতা-সভা স্থাপন

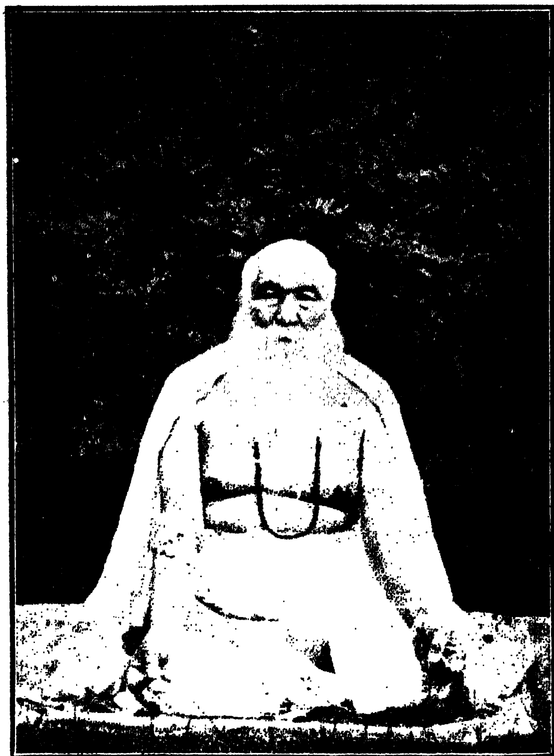
করিয়াছেন। শিমলাশৈলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও কাশ্মীরের মহারাজার অর্থসাহায্যে "শিমলা সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা" স্থাপন করিয়াছেন। পাতিয়ালা ও নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সভার সভ্য।

আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় একসময় সিন্ধাবতীতে কোনো সাধুর সংস্রবে আসিয়া, তাহার পর হইতে সনাতনধর্ম্ম বা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে দেহমন নিয়োগ করেন। শিমলা সনাতন-ধর্ম্মসভা তাহারই ফল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিরদিন অতিশয় সতর্কতার সহিত যত্নপূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম পালন করিতেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহাকে উচ্চ ইয়োরোপীয়ানের ন্যায় মনে হইত। প্রাতরুত্থান হইতে স্নান আহার ভ্রমণ বিশ্রাম লিখন পঠন—দৈনিক সাধনভজন পর্য্যন্ত সমস্তই যেন তাঁহার ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটার মত ছিল। কোনোদিন কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না। তাহার ফলে অশীতিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ স্বাভাবিক সুস্থ ছিল।

দীর্ঘপ্রবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২৩ সালের ৪ঠা বৈশাখ দেরাদুন-প্রবাসে দেহত্যাগ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দাসকে একপত্রে লিখিয়াছিলেন; "ভগবানের কৃপায় দীর্ঘ জীবন-পথে সুস্থ শরীরমন লইয়া পরলোকের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এখন ভাবে ও প্রেমে যাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে মনে হয়, যোগীন্দ্র, তার মধ্যে তুমি একজন।" তাঁহার এই ভাবপূর্ণ বাণী দাসের হৃদয়ে চিরদিন গাঁথা রহিয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের লোক, তিনি বিদেশে জীবন যাপন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে



স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কি আমরা ভুলিয়া যাইব? তাঁহার পুত্রদ্বয়—সুরেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র কলিকাতা ১৫, নন্দরামসেন ষ্ট্রীট নিজ বাড়িতে বাস করিতেছেন।

ধর্ম্মপ্রচার—বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সাধন এবং প্রচার করিতে আমি বিধাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম, একথা প্রথমেই বলিয়াছি। "আমরা কর্ম্ম করিব, ফল বিধাতার হাতে"—ইহা অতীব সত্য কথা। তথাপি তিনি তাঁহার স্মরণাগত দাসদিগের আশা আনন্দবিধানার্থ মধ্যে মধ্যে সাধনফলও দেখান।

যেসময় আমার জন্মভূমির পল্লীতে পল্লীতে এই নব-ধর্ম্মের সমাচার এবং আদর্শ কায়মনোবাক্যে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন দেশ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের ধারণা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এ-অবস্থা যুগে-যুগেই হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য হইতে যীশুখৃষ্ট মহম্মদের ধর্ম্মবার্ত্তায় সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যাঁহারা রাজা রামমোহনকে একদিন হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরেরা রাজার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিতেছেন। যুগধর্ম্মাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে কেহই সক্ষম হন নাই। যথাসময়ে তাহার জয় হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে নবভারতে যে-শক্তি নবাঙ্কুরে আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল, আজ সেই শক্তির ক্রম-বিকাশ-গতি-অনুসারেই রাষ্ট্রীয় জাগরণ-সমন্বিত সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা মন্ত্রশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতে এক নবরূপ ধারণ করিতে উন্মুখ হইয়াছে, এ-গতি রোধ কে করিবে?

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামে যে-ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কোনো সফলতা দৃষ্ট হইয়া-

ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব। কারণ দাসের আত্মকথা কেবল বর্ত্তমানের জন্য নহে, ইহার প্রধান লক্ষ্য ভবিষ্যৎ বংশের দিকে। পরন্তু 'ব্রহ্মমন্দিরে সাতবৎসর' পরিচ্ছেদে বাহিরের কাজকর্ম্ম এবং দাসের পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কিছু উল্লিখিত না হইলে এ-প্রসঙ্গ পূর্ণ হইতে পারে না।

মাণিক—সম্ভবত ১২৯৫ সালের শেষে একদিন সহসা আঠারো উনিশবৎসর বয়স্ক একটি মুসলমান যুবক ব্রহ্মমন্দিরে আমার নিকট উপস্থিত হয়। তাহার নাম মাণিক। চাঁছুড়িয়ার অন্তর্গত আলাইপুর নামক গ্রামের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার জন্ম। আলাইপুর পাঠশালায় সে কিছু বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তখন তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ বর্ত্তমান ছিল না, সে অনাথ বালকের ন্যায় ছিল। প্রথমত মাণিককে দেখিয়া মুসলমান বালক বলিয়া মনে হয় নাই। পরে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্মে সে বিশ্বাস করে না; অর্থাৎ কেবল কোরআন এবং মহম্মদের নামে যে-ধর্ম্ম আবদ্ধ তেমন ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস ছিল না। উদার একেশ্বরবাদেই তাহার বিশ্বাস—অনেকটা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ-ভাব নাকি সে আলাইপুরে তাহার শিক্ষকের নিকট পাইয়াছিল।

মাণিক নিরামিষভোজী—সে চিঁড়া খাইয়া অক্লেশে দিন কাটাইতে পারিত। এত অল্পবয়সে তাহার এরূপ কঠোর সংযম ও ধর্ম্মভাব এবং মুসলমান সমাজের প্রতি তাহার

কল্যাণ-কামনা দেখিয়া মাণিকের উপর স্বভাবত আমার সস্নেহভাব জন্মিল। তারপর যখন বুঝিলাম মাণিক আমার নিকট থাকিয়া সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছুক, তখন হইতে সে ব্রহ্মমন্দিরে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে হুদো-মাণিকক্ষিরা গ্রামে যাওয়া আসা করিতে লাগিল; কারণ তখন সে তথা হইতে এখানে আসিয়াছিল।

চার পাঁচ বৎসরাধিক কাল মাণিক আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাটাইয়া তারপর আমার অনুপস্থিতির জন্য অন্যত্র যায়। কিন্তু দূরে থাকিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত মাণিক আমার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াছিল। সে-যে সকল বিষয়েই আমার সঙ্গে একভাবাপন্ন বা অনুগত শিষ্যবৎ ছিল তাহা নহে, তথাপি আমাদের এই স্বাধীন যোগাযোগ বেশ সদ্ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মাণিকের কতকটা আলাপ-পরিচয় হয়। মঙ্গলগঞ্জে, আহিরীটোলায় ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি এবং প্রচারক মহাশয়দিগের নিকট গিয়া মাণিক তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পরিচিত হইয়াছিল। একসময় মাণিক ঢাকা রংপুর বগুড়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্মের সহিত পরিচিত হয়।

মাণিকের কতকগুলি কাজ ছিল। তাহার মধ্যে মুসলমান বালক এবং বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে সে অনেক যত্ন এবং চেষ্টা করিত। গাছ-গাছড়া ঔষধ-পত্র কিছু কিছু তাহার জানা ছিল। তাহার দ্বারা সাধারণ রোগের আশু

প্রতীকার করিতে পারিত। সে একসময় কলিকাতার সদাশয় অবিনাশ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইয়াছিল।

মাণিক সেলাইয়ের কাজে কতকটা অভ্যস্ত ছিল। তদ্দারা অন্যের উপকার করিয়া নিজের যৎকিঞ্চিৎ জীবিকাসংগ্রহের চেষ্টা করিত, কিন্তু কার্য্যত বেশী কিছু ঘটিয়া উঠিত না। আহারের জন্য তাহার বেশী চিন্তা করিতেও হইত না। মাণিক ধৈর্য্যশীল কষ্টসহিষ্ণু ছিল।

বাহিরের কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে মাণিকের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তজ্জন্য রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের নিকট তাহাকে অনেক নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল। আবার তাহার উপকারে বাধ্য হইয়া অনেকেই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিত না। প্রয়োজন কালে জমিজমা-সংক্রান্ত সৎ-পরামর্শ দিয়া মাণিক আইন-আদালতের কাজে অনেকের সাহায্য করিত।

কুশদহের গ্রামে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া মাণিক নিজ জীবনব্রত সাধন করিয়া গিয়াছিল। চিরকুমার—সচ্চরিত্র মাণিকের সহিত আমার বিশবৎসর কাল যোগ চলিয়াছিল। আমি কলিকাতায় থাকায় মাণিকের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। বোধ হয় ১৩১৭ সালে আমার সহিত মাণিকের শেষ দেখা হয়। তারপর সে মারা যায়। তাহার বয়স চুয়াল্লিশের বেশী হয় নাই। মাণিকের কথা মনে হইলে আজো তাহার অভাব আমার মনে জাগিয়া উঠে।

রামতারণ মিস্ত্রী—মঙ্গলালয় নির্ম্মাণ করিতে অনেক মজুর মিস্ত্রী কাজ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে কাঠের কাজে সুদক্ষ মিস্ত্রী একজন ছিল, তাহার নাম রামতারণ। সে মধ্যবয়স্ক ঋজুকায় এবং তাহার প্রকৃতি সৎ ছিল।

আমি যখন মিস্ত্রীদের কাজ দেখিতাম তখন তাহাদের সঙ্গে কিছু ধর্ম্মের কথাও কহিতাম। একদিন ছুটী হইলে যখন সমস্ত লোক চলিয়া গিয়াছে, তখন দেখি কে-যেন মন্দিরের দিকে আসিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলাম রামতারণ মিস্ত্রী।

রামতারণকে বসিতে বলিলাম। তারপর সে বলিল, "বাবু, আপনি যে সমস্ত কথা বলেন, তাহা আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু কাজের সময় আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি না। ঐ-যে খোলের মধ্যে আসল বস্তু ঐতো ঠিক; বাহিরের বস্তুর পূজো ক'রে আসল কাজ তো হয় না?"

রামতারণের লেখাপড়াজ্ঞান ছিল না। "খোলের মধ্যে আসল বস্তু" তাহার এ-কথার ভাবার্থ, দেহের ভিতরে অন্তরাত্মা। রামতারণ জ্ঞানের পথে এ-কথা বুঝে নাই; সে সরল বিশ্বাসে ভক্তিভাবে নিরাকারতত্ত্ব বুঝিয়াছিল।

তারপর দুই-এক কথার শেষে দেখি, রামতারণ উচ্ছ্বসিত ভাবে সাশ্রুনয়নে বারম্বার বলিতেছে—"বিশ্বাস হয়েচে বাবা —বিশ্বাস হয়েচে।" রামতারণের বিগলিতভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ঐদিন সে যে-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত—অন্যূন বিশবৎসরকাল ঘরে বসিয়া প্রতিদিন রামতারণ ব্রহ্মোপাসনা

করিয়াছিল—তাহার এ-ভাবের আর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রামতারণের বাড়ি ছিল খাঁটুরার উত্তর-পাড়ায়। মন্দিরে সামাজিক উপাসনার সংবাদ পাইলে মধ্যে মধ্যে সে উপস্থিত হইত। উপাসনার মধ্যে অনেক সময় তাহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তি-বিগলিতভাবেই সে সত্যশিবসুন্দরের উপাসনা করিত। ভক্তির সাহায্যে রামতারণ ব্রহ্মোপাসনার ভিতরে যেরূপ প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু, লক্ষ্মণবাবু এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রচারক মহাশয় পর্য্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উচ্চজ্ঞান লাভ বা বাহ্যিকসংস্কারের দিক রামতারণ গ্রহণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু জাতিভেদ সংস্কার তাহার দূর হইয়াছিল। ১৩০৯ সালে আমাদের গোবরডাঙ্গার বাড়ি বিভাগের পর তাহার মেরামত হয়, সেইসময় রামতারণ মিস্ত্রী কাঠের কাজ করিতে গিয়াছিল। একদিন সে ইচ্ছা করিয়া আমার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল। তা-ছাড়া উৎসবের সময় প্রকাশ্যে সকলের সঙ্গে আহার করিতে সে কুণ্ঠিত হইত না।

রামতারণের দৃষ্টান্তে এই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় যে, সরলচিত্ত ভক্তিমান ব্যক্তি নিরক্ষর হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারে। তাহার ঈশ্বর-ভক্তি এবং ভক্ত বিশ্বাসী জনে শ্রদ্ধা একই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চানন দাস—মাণিক এবং রামতারণের পরে—সম্ভবত ১২৯৮ সালে, সতেরো-আঠারো বৎসর বয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ-সুস্থকায় আর একটি তরুণ যুবক সহসা একদিন প্রাতঃকালে

মঙ্গলালয়ে উপস্থিত হয়। তাহার নাম পাঁচু—অর্থাৎ পঞ্চানন দাস। কাপালী জাতিতে তাহার জন্ম। তাহার বাড়ি বাদুড়িয়ার অন্তর্গত এক গ্রামে। সে বলে, "আমি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে হইলে লেখাপড়া জানা বিশেষ প্রয়োজন, আমার মা-বাপ নাই, বড় ভাই আছেন; তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আমার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। থাঁটুরা স্কুলে লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টায় এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সুবিধা হইল না। আমাকে একটি ভদ্রলোক আপনার কথা বলিয়া, তারপর বলিলেন, আপনার নিকট থাকিলে আমার সমস্তই হইবে। তাই আমি আপনার এখানে আসিয়াছি।"

পাঁচুকে দেখিয়া এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার আনন্দ হইল। তারপর তাহাকে বলিলাম, এখানে জীবিকার তো সংস্থান নাই, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহা কি তুমি পারিবে? তাহাতে পাঁচু কহিল, "ভগবানের দয়া ভিন্ন কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তিনিই সকলের আহার যোগাইতেছেন; এ-বিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ আছে।" সেই হইতে পাঁচু এখানে রহিল। তাহাকে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে লাগিলাম। ক্ষেত্রবাবু পাঁচুকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পাঁচু মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিতে লাগিল।

যোগকুটীরের সম্মুখে একখানা দো-চালা ছোট ঘর হইয়াছিল, তাহাতে রান্না করিতাম। এ-দিকে পাঁচু প্রত্যুষে উঠিয়াই

একান্তমনে পড়া করিত। তারপর স্ব-ইচ্ছায় কাঠ সংগ্রহ, জলতোলা প্রভৃতি কাজ করিতে করিতে আমার সাহায্য এবং আমার সঙ্গে সদালাপ করিত। আমাদের তুইবার রান্না হইত না একাহারেই আমরা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম।

এইরূপে দেড়বৎসরাধি কাল পাঁচু আমার নিকট অবস্থিতি করে। মধ্যে একবার বাড়ি গিয়াছিল; তখন তাহার আত্মীয়গণের কৌশলে তাহার বিবাহ হয়, তারপর সে ফিরিয়া আসিয়া আরো কিছু দিন ছিল।

শেষে অবস্থান্তর বশত আমরা যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন পাঁচুর মন ভাঙিয়া পড়িল। তাহার ওখানে থাকার আশা ভরসাও চলিয়া গেল। তারপর সে বালিকা-স্ত্রী সহ খৃষ্টীয়সমাজে যোগদান করে। তাহাতে তাহার বাহ্যিক উন্নতির সঙ্গে কিছু ধর্ম্মলাভ হয় নাই তাহা বলা যায় না। বত্রিশ বৎসর পরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ পাঁচুকে আবার দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম; পাঁচুও সেই পূর্ব্ব আনুগত্যভাব প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। পাচু এখনো খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য করিতেছে।

চিরবন্ধু যোগীন্দ্রনাথ—এ সকল বাহিরের ব্যক্তি ব্যতীত নিকটস্থ আর এক ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়াই চিরসঙ্গী ধর্ম্ম-বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। তিনি বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা বাবু যোগীন্দ্রনাথ দত্ত। যোগীন্দ্রবাবু প্রায় আমার সমবয়স্ক ছিলেন।



বাবু যোগীন্দ্রনাথ দত্ত

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক পুত্র ও একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন। সেই অবস্থায় যোগীন্দ্রনাথ অসৎপথাবলম্বী হইয়া ক্রমাগত অর্থ নষ্ট এবং শরীর ক্ষয় করিতেছিলেন। তাঁহার এই পতনের অনুকূলে দুইটি কারণ ছিল। অর্থের স্বাধীনতা এবং নিজ চিত্তের দুর্ব্বলতা। কিন্তু তাঁহার মধ্যে আদর্শ চরিত্রের এমন একটি ধারণা ছিল যে, নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্তও হইতেন। এই অবস্থায় তিনি খাঁটুরা-ব্রহ্মমন্দিরে আসিতে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"ঐ ব্রহ্মমন্দিরে গিয়াই তো বাঁচিয়া গেলাম—"যা'দের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি, তা'রাতো চাহে না আমারে" —কি শুভক্ষণেই বন্ধু-কণ্ঠে এই গান শুনিলাম, নচেৎ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উৎকট রোগ ভোগ করিতে করিতে মরিতাম।" ফলত যোগীন্দ্রনাথ একদিন দাসের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া আমরণ কাল পর্য্যন্ত তাহা ধরিয়াই ছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণে একদিন যে ধর্ম্ম-জীবনের উন্মেষ, পরিণামে তাহা গভীর ব্রহ্মোপাসনা-রসে নিমগ্ন হইয়াছিল। যোগীন্দ্রনাথ অতিশয় চঞ্চলচিত্ত ছিলেন। একমাত্র উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াই যেন সেই চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিতে সাধনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় থাকিলে, সামাজিক এবং বিশেষ বিশেষ উপাসনায় যোগ দিতে তাঁহার ক্রটী ঘটিত না—এমন-কি পরিচিত ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ব্রহ্মোপাসনার সংবাদ পাইলে, কখনো কখনো বিনা-নিমন্ত্রণেও কেবল উপাসনার আকর্ষণে

তথায় আকৃষ্ট হইতেন। ব্রহ্মোপাসনা সাধনে তিনি এমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, শেষে এই উপাসনা-প্রার্থনাই যেন তাঁহার জীবনসঙ্গীস্বরূপ হইয়াছিল।



চির-সঙ্গী বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ

যোগীন্দ্রবাবু নিজে কখনো অর্থ উপার্জ্জনের কাজে লিপ্ত ছিলেন না। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট যেন সহ্য করিতে পারিতেন না, তথাপি তিনি আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখ মায়া-মমতার মধ্যে



লিপ্ত থাকিয়া অনেক মনোকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ফলত তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। এবং তাঁহার হৃদয় মমতাপূর্ণ ছিল। দয়ামায়া তাঁহার কেবল মৌখিক ছিল না, এবং তিনি প্রচুর অর্থশালীও ছিলেন না, কিন্তু দয়াধর্ম্মে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। এজন্য শেষ জীবনে অর্থাভাবে কষ্টানুভব করিয়াছিলেন।

চিরসঙ্গী যোগীন্দ্রনাথ, দাসের সাংসারিক সেবাসাহায্য নিয়ত করিয়া গিয়াছেন। সকল সময়ে এমন-কি প্রতিদিনের সাহায্য-কারী বন্ধু ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বরভক্তি উপাসনা-শীলতা এবং দয়াধর্ম্ম এই ছিল তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতা।

১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে খাঁটুরার বাটীতে দাসের চিরবন্ধু যে-দিন চিরবিদায় লইলেন তার পরে যখন যমুনার শ্মশানঘাটে গিয়া তাঁহার শবদেহ দর্শন করি, তখন মনে হইল, নিদ্রিত বন্ধু চক্ষু চাহিয়া এখনই বলিবেন, "এই যে এখানেও এসেছেন?"

রাধাবল্লভ **চন্দ্র**—আর একটি খঞ্জ ব্যক্তি আসিয়া-ছিলেন, তাঁহার নাম রাধাবল্লভ, উপাধি চন্দ্র। মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে তাহার জন্মস্থান। তাঁহার একখানি পা অশক্ত—লাঠির সাহায্যে কোনোরকমে গমনাগমন করিতেন। এতদূরে কি সূত্রে এখানে আসিয়াছিলেন তাহা এখন আমার স্মরণ নাই, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। তাঁহার শারীরিক অবস্থা যাহাই হউক, মনের অবস্থা এবং ধর্ম্মভাব ভালোই ছিল।

রাধাবল্লভের আত্মীয় কেহ জীবিত ছিলেন না; তিনি অবিবাহিত ছিলেন। সে-সময় তাঁহার বয়স ত্রিশের বেশী

বলিয়া বোধ হয় নাই। তিনি এক পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। ইংরাজী ভাষায় অল্পই অভিজ্ঞ ছিলেন। সেখানে সৎসঙ্গের বিশেষ অভাব ছিল।

রাধাবল্লভ এখানে কিছু দিন থাকার পর মঙ্গলগঞ্জের অবস্থা এবং জমাট উপাসনার কথা শুনিয়া সেখানে গমন করেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং অবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মণবাবু তাঁহাকে সেখানে যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মঙ্গলগঞ্জে থাকিয়াও রাধাবল্লভ আমার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণবাবু আমার নিকট রাধাবল্লভের নামোল্লেখ কালে বলিতেন—"আপনার সেই খঞ্জ লোকটি।" ক্ষেত্রবাবুও ঐরূপ বলিতেন। বস্তুত রাধাবল্লভ চন্দ্র দাসের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করিতেন।

রাধাবল্লভ মাঘোৎসব-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় গিয়া ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি হইতে তাঁহার দ্বারা প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত পরিচিত হইয়া প্রচারাশ্রমেও কিছুদিন ছিলেন।

এইরূপে অন্যূন বৎসরাধিক কাল আমাদের মধ্যে থাকিয়া তারপর রাধাবল্লভ চন্দ্র তাঁহার দেশে গমন করেন। কিছুদিন চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তারপর আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শান্তসাধকের সমাধি—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুগামী প্রচারকদলের মধ্যে শান্তসাধক (quiet devotee) কেদারনাথ দে মহাশয়ের নাম এবং গুণে তাঁহার চিত্র আছে।

ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সাধ্বী কুমুদিনীর ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি কেদারবাবু চিরদিন শ্রদ্ধার্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন; কুমুদিনী-স্মৃতির বার্ষিক দিনের উপাসনা করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। মধ্যে মধ্যে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া নির্জ্জনসাধন এবং স্বপাকভোজনে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সত্যই তিনি শান্তসাধক ছিলেন। তাঁহার ভক্তি-বিগলিত সুমিষ্ট উপাসনায় যোগ দিয়া আধ্যাত্মিক খোরাক কিছু কিছু পাওয়া যাইত।

১২৯৮ সালের মাঘোৎসবে গিয়া দেখি কেদারবাবু জ্বর-রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া শয্যাগত। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"যোগীন্দ্রবাবু, আমাকে খাঁটুরায় লইয়া চলুন, আমি সেখানেই দেহত্যাগ করিব। আমার দেহাবশেষ ছাই কয়েকখানা মন্দির-সংলগ্ন ভূমির এককোণে স্থান দিবেন। এ-কথা এখন মনোমতধনের মাকে বলিবেন না; সেখানে মুক্ত বাতাসে আরোগ্যলাভ করিতেও পারি এই কথাই বলিবেন।"

কেদারবাবুর অভিপ্রায় লক্ষ্মণবাবুকে জানাইলাম; তিনি শীঘ্রই ভক্তসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেদারবাবুর সহধর্ম্মিণী কোলের ছেলেটি লইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র—মনোমতধনের সাহায্যে তাঁহাকে মঙ্গলালয়ে আনেন। আমি কেদারবাবুর সহধর্ম্মিণীকে মাতৃসম্বোধন করিতাম।

কেদারবাবু মঙ্গলালয়ে আসিয়া প্রথম সপ্তাহে কিছু ভালো বোধ করিয়াছিলেন। 'রামকৃষ্ণ রক্ষিত'-দাতব্য চিকিৎসালয়ের তৎকালীন স্থানীয় ডাক্তার—স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ রক্ষিত মহাশয়

কেদারবাবুকে সযত্নে কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর রোগবৃদ্ধি হইয়া একমাস সাতদিনের শেষে ২৫শে ফাল্গুন রবিবারে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। অন্তিমকালে তাঁহার পত্নী পাচপুত্র, চারকন্যা এবং সহযোগী প্রচারক ভাইদিগের মধ্যে কান্তিবাবু, গৌরবাবু প্রভৃতি তিন-চারজন উপস্থিত থাকিয়া সেবা কারয়াছিলেন। প্রতাপবাবু, ত্রৈলোক্যবাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর তুইদিন পূর্ব্বে প্রতাপবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন আছেন? ভিতরে শান্তি আছে তো, এখন কি ভাবিতেছেন?"

প্রতাপবাবুকে দেখিয়া কেদারনাথ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলেন,—

"আপনি আমাকে বড় ভালোবাসেন, তা আমি জানি।" তারপর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "এখানে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়বো। এই ঘুম কোথায় গিয়ে ভাঙ্‌বে তাই ভাবছি।"

শান্তসাধকের শেষ বাণীটি আমার চিরদিন স্মরণ আছে। সাধু-ভক্তগণ বলেন, "ভগবদ্ভক্তের তিরোধান দর্শন, পরমসৌভাগ্যের বিষয়; তাহা তীর্থদর্শন অপেক্ষা সমধিক।"

কেদারনাথ দে মহাশয়ের নিবাস ছিল ২৪ পরগণার হরিনাভি গ্রামে। ইনি লাহোরে গভর্ণমেণ্ট আপিসে উচ্চপদে চাকরী করিতেন। তদবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গভীরভাবে সাধন-ভজন করিতে করিতে শেষে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। জীবিকার জন্য সপরিবারে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগ—১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসে আমাদের পিতাঠাকুর পরলোক গমন করেন। তিনি বিষয়-সম্পত্তি হারাইয়া দীর্ঘ বাইশবৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কিংবা রোগে অবসন্ন হইয়া কোনোদিন শয্যাশায়ী হইতেও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। প্রত্যহ যমুনায় প্রাতঃস্নান কালীন আকণ্ঠ সলিলমগ্ন হইয়া ঐশ্বরিক স্তব-বন্দনা করিতেন। আহার-নিদ্রা অনেক পরিমাণে সংযত করিয়াছিলেন।

দেহত্যাগের ছয়দিন পূর্ব্বে আমি মন্দির হইতে বাড়ি গিয়া তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়া কহিলাম, বাবা, একটু হোমিও-প্যাথিক ঔষধ আনিয়া দিব? তাহাতে তিনি বলেন, "আর ঔষধের প্রয়োজন নাই, তবে তোমার ইচ্ছা হয় দিতে পারো।"

মৃত্যুকালে উপেনের অমতের জন্য বাড়িতে তাঁহার নিকট থাকা আমার ঘটে নাই। শ্মশানঘাটে গিয়া তাঁহার চিরসমাধিস্থ মূর্ত্তি দর্শন এবং শেষ পদরজ গ্রহণ করি।

তারপর যথাসময়ে ব্রহ্মমন্দিরে থাকিয়া ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া দীন-ভিখারীর উপযোগী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করি; এই উপলক্ষ্যে কালকাতা হইতে আচার্য্যের কার্য্যের জন্য প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় এবং নিমন্ত্রিত কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু আগমন করেন, এবং বরাহনগর শশিপদবাবুর আশ্রম হইতে ভগ্নী ত্রৈলোক্যতারিণী, আমাদের মাতৃস্থানীয়া শশিপদবাবুর সহধর্ম্মিণীকে—আরো একটি মহিলা সহ লইয়া আসে। বিনয় কয়েকদিন আগেই আসিয়াছিল।

প্রিয়বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রহ্মমন্দিরে সাত বৎসর-বৃত্তান্ত যাহা বলিলাম, তাহার পরেও সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আরো যে ছিল না তাহা বলা যায় না, কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করা উচিত মনে করিলাম না। মাত্র আর একটি বন্ধুর কথা বলিব।

এ-পর্যন্ত সাধারণভাবে যাহারা ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া-আসা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বন্ধু দাসের সহিত পরিচিত হইয়া শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে যোগরক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস ছিল বালি-উত্তরপাড়া। গোবরডাঙ্গায় আমাদের প্রতিবাসী জ্যেঠা-মহাশয়—স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি আমাদের দেশের জামাতা হইয়াছিলেন।

সহরবাসী নূতন জামাতা গ্রামের বাহিরে ফাঁকা মাঠে অপরাহ্ন সময়ে ভ্রমণে বাহির হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করেন। তখন তিনি মেট্রোপলিটান্ কলেজে বি-এ ক্লাশের ছাত্র। তারপর বি-এল পাস করিয়া ছোট আদালতের উকীল হইয়াছিলেন। উত্তরকালে কিছু সঙ্গতিসহ গ্রে ষ্ট্রীট্-সংলগ্ন কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ এখন সেই বাড়িতে বাস করিতেছেন।

কলিকাতায় থাকার সময় হরিমোহনবাবু দাসের একজন সুখদুঃখে সহানুভূতি ও সাহায্যকারী বন্ধু ছিলেন। হৃদ্‌রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার বয়স পঞ্চাশের বেশী হয় নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মমন্দিরে শেষ পরীক্ষা—১২৯০ সাল হইতে ৯৯ সাল পর্য্যন্ত খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি এবং মঙ্গলালয়ের নির্ম্মাণ ও উন্নতি একমাত্র ভগবানের মহিমার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে যেখানে আমাদের আমিত্ব লুকাইয়া থাকে তাহা তিনি ঢাকিয়া রাখেন না। সহসা অভাবনীয়রূপে পরীক্ষার ঝটিকা তুলিয়া সমস্ত জঞ্জাল উড়াইয়া দিয়া আমাদের চিত্তাকাশ মেঘমুক্ত করেন।

সেইসময়ে নানাকারণে লক্ষ্মণচন্দ্রের হাতের নগদ টাকা কমিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু খরচের দিক প্রশস্তই ছিল। শুনিয়াছিলাম একসময়ে মঙ্গলগঞ্জ নীলকুঠীর কার্য্যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই চল্লিশহাজার টাকা লাভ হইয়াছিল। তারপর সেই অর্থ মূলধন করিয়া "মঙ্গলগঞ্জ মিশন-ফণ্ড" নামে এক দাতব্য ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়। মিশন-ফণ্ডের কথা পূর্ব্বে উল্লেখমাত্র করিয়াছি। কলিকাতা হইতে প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় সদল-বলে মঙ্গলগঞ্জে আসিয়া "মিশন-ফণ্ড" এবং তত্রস্থ বাড়ি "প্রচারাশ্রম" এবং লক্ষ্মণবাবু মিশন-ফণ্ডের "ভাণ্ডারী" এইসকল নামকরণ ঈশ্বরোপাসনা করিয়া বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করেন।

তারপর কয়েকটি আত্মীয় কর্ম্মচারী এবং যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়া লক্ষ্মণবাবু বিভিন্ন স্থানে আরো তিনটি নীলকুঠী স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার কোনটিতেই লাভ হয় নাই। বরং ক্ষতি হইয়া তিন-চার বৎসরের মধ্যে সেগুলির কার্য্য বন্ধ হয়।

ইতিমধ্যে ক্ষেত্রবাবু আমাকে হঠাৎ একদিন বলেন, "সম্প্রতি লক্ষ্মণ আমাকে একপত্র লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজের মানসিক ও পারিবারিক অশান্তির জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া তারপর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানাইয়াছে। শেষে লিখিয়াছে, "খরচপত্র সম্বন্ধে আমাকে একটা 'বন্ধানী' করিতে হইবে। অন্যান্য চারিদিকের ব্যয়—খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের মালীর বেতন ইত্যাদি এবং সপরিবারে যোগীন্দ্রবাবুর জন্য মাসিক খরচের একটা ব্যবস্থা—আপাতত ১৫ ৲ টাকা করিয়া নিয়মিত দিতে হইবে আমি স্থির করিয়াছি।"

ক্ষেত্রবাবু আমাকে ধীরে ধীরে কথাগুলি শুনাইয়া, লক্ষ্মণবাবুর অপরিমিত ব্যয় বিষয়ে অনেক সমালোচনা করিয়া, ভবিষ্যতে মঙ্গলগঞ্জ মিশন-ফণ্ড রক্ষা হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কথা বলিলেন।

আমাদের জীবিকার জন্য 'বন্ধানী' মতো মাসিক ১৫ ৲ টাকা লক্ষ্মণবাবুর নিকট গ্রহণ করিতে আমি অন্তরে সায় পাইলাম না। প্রথমত মনে হইল, লক্ষ্মণবাবুর নিকট সাক্ষাৎভাবে এবং নিয়মিতরূপে সাহায্য গ্রহণ করিব কেন? সাতবৎসরের মধ্যে এখানে কোনোদিন তো আমাদের অন্নের অভাব হয় নাই। যেদিন এখানে আসিয়াছিলাম সেদিন তো কোনো বন্দোবস্তের মধ্যে আসি নাই। একমাত্র বিধাতার উপর নির্ভর করিয়াই আসিয়াছিলাম—আজো সেইভাবেই আছি। এখন নিয়মিত সাহায্য গ্রহণ, বেতন গ্রহণের নামান্তর মাত্র। এ তো আমার পক্ষে 'সয়তানী ফন্দী'।

অবশ্য লক্ষ্মণবাবু নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভালোভাবেই এই ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অথবা এখন মঙ্গলগঞ্জ মিশন-ফণ্ডের যদি অস্বচ্ছলতা ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের ব্যয় সম্বন্ধে 'বন্ধানী' করা লক্ষ্মণবাবু (ভাণ্ডারী) আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন, সে-বিধি-ব্যবস্থা মামা-ভাগিনেয়তে করিতে পারেন, আমার সঙ্গে লক্ষ্মণবাবুর সাক্ষাৎভাবে দাতা-গ্রহীতার সম্বন্ধ আমি স্বীকার কবিতে পারি না। ক্ষেত্রবাবুকে আমার বিশ্বাসের কথা, এবং মাসিক সাহায্য গ্রহণ করিতে আমার যে আপত্তি তাহা জানাইলাম।

ক্ষেত্রবাবু প্রথমত আমাকে বলেন, "যোগীন্দ্র, তুমি যদি লক্ষ্মণের সাহায্য গ্রহণ না কর তাহাতে সে অতিশয় দুঃখিত হইবে, এবং তোমাদের মধ্যে যে এমন একটা সদ্ভাব চলিয়াছে তাহাতেও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। আর তুমিত জানো লক্ষ্মণই অধিকাংশ-ব্যয়নির্ব্বাহ করে। অতএব আমার মনে হয় এ-বিষয় লইয়া একটা গণ্ডগোল না করাই ভালো। বিশেষত লক্ষ্মণের এ-সব ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র, কার্য্যত ইহা বেশীদিন স্থায়ী হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। ভবিষ্যতের জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছি।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। এ-পর্য্যন্ত আমি ব্রহ্মমন্দিরে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দভাবেই অবস্থিতি করিয়া আসিয়াছি। ক্ষেত্রবাবু কিংবা লক্ষ্মণবাবু কোনোদিন আমার প্রতি কোনোরূপ কর্ত্তৃত্ব করেন নাই। কিন্তু উৎসবাদির সময়—যখন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইতেন, তখন স্বভাবত

কিছু কাজকর্ম্মের ভার আমার উপর পড়িত। সেই অবস্থায় আমার মনের মধ্যে এইরূপ একটা ভাব হইত, যেন এ-স্থান ক্ষেত্রবাবু ও লক্ষ্মণবাবুর, আমি তাঁহাদের অধীন একজন।

উৎসাহ-আনন্দের মধ্যে তখন আমার মন ছোট হইয়া যাইত। আমি অনুভব করিতাম,এ তো আমার প্রকৃত অবস্থা নয়; আমার অন্তঃকরণ যে-আদর্শ চাহিতেছে—তাহা কোনো অধীনতার মধ্যে থাকিয়া গড়িতে পারে না। এ-জীবন সাক্ষাৎভাবে ভগবানের হাতে-গড়া মুক্ত বস্তু হওয়া চাই। আমার জন্মভূমি—দেশকে সেই বস্তু—সেই ধর্ম্ম আমাকে দিতে হইবে। কোনোরকম ধার করা জিনিষ দেওয়া চলিবে না।

তবে এই যে প্রথম শিক্ষার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি, ইহাও আমার পক্ষে বিধাতার বিধান। এ-অবস্থায় না আসিলে এমন সহজে জীবন গঠিত হইত না। ক্ষেত্রবাবুর গভীর জ্ঞান, লক্ষ্মণ বাবুর বুক-ভরা প্রেম এবং প্রাণগত সেবা, এবং ব্রহ্মমন্দিরের নির্জ্জন সাধনক্ষেত্র বিধাতা আমার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তারপর শুনিলাম, ক্ষেত্রবাবু নাকি প্রথমত লক্ষ্মণবাবুকে আমার অভিমত জানাইয়া বলেন, "দেখ লক্ষ্মণ, যোগীন্দ্র আসার পর মন্দিরের যথেষ্ট উন্নতি এবং সকল বিষয়ে ভালো হইয়াছে। আমি জানি ও কাল কি খাইবে তাহা ভাবিবে না, কিন্তু ভাবের বিরুদ্ধে আর এখানে থাকিবে না—চলিয়া যাইবে।"

তারপর আর কি কথা হইল-না-হইল জানি না, শেষটা শুনিলাম, লক্ষ্মণবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলেন, "মামা, আমি

যোগীন্দ্রবাবুর ভাব বুঝিতে পারিয়াছি; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, উনি শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে থাকিবেন কিনা খুব সন্দেহ হয়। তা-ছাড়া মঙ্গলগঞ্জ মিশন-ফণ্ডের 'ভাণ্ডারী' বলিয়া আমাকে উনি বিশ্বাস করেন না—নচেৎ আমার হাতে অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? বেশ, উনিও স্বাধীনভাবে থাকুন, আমরা যতটুকু পারি উঁহার সেবা করিব, কিন্তু সম্পূর্ণ দায়ীত্ব রহিল না। বিশেষত যোগীন্দ্রবাবু সাধক এবং ধর্ম্মপ্রচারক, উঁহার কার্য্য আধ্যাত্মিক, সুতরাং মন্দির, বাগান, লাইব্রেরী প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর রাখিয়া তাঁহার সাধন-ভজন ধ্যান-চিন্তার ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়। আমি বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত কান্তি ভট্টাচার্য্যকে লিখিয়াছি, তিনি মালীর কাজকর্ম্ম সমস্তই দেখিবেন। মালীর বেতনাদি তাঁহার নিকট পাঠাইব, এজন্য তিনি আরও দুইটাকা বেশী বেতন পাইবেন।

এই কথা শুনিবার পরেই দেখি ঐরূপই বন্দোবস্ত হইল। তারপর আমরা এক কলসী জলের জন্য মালীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলাম। তখন চক্ষু ফাটিয়া একবিন্দু তপ্ত-অশ্রু পড়িয়াছিল, কিন্তু সেই ব্রহ্মসঙ্গীত প্রাণে ভাসিয়া উঠিল,—"বন্ধু বৈরী হয় তোমারি নিয়মে, দিতে নিদারুণ যাতনা মরমে; করে শিক্ষাদান সংসার-সংগ্রামে, তুমি হে বন্ধু কেবল।" আর? আর ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে বলিলাম, বুঝেছি তোমার রহস্য—যাহা চাহিয়াছিলাম তাহাই দিবে বলিয়া বুঝি এই কাণ্ডটা ঘটাইলে!

১২৯৯ সালের শেষে এই ঘটনা ঘটে। তারপর মাসাধিক কাল আত্মচিন্তা আত্মানুসন্ধান ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম, আর আমাদের এখানে থাকা হইতে পারে না। এখানকার সাধনা শেষ হইয়াছে। এখন এ-জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। তাহার স্থান কলিকাতায়। কিন্তু যে-লোক কপর্দ্দকশূন্য তার পক্ষে কলিকাতা সহরে বাসাভাড়া করিয়া এই বিকলাঙ্গী পত্নীসহ বাস করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষ এ-বিষয়ে ক্ষেত্রবাবু কিংবা নববিধান সমাজের প্রচারক পরিবারের প্রতিপালক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা নাই, বরং তাঁহারা ভাবিয়াছেন আমি নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া কিরূপে বাস করিব? তাহাতে বৈরাগ্যব্রত ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই ঠিক থাকিবে না, জীবনের পতন হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহাদের ঐ ভাব আমি জানিতে পারিয়াছিলাম।

এদিকে শশিপদবাবুর 'বরাহনগর-বিধবাশ্রমে' থাকিয়া ভগিনী ত্রৈলোক্যতারিণী আমাদের এই অবস্থার কথা সমস্ত অবগত হইয়াছিল। আমরা কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতে চাই শুনিয়া, সে সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতি জানাইল। কারণ আগে হইতে তাহার মন সর্ব্বদা আমাদের জন্য ব্যস্ত ছিল—লেখাপড়ার প্রতি তাহার মন বসিত না, স্বভাবত সে কর্ম্মশীলা ও চঞ্চলস্বভাবা ছিল। বিনয়ের জন্যও ত্রৈলোক্য সর্ব্বদা চিন্তিত হইত। আমি নিজে রান্না করি, ইহাতেও সে ক্লেশানুভব করিত।

প্রত্যেক বার ছুটীতে সে খাঁটুরায় আসিত, কিন্তু তাহার

নিজের রুচিমত কাজে-কর্ম্মে নানা কুসংস্কার এবং 'শুচীবাই' জন্য আমার অশান্তি ঘটিত। তা-ছাড়া তাহার স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না। উপাসনায় তাহার মন স্থির হইত না। তবে ত্রৈলোক্যর অন্তরে গূঢ় ধর্ম্মভাব এবং সরলতা ও যথেষ্ট মায়া-মমতা ছিল।

ত্রৈলোক্যর সংসারবুদ্ধি খুব পাকা ছিল। বোধ হয় সে কল্পনা করিয়াছিল, আমি কোনো কাজ-কর্ম্ম করিব, কিংবা যদি চাকরী করিতে হয় সেও ভালো। তজ্জন্য সে লিখিল "আপনারা শীঘ্র আসুন। ভগবান যা করেন তাই হবে।"

এই সময় সংবাদ পাইলাম, বোর্ডিংএ বিনয়ের উদরাময় পীড়া হইয়া দিন দিন তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এ-অবস্থায় তাহাকে বোর্ডিংএ রাখা কান্তিবাবুর ইচ্ছা নয়। এই সংবাদ শুনিয়া ত্রৈলোক্য শীঘ্র আমাদের কলিকাতায় আসিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল।

কলিকাতায় দুই-একদিন ঘুরিয়া বাসা ঠিক করিয়া যাইতেও পারি না; কারণ বিকলাঙ্গী পত্নীকে একাকিনী মাঠের মাঝে রাখিয়া আসিলে, কে তাঁহাকে অন্ন-জল দিবে? তথাপি আহারাদির পর দুইটার ট্রেণে আসিয়া আবার রাত্রি নয়টার মেলে ফিরিয়া গিয়াছি। এইরূপে দুই তিনবার—মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

সম্ভবত ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে শুনিলাম, লক্ষ্মণবাবু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হয়, তাহার উপর কাজকর্ম্ম স্নান-আহার সমস্তই চলিয়াছে—দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন।

স্নেহলতার বিবাহ—ইতিমধ্যে শুনিলাম লক্ষ্মণবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহলতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—বিখ্যাত ধনশালী, ডাক্তার আর, এল, দত্ত—তাঁহার একমাত্র পুত্র জহরলাল দত্তের সহিত। ক্ষেত্রবাবু এবং মাতৃহীনা স্নেহলতার প্রতিপালিকা সরস্বতী সেন মহাশয়া এই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। তাহাতে লক্ষ্মণবাবু বলেন,—

"এ-কি মামা, আমার এত-যত্নের গঠিতা মা স্নেহকে অর্থ-কূপে অব্রাহ্মের হাতে দিবেন ?"

তদুত্তরে ক্ষেত্রবাবু বলেন, ডাক্তার দত্ত প্রতাপবাবর একজন বিশেষ অনুরাগী ; জহরলাল পৌত্তলিক নয়—একেশ্বরবাদী ; বিলাতে গিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষত এই সূত্রে একটি বিশিষ্ট পরিবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতেছেন।

যাহাহউক শেষে এই সম্বন্ধই স্থির হইয়া, পার্ক ষ্ট্রীটে এক ভাড়া-বাড়িতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণচন্দ্রকে অসুস্থই দেখিলাম, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যস্ততার মধ্যে বিশেষ কোনো কথা হয় নাই।

লক্ষ্মণচন্দ্রের অকালপ্রয়াণ—আষাঢ়মাসে শুনিলাম লক্ষ্মণবাবু বিশেষ অসুস্থ, এখন গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন। তারপর হাওড়ায় বৈবাহিকের বাড়ি কিছুদিন থাকিয়া বড় আদরের মা স্নেহলতার শেষ সেবা গ্রহণ করিলেন।

শ্রাবণ মাসে শুনিলাম, কলেজ স্কোয়ারে বাড়ি ভাড়া করিয়া তথায় লক্ষ্মণবাবুকে রাখা হইয়াছে—অবস্থা ভালো নয়।

তারপর ৭ই শ্রাবণ আমার নিকট সংবাদ আসিল, লক্ষ্মণচন্দ্রের অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি দুইটার ট্রেণে গিয়া সেই দিব্যকান্তি রাজর্ষিকে আজ মুণ্ডিতমস্তক কঙ্কালসার বিদায়-পথের যাত্রী দণ্ডী-পুরুষের ন্যায় দেখিয়া আমি আর বাষ্পাকুল কণ্ঠ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিস্ফারিতনেত্রে লক্ষ্মণচন্দ্র আমাকে দেখিলেন, ধীরে ঈষৎ হস্ত প্রসারণ চেষ্টা করিয়া আমার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তারপর তাহা নিজ মস্তকে স্থাপন করিতে চাহিলেন—পারিলেন না। আমার তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তারপর রাত্রি নয়টার সময় স্ত্রীপরিবার এবং বৃদ্ধ মাতুলকে কাঁদাইয়া—সহকারীবর্গ, ধর্ম্মবন্ধু ও প্রচারকগণের কণ্ঠে ব্রহ্মস্তোত্রধ্বনির মধ্যে লক্ষ্মণচন্দ্র অকালে প্রয়াণ করিলেন।

তারপর সপ্তাহান্তে যথারীতি "নবসংহিতার" বিধিমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের ভূমিতে সমাধি স্থাপনার্থ চিতাভস্ম রক্ষিত হইল।

লক্ষ্মণচন্দ্র শেষ পক্ষের দুইপুত্র পাঁচকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশের অধিক হয় নাই। পুত্র দুইটির মধ্যে ছোটটি অল্পদিন পরেই মারা যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র সুমঙ্গলচন্দ্র ষোলবৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

শুনিয়াছিলাম মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে লক্ষ্মণচন্দ্র স্বহস্তে পেন্সিলের লেখা এক উইল লিখিয়া সমস্ত সম্পত্তি পাঁচজন ট্রাষ্টীর হাতে দিয়া যান। ১ম, মাতুল ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কন্যা-জামাতা—স্নেহলতা-জহরলাল; প্রধান কর্ম্মচারী অটলবিহারী দত্ত ও

অমৃতলাল ঘোষ। কিন্তু ট্রাষ্টীদিগের কার্য্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। শেষে তৎসংক্রান্ত এবং খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির ও বাগানাদি লইয়া ক্ষেত্রবাবুর সহিত লক্ষ্মণবাবুর দ্বিতীয়া বিধবা পত্নী অনঙ্গমোহিনী আশ চৌধুরাণীর কয়েকদফা মামলা-মোকদ্দমা হয়। সে-সকল বিষয় 'দাসের আত্মকথা'য় স্থান পাইবার বিষয় নহে।

তারপর ১৩২২ সালের ফাল্গুনমাসে বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনিও নববিধান সমাজের কয়েকজনকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া, এবং তাঁহার অবশিষ্ট অর্থাদি সরস্বতী সেন মহাশয়ার হস্তে দিয়া ব্রহ্মমন্দিরের ভবিষ্যৎ নিয়তির ভারার্পণ করিয়া যান।

তারপর হইতে মন্দিরে উপাসনাদি হয় না, অবরুদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে ক্ষেত্রমোহনের সমাধি তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে, আর বৎসরান্তে সেন মহাশয়া তাঁহার উপাসনা-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। আর তিনি এখন অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থায়ও মধ্যে মধ্যে সরিকান মোকদ্দমার ইন্ধনও যোগাইতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা মন্দিরের প্রতি দাসের মোহাবসান করিয়া দিয়া যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

বিদায়—আরো একমাস গত হইল—বাসা ঠিক করিতে পারিলাম না। শেষবারে আসিয়া বড়ই ব্যাকুলভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সেই অন্ধ বন্ধু চুণীবাবুকে মনে হইল। তখনই তাঁহার নিকট গিয়া আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম, যাহাতে তাঁহার নিকট আমরা থাকিতে পারি—তজ্জন্য একটি বাসা স্থির করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম।

চুণীবাবু আমাকে বসিতে বলিয়া লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করিতে করিতে পশ্চিম মুখে চলিয়া গেলেন। ১৫—২০ মিনিট পরে আসিয়াই বলিলেন, আপনার বাসা-বাড়ি ঠিক হইয়াছে— এই গলির মোড়ে একখানা পুরাতন বাড়ির উপরে তিনটি ঘর— কল পাইখানা পাইবেন, ভাড়া দশ টাকা। নীচের ঘরে গাড়ীর গোরু থাকে। বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অবস্থা ভালো নয়। বোধ হয়, ভাড়া মাসের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিতে হইবে। যদি ইচ্ছা হয় আপনারা কালই আসিতে পারেন।

আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তারপর চুণীবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, আমরা কালই আসিতে পারি বলিয়া রাত্রির মেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন রাত্রি দুইটার ট্রেণে বিকলাঙ্গী পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গোরুর গাড়ীযোগে ষ্টেশনে আসিলাম। ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধনেত্রে যোড়হস্তে বলিলাম ;—

মন্দির, বিদায়! সাতবৎসর পরে আজ বিদায়! চক্ষু ফাটিয়া দুইবিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণে অনাহূতভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যত্যাগ-স্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তাহাতে এক অযাচিত শান্তি অনুভব করিলাম।

রাত্রিশেষে ঘুঘুডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে বড় দরজাওয়ালা একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী করিয়া শোভাবাজার নন্দরাম সেনের গলিতে প্রথমে চুণীবাবুর বাড়ি সাড়া দিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট বাসায় গিয়া উঠিলাম। তখন আশ্বিন মাসের অর্দ্ধেক হইয়াছে।



গৃহস্থ-বৈরাগী

Gaya Art Press, Calcutta.

অন্ত বিবরণ

(গৃহস্থ-বৈরাগী)

"দাও মা সাজায়ে দীন সন্তানে।
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, বিবেক বৈরাগ্য পুণ্য,
বিবিধ ভূষণ মা গো যা সাজে গো যেখানে।"

সংসারপত্তন—একমাত্র বিধাতার মুখের দিকে তাকাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিবার দুইদিন পূর্ব্বেও হাতে একটি পয়সাও ছিল না, ভগ্নীর দরুণ পনেরোটি টাকা ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের নিকট অতিরিক্ত হিসাবে পাওনা ছিল। সেই টাকাকয়টি ডাকে আসিয়া পৌছায়।

নন্দরাম সেনের গলিতে বাসা করিয়া বোর্ডিং হইতে বিনয়কে এবং বরাহনগর হইতে ত্রৈলোক্যকে আনা হইল। কলিকাতায় আসিয়া পরিবারবদ্ধ হওয়ায় আমরা ব্রহ্মমন্দিরে থাকিতে যেমন প্রতিকুল পরীক্ষার অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, এখন তেমনি ভগ্নীর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সহায়তা পাইলাম।

পুত্র, ভগ্নী এবং অশক্ত পত্নীকে লইয়া এখন আমরা চারিটি প্রাণী একত্র হইলাম। ধর্ম্মবন্ধু চুণীবাবু হইলেন আমাদের সংসারের অভিভাবক—অবশ্য তিনি ফকির লোক, অর্থসাহায্য করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। সে প্রত্যাশাও করা হয় নাই। কেবল পরামর্শদাতা ধর্ম্মবন্ধুরূপেই তাঁহাকে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

বাসা করা হইল। সাংসারিক নিত্য ব্যবহারের জলপাত্র, ভোজনপাত্রাদিও আমাদের তেমন-কিছু ছিল না। তবে ভগ্নীর

নিতান্তই সাংসারিক দৃষ্টি, পূর্ব্ব হইতে সে-বিষয়ে তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ ছিল, তাই আমাদের তেমন অসুবিধা হইল না। বাকী মাটির পাত্রেও কাজ চলিতে লাগিল।

দোকানের কার্য্য—তারপর প্রথম কথা উঠিল, সংসার তো পাতা হইল, কিন্তু সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের কি উপায় করা যাইবে? অবশ্য চাকরী করিতে আমি একেবারেই নারাজ—তবে নিজে কোনোরকম ব্যবসায় করা,—পূর্ব্বে ঘি-চিনির বড় আড়দ্দারী কাজ করিয়া আসিয়াছি—তা-ছাড়া অন্য কাজ অভ্যাস নাই, আর কাজ করিবার মতো মূলধনই বা এখন কোথায়? এইসকল অবস্থা বুঝিয়া চূণীবাবু বলিলেন, কোনো ছোট-খাটো কাজ করিতে পারেন না কি? ত্রৈলোক্যর শ্বশুরবাড়ি বিক্রয়ের দরুণ বোধ হয় তিনশত টাকা বড়বাজারে বন্ধুবর যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দোকানে জমা ছিল। বুঝিলাম তাহা লইয়া দোকান করিলে তাহাতে ত্রৈলোক্যর অমত নাই।

বড়বাজারে মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায় একটি ছোট ঘর লইয়া দোকান করা হইল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা গেল, এ-দোকান চলিবে না। কারণ মাড়োয়ারীদিগের ভেজাল কম-দরের ঘৃতের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া সত্যভাবে খাঁটি জিনিষ বিক্রয় করা আমার সামান্য মূলধনের ক্ষুদ্র দোকানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কয়েকদিনেই তাহা বুঝিতে পারিয়া দোকান উঠাইয়া অর্দ্ধ বিক্রীত ঘৃতের কানেস্তারা ও চিনির বস্তা বাসায় আনা হইল। অধিকদিন এই দোকান রাখিলে ঘর-ভাড়ায় যৎসামান্য মূলধন শেষ হইয়া যাইত।

তারপর আমাদের পরামর্শ স্থির হইল যে, বাসাবাড়ির নীচেকার ঘরের সম্মুখে যে খালি-ঘর আছে, তাহা ভাড়া লইয়া চাউল, ডাউল, ময়দা, ঘৃত, চিনি ইত্যাদি সর্ব্বরকম জিনিষের দোকান করা হউক। কয়েকদিনের মধ্যে তাহাই ঠিক হইল। জিনিষ বিক্রয় ও ওজন-পত্র করিয়া দিবার জন্য একজন দোকানদারের প্রয়োজন, তাহাও সুবিধা-মতো পাওয়া গেল—আমার পূর্ব্বপরিচিত শোভাবাজারের বৃদ্ধ নফরচন্দ্র ঘোষের পুত্র কৃষ্ণ ঘোষ সন্তুষ্টচিত্তে আমার নিকট কাজ করিতে স্বীকৃত হইল। কৃষ্ণই দোকানের সাজ-সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত করিয়া লইল—দোকানও খোলা হইল। চূণীবাবু হইলেন দোকানের প্রধান পরিচালক। তাঁহার দ্বারা পাড়ার প্রায় অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ আমাদের দোকানের গ্রাহক হইলেন। চূণীবাবু দুইবেলা দোকানে বসিয়া সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

দোকান সম্বন্ধে আমার প্রধান কার্য্য, বড়বাজার হইতে ঘৃত চিনি খরিদ করিয়া আনা। আমাদের দোকানের মূলধন অতি সামান্য। এদিকে অধিকাংশ গ্রাহকের টাকা মাস-কাবারে লইতে হইবে, সুতরাং তাহাতে ঠিকভাবে দোকান চলার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু বিধাতার কৃপায় সহজে একটি উপায় হইল।

আমি এতদিনের পর কঠোর বৈরাগ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সাংসারিকভাবে উপার্জ্জন দ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছি দেখিয়া আমার আত্মীয়গণ—বিশেষত বাবু জয়গোপাল পাল (বিনয়ের মামা) ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধু শ্রীমন্ত সেন এবং 'রামকৃষ্ণ রক্ষিত'-ফারমের রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি আমাকে বাজারচলিত নিয়মানুসারে ঘৃত ও চিনি ১৪ দিনের মুদ্দতে বা ডিউতে ধার দিতে লাগিলেন। ঐ দুটি জিনিস অল্প লাভে পাইকারী দরে নগদ টাকায় বিক্রয় করিয়া তহবিলে বেশ টাকার স্বচ্ছলতা দাঁড়াইল। তাহাতে আটা ময়দা তৈলাদি বিবিধ দ্রব্য খরিদ করা হইতে লাগিল। এবং কুমারটুলীর আড়দ্দারদিগের নিকট হইতে ঐরূপ একমাসের মুদ্দতে গাড়ী গাড়ী চাউল ধার পাইতে লাগিলাম। এইসকল সুবিধা পাইয়া এবং অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সামান্য দোকানে মাসে ৫০৲ ৬০৲ টাকা আয় হইতে লাগিল, কিন্তু আমাদের দুটি সংসারের অর্থাৎ আমার ও চুণীবাবুর কতক ব্যয় এবং দোকানের ভাড়া, কৃষ্ণ ঘোষের বেতন ও খোরাকী—সকলরকমে ৮০৲ ৯০৲ টাকা মাসিক খরচ দাঁড়াইল।

কয়েকমাস ধরিয়া আয়ের পথ বৃদ্ধি করিতে অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাতে তেমন ফল হইল না। তথাপি একবৎসর দোকান চলিয়া বড়বাজার এবং কুমারটুলীর ডিউমত টাকা দিতে না পারায় মাল পাওয়া বন্ধ হইয়া জিনিষের অভাবে দোকান বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল—এইসময় কুমারটুলীর এক চাউলের আড়দ্দার ডিউমত টাকা না পাইয়া ক্রমে কড়া তাগাদা করিতে লাগিল। শেষ যে-দিন বৈকালে টাকা দিবার কথা ছিল, সেদিন বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত টাকার যোগাড় না হওয়ায় বড়ই ভাবনায় পড়িলাম। তখন হঠাৎ এক ব্যক্তিকে মনে হইল। তিনি বাবু ভূতনাথ পাল। তিনি তখন ভ্রাতৃ-

গণ-সহ মদনমোহন-তলায় এক ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের সঙ্গে দাসের একটা আত্মীয়-সম্পর্কও ছিল। তাঁহার তৃতীয় সহোদর বাবু জয়গোপাল পাল আমাদের দোকানের গ্রাহক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট তখন কিছু পাওনা ছিল না; বরং তাঁহার বড়বাজারের দোকানে আমাদের দেনাই ছিল।

দুইপ্রহর বেলায় আমি ভূতনাথ বাবুর নিকট গিয়া পঁচিশটি টাকা চাহিলাম, তিনি তখনই তাহা দিলেন। আমি বলিলাম, এই টাকা কবে ফেরত দিব তাহা বলিতে পারি না। তিনি বলিলেন, "এ টাকা আর ফেরত দিতে হইবে না।"

বাবু ভূতনাথ পালের নামোল্লেখ, মহাত্মা ক্ষেত্রমোহন, সারদাপ্রসন্ন, শ্রীশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সংস্কারক মহাত্মাগণের সহিত একসঙ্গে করা উচিত ছিল। কারণ ইনি তাঁহাদের কিছু পরবর্ত্তী সময়ের হইলেও সেই শ্রেণীর অন্যতম। যাহাহউক এখানে তাঁহার কথা সংক্ষেপে কিছু বলিব।

খাঁটুরা-নিবাসী পরলোকগত মঙ্গলচন্দ্র পাল মহাশয়ের চার পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র ভূতনাথবাবু ১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আহিরীটোলা-প্রবাসী খ্যাতনামা স্বর্গীয় সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয় ইঁহাদের মাতুল ছিলেন। বালক ভূতনাথ খাঁটুরা বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। বারো বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া কলিকাতায় মাতুলের যত্নে হেয়ার স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে, শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন।

এই পর্য্যন্ত শিক্ষা শেষ করিয়া ভূতনাথবাবু শিক্ষাবিভাগে চাকরী করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মাতুল সৃষ্টিধরবাবু অমত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন এবং মূলধন দিয়াও সাহায্য করিতে চাহেন। তারপর সৃষ্টিধরবাবুর অন্যতম ভাগিনেয় রাসবিহারী চেল বি-এ এবং ভূতনাথবাবু, মাতুলের মূলধনে "চেল এণ্ড পাল" নামে ফারম খুলিয়া তাহার অংশীদাররূপে পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

প্রথম দু'তিন বৎসরে পর পর প্রায় একলক্ষ টাকা ক্ষতি হয়, তাহাতে ভূতনাথ ও রাসবিহারীবাবু অতিশয় ভীত হইয়া পড়েন। তখন মাতুল বলেন, "যে-কার্য্য শিক্ষা করিতে তোমাদের একলক্ষ টাকা খরচ হইল সে-কার্য্যে কত টাকা উপার্জ্জিত হওয়া উচিত এখন তাহাই চিন্তা করিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।" ইহার পর কার্য্যে সমস্ত ক্ষতিপূরণ হইয়া যথেষ্ট লাভ হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে সেইসময় ভূতনাথবাবু স্বতন্ত্র হইয়া নিজে স্বাধীনভাবে কাজ আরম্ভ করেন। তাহাতেও প্রথমে ক্ষতি হয়। পরে ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সাহায্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

সংসারে প্রথমে তিনি ভ্রাতাদিগের সহিত একান্নবর্ত্তী হইয়া একত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে সর্ব্ববিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। ইহাতেই যেন তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

১৩০৯ সালে ভূতনাথবাবু "তাম্বূলী-সম্মেলনীসমাজ" স্থাপন করিয়া বঙ্গের সকল বিভাগের তাম্বূলী-শ্রেণীকে একতা-

সূত্রে মিলাইতে চেষ্টা করেন, এবং বিভিন্ন থাকে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-সূত্রে যাহাতে রক্তসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হয়, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র শিক্ষিত কাঙ্গালীচরণের বিবাহ অন্য থাকে দিয়া এ-বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু হায়, তাঁহার বড় যত্নের সংস্কার-কার্য্য ফেলিয়া ১৩১১ সালের ২৫শে ফাল্গুন তিনি পরলোক গমন করেন।

মাজ্জিতবুদ্ধি প্রতিভাশালী বাবু ভূতনাথ পালের বৈষয়িক জীবনের ক্রমোন্নতি এবং তাহার মধ্যে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা তাঁহার জীবনের একটি বিভাগ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনাদর্শ —তিনি সমাজসংস্কারক। তিনি এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ভূতনাথবাবু যদি আত্মজীবনীর কোনোরূপ মন্তব্য লিখিয়া যাইতেন, তবে হয় তো আজ আমরা তাঁহার অন্তরের কত গূঢ়ভাব জানিতে পারিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-দেশে সে-প্রথা আদৃত নহে—আত্মগোপনই এ-দেশের প্রকৃতি। বর্ত্তমান সময়ে অনেক মহাত্মা আত্মজীবনী লিখিয়া জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

এখানে উপস্থিত প্রসঙ্গ হইতে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাইব। তাহাতে ভূতনাথবাবুর প্রতিভার মৌলিকত্ব সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

বাবু ক্ষেত্রমোহন এবং বসন্তকুমার দত্ত মহাশয় কলেজে পড়িতে পড়িতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বতোভাবে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এ-কথা অবশ্য পূর্ব্বে

বলিয়াছি। তাহাতে এ-দেশে এবং তাম্বুলীসমাজে একটা আন্দোলন চলিয়া আসিয়াছে। কিছুদিন পরে বসন্তবাবু বাহ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ছাড়িয়া ভগ্নীপতি সৃষ্টিধর-বাবুর সংসার-সংসৃষ্টভাবে জীবনাতিপাত করেন। আহিরী-টোলায় দত্ত-পরিবার এবং কোঁচ-পরিবারের নৈকট্য বশত ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত ও মতামতের সমালোচনা-সূত্রে মাতুলালয়বাসী পূর্ণযুবক ভূতনাথের শিক্ষা-সংস্কার এবং চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে যে কিছুই কাজ করে নাই এ-কথা বলা চলে না। দাদামহাশয়ের (ক্ষেত্রবাবুর) সহিত ভূতনাথ এবং রাসবিহারীর সর্ব্বদা তর্ক-বিতর্ক চলিত। কখন কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া মানবচরিত্রগঠনে কিরূপ কাজ করে, তাহা সকল সময় বলা যায় না।

যাঁহাদের অন্তরে কোনো মহদ্ভাব থাকে সাধারণত তাঁহাদের দুইপ্রকার অবস্থা হয়। একপ্রকার ভাব মৌলিক, প্রথম হইতে তাহার কিছু কিছু সূচনা দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকার ভাব-প্রথম জীবনে তাহার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না, বরং বিপরীত ভাবই দেখা যায়।

ভূতনাথবাবুর জীবনে এই দ্বিতীয় অবস্থা দেখা যায়। প্রথমে তাঁহাতে সমাজসংস্কারকের কোনো ভাব ছিল না বরং বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইত। কিন্তু যথাসময়ে অনুকূল অবস্থা এবং স্বাধীন চিন্তা-প্রবাহ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া তাহার আকার ধারণ করিল।

আমাদের ভূতনাথবাবু উদারহৃদয় ছিলেন, মহাপ্রাণ ছিলেন,



সমাজ সংস্কারক ভূতনাথ

মার্জ্জিতবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা সফলতা লাভ করিয়াছিল। তারপর সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্রের কথা। অনেকের বিদ্যা থাকে, অনেকে প্রভূত উপার্জ্জনশীল হন, কিন্তু চরিত্রবান্ হইতে পারেন না। চরিত্র এবং শিক্ষার সঙ্গে ভূতনাথবাবুতে জাতীয় গুণেরও সমন্বয় হইয়াছিল। তাই উদ্যম, উৎসাহ ও তেজস্বীতার সঙ্গে ছিল তাঁহার বিনয় বিশ্বাস এবং বৈরাগ্য—যাহা ব্যবসায়ীশ্রেণীর প্রধান গুণ—বিলাসপরিশূন্যতা। চিরদিনই তাঁহার সাদা-সিধা ভাব ছিল। স্বোপার্জ্জিত অর্থ এমন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে সচরাচর দেখা যায় না। একসময় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর খগেন্দ্রভায়া কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"দাদার চাদরে জড়ানো বগলের (কক্ষের) নোটের তাড়া খরচ হইতে হইতে নিঃশেষ হইয়া যাইত—বাক্স সিন্দুকে আর উঠিত না।"

নূতন অবস্থার পরীক্ষা—বাসা আরম্ভের প্রথম দিনই এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। সাতবৎসর যাবত আমি নিরামিষভোজী, আজ বিনয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে; চুণীবাবু ১০টার মধ্যে আহার করিয়া আমাদের বাসায় আসিয়া বসিয়াছেন। এমনসময় আমাদের নিরামিষ আহার সম্বন্ধে কথা হইল যে, এখন এ-অবস্থায় দুই প্রকার আহার্য্য প্রস্তুত করা নিতান্ত অসুবিধার কথা—বোধ হয় প্রথমে ত্রৈলোক্য এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। তার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া চুণীবাবু এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, আহারের উপর যে-ধর্ম্ম নির্ভর করে তাহা অতি সংকীর্ণ। ধর্ম্ম অন্তরের

জিনিষ আহারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অবস্থাগত। এখন আপনার যেরূপ অবস্থা—ছেলেটিকে যাহা খাওয়াইবেন আপনারাও তাহাই খাইবেন। ফলত তখন অবস্থা সেইরূপই দাঁড়াইল, সুতরাং আর আমাদের নিরামিষ আহার চলিল না। একটি নিষ্ঠা ভাঙিল।

তার পর দোকানের কার্য্যে কোনো কোনো কথা যাহা বলা আমার পক্ষে বাধা বোধ হইতে লাগিল—সে-সকল কথা যে ঠিক সত্য বলা হইবে তাহা আমার মনে হইত না—যেমন একজনকে অমুক দিনে টাকা দেওয়া হইবে বলা হইল, কিন্তু আমি দেখিতাম তাহার সম্ভাবনা নাই, অথচ না বলিলে কাজ চলে না, তখনও চুণীবাবু এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, "সত্য মিথ্যার আসল ভাব ভিতরে; ভিতরে সদ্ভাব রাখিয়া—সংসারে বুদ্ধিমানের মতো দশজনে যেমন বলে, যেমন চলে, আপনিও যদি সেইভাবে না চলেন, না বলেন, তবে আপনাকে কেহ বুঝিবে না—আপনার সঙ্গে কেহ কর্ম্ম করিবে না, আপনি কর্ম্মের বাহির—সুতরাং ধর্ম্মেরও বাহির হইয়া যাহাকে বলে 'কোণ-ঠাসা' হইয়া না-খাইয়া মরিবেন। আর যদি জনসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে চান, তবে ভিতরে ধর্ম্মভাব রাখিয়া বাহিরে কর্ম্মজ্ঞান লইয়া চলিতেই হইবে।" ফলত এইরূপ ধারণাই তখন গৃহীত হইল। ক্রমে মনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তাহা বুঝিয়াও বুঝিবার যেন অবকাশ রহিল না।

তার পর যখন প্রতিমাসে দোকানের লোকসান সম্বন্ধে কথা

হইত, তখন চুণীবাবু বলিতেন—"আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করুন, আর না-হয় দোকান তুলিয়া দিন।" সেই কথায় তখন বুঝিতে পারিলাম, আমি কেমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি।

ইতিমধ্যে চুণীবাবু কৃষ্ণ ঘোষের কাজে বৃথা সন্দেহ করিয়া সহসা তাহাকে দোকান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল।

যখন আমাদের দোকান বাহিরে দেখিতে বেশ চলিতেছে, তখন পাড়ার কোনা কোনো বন্ধু আমাকে গোপনে বলিতেন, চুণীবাবু কি আপনার অংশীদার? (পাটনার) দোকানে তাঁহার তো কোনো মূলধন নাই, তবে কেন আপনি তাঁহার সাংসারিক খরচ যোগাইতেছেন? এ-কথার উত্তর দোকানের অবস্থাগত চিন্তা-সূত্রে আগেই আমার মনে স্থির ছিল। আমি মনে করিতাম, যিনি আমাকে অসময়ে সহানুভূতি করিয়া পৃষ্ঠপোষক হইয়া এখানে স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের ইষ্টানিষ্ট একপ্রকার যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে—যিনি আমাদের জন্য সময় ও মন দিতেছেন, এখন আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা কিরূপে করিব? অবশ্য দোকান আমাদের সমগ্র ব্যয় বহন করিতে পারিতেছে না—তিনিও তো তাহা দেখিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মবন্ধুর সহিত অর্থের জন্য নীচ ব্যবহার কখনই করিতে পারি না, দোকান যদি না-ই চলে, তখন বিধাতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

ইহা অপেক্ষা আরো একটি গুরুতর মনোকষ্টের কারণ হইল এই যে, অল্পদিনের মধ্যে আমি জানিতে পারিলাম যে, চুণীবাবু

আমার অজ্ঞাতে ত্রৈলোক্যকে "মন্ত্র" দিয়াছেন। তারপর আমাকেও তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। কেন-না আমার বিশ্বাস তাহা নহে। আমার মনে পূর্ব্ব হইতে যে-বিশ্বাস—যে-'গুরুজ্ঞান' আছে, সেখানে অন্যের স্থান ছিল না। তাহাতে তিনি এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন যে, উহাতে আমরা একভাবাপন্ন হইয়া একশক্তিতে কাজ করিতে পারিব। তখন আমার মন নরম হইয়া গেল। একদিন মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে স্থান পাইল না।

সরলকুমারের জন্ম—কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম যে, আমরা দীর্ঘকাল ব্রহ্মমন্দিরের প্রমুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বাতাসে, সদ্ভাবে নিয়ম-নিষ্ঠা-যুক্ত অবস্থায় থাকাতে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে, এখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বাভাবিক লাবণ্য আর অনেকটা বলের সঞ্চার হইয়াছে। তবে দুইপায়ের শিরা বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দাঁড়াইবার অবস্থা ছিল না। সমতল স্থানে হাতে ভর রাখিয়া কিছুদূর চলাচল করিতে পারিতেন। এই অবস্থায় যখন জানা গেল যে তিনি গর্ভবতী, তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল। কিন্তু চুণীবাবু বলিলেন, ভয় নাই, যে স্বভাবে (নেচারে) আসিয়াছে, সে নিরাপদে 'নেচারে' প্রসূত হইবে। ঈশ্বর-কৃপায় ১৩০১ সালের ১০ই মাঘ সরল নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইল। সেইদিন হইতে দোকানও বন্ধ হইয়া গেল।

সরলকুমারের জন্মদিনে একেবারে দোকান বন্ধ করিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে শিশুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইল। কারণ তাহার অশক্ত জননী তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্যদানে অক্ষম, সুতরাং আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইল—সময়ে সময়ে বিনয়ও করিত। এইভাবে চারমাস গত হইল। তার পর আমার পশ্চিম প্রদেশে গমনের কথা উঠিল।

বাবু বঙ্কুবিহারী বসু—চুণীবাবুর কোনো ভগ্নীর জামাতা বাবু বঙ্কবিহারী বসু আমাদের দোকানে অল্প-কিছু টাকা জমা (ধার) দিয়াছিলেন। অবশ্য দোকানবন্ধের পূর্ব্বে তাহা পরিশোধ করা হয়। এই সূত্রে প্রথমে বঙ্কবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল বাবু যদুনাথ মিত্র ছাপ্‌রায় ওকালতি করিতেন। ব্যবসায়ের দিকে বঙ্কবাবুর একটু টান থাকায় তিনি ছাপ্‌রা হইতে কিছু কিছু ঘৃত আনাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিতেন। কিন্তু সে-কাজের পরিমাণ-প্রসার সামান্য মাত্র। আমরাও বঙ্কবাবুর ঘৃত দুই-চার টিন লইয়া দোকানে বিক্রয় করিয়াছিলাম।

সেই সময় "রামকৃষ্ণরক্ষিত" ফারমের একজন পূর্ব্ব কর্ম্মচারী—যোগীন্দ্রনাথ দে সহসা আমার সহিত দেখা করিতে আসে। তাহার একটা মোকর্দ্দমার পরামর্শ লইবার সূত্রে বঙ্কুবাবুর সহিত যোগীন্দ্রর পরিচয় করিয়া দিয়াছিলাম। তৎপরে তাহারই উৎসাহ এবং পরামর্শে কাণপুরের নিকট কোঁচ নামক মোকামে ঘৃত খরিদের জন্য বঙ্কুবাবু তাহাকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠান। যোগীন্দ্র

কয়েকমাস মোকামের কার্য্য করিয়া তাহার মোকদ্দামার জন্য কাজ বন্ধ রাখিয়া এখানে চলিয়া আসে। তখন বঙ্কবাবু তাহাদ্বারা কাজের তেমন সুবিধা হইবে না মনে করিলেন। অথচ কাজটি তুলিয়া দিতে গেলে কিছু লোকসানও হয়; কিন্তু উপযুক্তভাবে চালাইতে পারিলে সুবিধার অবস্থাই ছিল।

চুণীবাবু এবং বঙ্কবাবুতে সেইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া, ঐ কার্য্যভার লইবার জন্য শেষে বঙ্কবাবু আমাকে অনুরোধ করেন। তখন আমারও সম্পূর্ণরূপে অর্থাভাব। কিন্তু বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ন্যায় কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার ইতস্তত ভাব বুঝিয়া বঙ্কবাবু যেন সুবিধাই মনে করিলেন। তিনি মাসিক বেতন দিবার দায়ীত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া, অথচ তাঁহারই নামে কাজটি যেমন চলিতেছে তেমনই চলে, বরং যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অংশ তিনি পাইবেন, অর্থাৎ আমার মাসিক সংসারখরচের জন্য বঙ্কবাবু এখানে আমার বাসায় নগত টাকা দিবার দায়ী থাকিবেন না। আমি মোকামে যেমন কাজ চালাইতে পারিব, মোকাম-খরচার ভিতর হইতে সেই পরিমাণ টাকা এখানে পাঠাইব, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

দোকানের ঋণমুক্ত—দোকান বন্ধ হইলে খরিদ্দার-গণের নিকট যে-টাকা পাওনা ছিল, তাহা ক্রমশ আদায় হইয়া-শেষে দোকানের সরঞ্জাম পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সংসারখরচ চলিতে লাগিল। কিন্তু বড়বাজারের ও অন্যান্য মহাজনের যে-দেনা ছিল, তাহা দিবার কোনো উপায় রহিল না। আমারই

নামে দোকানের দেনা-পাওনা চলিত সুতরাং দেনার দায়ী আমিই হইলাম। কিন্তু ইহার মধ্যেও ভগবানের বিশেষ করুণার প্রকাশ দেখা গেল।

রামকৃষ্ণ রক্ষিতের দোকান ব্যতীত আর কয়েকটি দেনার পরিমাণ সামান্য সামান্য ছিল। 'রামকৃষ্ণ রক্ষিত'-কোম্পানীর দেনা ৩০০৲ টাকার কিছু অধিক ছিল। কিন্তু শেষে জানিলাম, আমার অংশ বুঝিয়া লইবার পরে, পূর্ব্বের 'না-জাই লহনা' আদায় হইয়া আমার কিছু প্রাপ্য আছে, তাহার পরিমাণ কত তাহা হিসাব-পত্র দেখিয়া স্থির করিতে ফারমের স্বত্বাধিকারীগণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আমার এই দেনার দাবী পরিত্যাগ করিলেন। এই মীমাংসা যথেষ্ট জ্ঞান না করিয়া ততোধিক পাওনার দাবী করিতে আমার আর ইচ্ছা হইল না। কারণ ঐ না-জাই অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনা পরে আদায়ের মধ্যে তাহার অংশ পাইতে আইনত আমার দাবী ছিল না। কেন-না নিষ্পত্তিকালে আমি ফারখৎ লিখিয়া দিয়াছিলাম। তবু যে ধর্ম্মত তাঁহারা এই মীমাংসা করিয়া লইলেন, ইহাতেই আমি আনন্দিত হইলাম। অবশ্য এই মীমাংসা আরো কিছু পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন আর যে অল্প-স্বল্প দেনার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে যাঁহারা আমার নিতান্ত আত্মীয় ছিলেন, যেমন—বাবু জয়গোপাল পাল, রামতারণ রক্ষিত—তথা বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ এবং কাত্তিকচন্দ্র কুণ্ডু প্রভৃতি; ইহারা আমার অবস্থা বুঝিয়া এবং পাওনার পরিমাণ ক্ষুদ্র জানিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

আমার ত্রুটী ক্ষমা করিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার এক ময়দার দোকানদারেরও কিছু পাওনা ছিল। ব্যবসায়-কর্ম্মে এইরূপ তো ঘটেই, এই মনে করিয়া এবং পাওনার পরিমাণ অল্প বলিয়া তিনিও এই দাবীতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অশান্তি—পশ্চিম মোকামে যাইতে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে যখন কথা স্থির হইয়া গেল, তখন কি-রকম মনের অবস্থা লইয়া গেলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে। হঠাৎ মনে হইতে পারে আপাতত এখানকার অশান্তি হইতে তো দূরে যাইতে পারিলাম; কিন্তু আমার সে-রূপ মনে হয় নাই। বরং এই অসহায় বিশৃঙ্খল অশান্তির অবস্থায় অশান্তমনা ভগ্নী, বিকলাঙ্গী পত্নী, ছাত্র অবস্থার বালক-পুত্র, আর একটি একেবারেই শিশু, ইহাদের রাখিয়া দূর দেশে যাইতে চিত্ত আরো ব্যথিত হইয়া উঠিল। এ অবস্থাতে একান্তমনে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই গমনে প্রস্তুত হইলাম।

যে-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঠাকুরা ব্রহ্মমন্দির হইতে কলিকাতায় আসিয়া সংসার পাতা এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য মুদীখানা দোকান করা হইল, ঠিক সে-স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মভাব রক্ষা পাইল না, কার্য্যত সত্যনিষ্ঠাও বহুপরিমাণে ভাঙিয়া গেল। অবশ্য ইহা অবস্থা-চক্রে পড়িয়াই হইল। তজ্জন্য দাসের অন্তঃকরণে আঘাত লাগায় চিত্তের প্রসন্নতা চলিয়া গেল।

দোকান-পত্তনের পরেই এই মনোকষ্টের সূচনা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দোকান-বন্ধের পরেও এই অশান্তি ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষুদ্র সংসারটির মধ্যেও শান্তি ছিল

না। কারণ যে-আদর্শে সংসার করার ইচ্ছা ছিল, সংসারের সাহায্যকারিণী ভগ্নীটি সেভাবে গড়ে নাই। এখন ইচ্ছা করিলেই সে-আদর্শে সংসার গড়িবে কেন? তার উপর নূতন অবস্থার পরীক্ষা, সুতরাং প্রাণের ভিতরটা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বদা অশান্তির আঘাত পাইতে লাগিলাম। কিন্তু সান্ত্বনার একমাত্র উপায় ছিল কেবল ভগবানের করুণা; তাঁহার স্মরণ-মনন কোনোদিন ভুলিতে পারি নাই।

ও-দিকে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধব—বিশেষত ক্ষেত্রবাবু এবং কান্তিবাবু আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই অনুমান সত্য হইল দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা বিরক্ত বা দুঃখিত হইয়াছিলেন।

সেই সময়ের কথা লইয়া পরবর্ত্তী সময়ে বিনয়ের সহিত আমার আলোচনা হয়, তাহাতে সে বলে, "নন্দরাম সেনের গলিতে বাসা ও দোকান না করিয়া কান্তিবাবুর পরামর্শমতো পটলডাঙ্গা অঞ্চলে বাসা ও দোকান করিলে ঘটনা এরূপ হইত না।" একথা একপক্ষে সত্য বটে, কিন্তু মানবজীবনের গূঢ়-রহস্যে একটির সঙ্গে অন্য ঘটনাটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়! যখন দেখি এই গুরুতর পরীক্ষায় না পড়িলে আমার পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্যে শক্তির বিকাশ হইতে পারিত না, তখন সহজেই সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। জীবনদাতা বিধাতার সঙ্গে সংযুক্তভাবে এ-জীবন দর্শন করিতে পারিলে সকল ক্ষতিরই পূরণ হইয়া যায়। কোনো

অভিযোগ অবিশ্বাসও থাকে না। সকল অবস্থায় মঙ্গলময়ের কৃপা-হস্ত দেখিয়া জীবন ধন্য হয়, নতুবা জীবন, জগত সংসার সকলই প্রেহেলিকা—অন্ধকারময়।

বিনয়ের ঐ কথায় কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে, নন্দরাম সেনের গলিতে থাকিয়া তাহার বাল্যজীবনের ক্ষতি হইয়াছে। সরল শান্ত বালক, সাধু ভক্তের সৎসংসর্গে থাকিয়া যেরূপভাবে গঠিত হইতেছিল, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে দৃঢ়তালাভ করিতে পারিল না। এ ত্রুটির জন্য আমাকেও পরিণামে ফলভোগ করিতে হইল। তবুও অল্পকাল সাধুসঙ্গের ফলে তাহার জীবন যেটুকু সুগঠিত হইয়াছিল তাহাতেই আশ্বস্ত হইয়া, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ বিধাতার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

শিশুর পালন এবং তাহাকে ছাড়িয়া আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরদেশে যাইতেছি বলিয়া বিদায়কালে আমার অক্ষম পত্নী তেমন কোনো আপত্তি করেন নাই। বরং অনেকটা প্রসন্নমনেই বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু গমনের দুই-তিনদিন পূর্ব্ব হইতে আমাকে বার বার আহ্বান করিয়া এক-একটি সামান্য এ-কথা সে-কথার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামান্য সামান্য জিনিস কিনিয়া দিতে বার বার বলার দ্বারা যেন কেমন একটা অস্পষ্ট অজ্ঞাত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পরে বুঝিয়াছিলাম, সেগুলি তাঁহার ইহলোকের চির-বিদায়ের ভাবাত্মক। অবশ্য তাহা আমরা উভয়েই তখন বুঝি নাই যে, ইহাই আমাদের ইহলোকের শেষ দেখা-শুনা।

কবিরাজ বন্ধু—বড় অশান্তির সময় একটি বন্ধু পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম ললিতচন্দ্র সেন গুপ্ত। তিনি আমাদের বাসার নিকটেই ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি আমাদের দোকানের সাইন বোর্ডখানি খরিদ করিতে আসা সূত্রে আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। এবং সহজেই ঐ-পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে পরিণত হইয়াছিল।

কবিরাজ মহাশয়ের বাসা তখন আমার পক্ষে একটি শান্তির স্থান হইয়াছিল। এখানে যে-কয়েকটি ভদ্রলোক সর্ব্বদা আসিতেন, বসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে এবং প্রধানত কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কেবল সৎপ্রসঙ্গই হইত। সকলেই তাহা শুনিতে ভালোবাসিতেন। তাহাতে অনেক সময় আমারও মনের চেতনা-বোধ জাগ্রত হইয়া অশান্তি অনেক দুরীভূত হইত।

কবিরাজ মহাশয়ের সহিত প্রাণের সদ্ভাব চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি আমার জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ এবং উত্থান-পতনের সাক্ষী।

ডাক্তার শ্যামলাল বসু—এখানে আর একটি উপকারী বন্ধুর (তিনি এখন পরলোকে) উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। তিনি তত্রস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাবু শ্যামলাল বসু।

সরলকুমার যে-অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাহাতে অনেক কষ্টে-সৃষ্টে তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। তাহার মাতৃস্তন্য যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রসূতির অশক্তাবস্থা

বশত নিয়মিত স্তন্যদানে অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। এ অবস্থায় গো-দুগ্ধই পান করাইতে হইত। কিন্তু সেইসময় ডাক্তার বসু মহাশয় শিশুকে কলিকাতার গো-দুগ্ধ পান করাইতে একেবারেই নিষেধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে উত্তম বালি প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াইতে বলেন, এবং তাহার উপকারীতা বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়া আমাদের মন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলই হইয়াছিল, এবং অবিশুদ্ধ দুগ্ধের ব্যয়ভার হইতে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম।

পশ্চিম মোকামে দুই বৎসর—১৩০২ সালের আষাঢ় মাসের শেষভাগে আমি ঘৃত খরিদের কার্য্যে পশ্চিম মোকামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু আমার যাত্রার সময়ে বঙ্কবাবু বলিলেন, চলুন আমিও একটু বেড়াইয়া আসি। তাহাতে আমার খুব সুবিধা এবং আনন্দ বোধ হইল।

আমরা উভয়ে যাত্রা করিয়া প্রথমে কোঁচ মোকামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলিকাতায় আমার বাসার তত্ত্বাবধানের ভার চুণীবাবুর উপর রহিল। বিনয় তখন থার্ড কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে।

কোঁচ মোকামে বড়বাজার এবং হাটখোলার বড় ধনীদিগের খরিদ থাকায় প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম যে; আমাদের ক্ষুদ্র কাজের পক্ষে প্রতিযোগীতায় এখানে সুবিধা হইবে না। এজন্য এখানে কয়েকদিন থাকিয়া সুবিধাজনক কোনো নূতন স্থানের অনুসন্ধানে আমরা ঝান্সী হইয়া বড়সাগর পর্য্যন্ত। গেলাম কিন্তু ঐ-সকল স্থানের ঘৃত বোম্বাই অঞ্চলেই চালান যায়; উহা

কলিকাতার পড়তায় আসে না, সুতরাং আমরা কয়েকদিন ঘুরিয়া পুনরায় কোঁচে ফিরিয়া আসিলাম।

বঙ্কুবাবু অর্থপিপাসু সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রমনা ছিলেন না, তিনি উদারহৃদয় প্রেমিক, সরলচিত্ত ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি। প্রথমেই তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। আমরা এই কয়েকদিন ঘুরিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া কর্ম্মসম্বন্ধে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তাহাতে তাহার অপ্রসন্ন ভাব দেখা গেল না। ভ্রমণের আনন্দেই তাঁহার মুখে হাসি বর্ত্তমান ছিল। পথে যখন আমাদের কোনো অসুবিধা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি তখন একটু হাসিতেন।

অতঃপর যখন আমরা কলিকাতায় ফিরিবার কথাই ভাবিতে-ছিলাম, তখন এটোয়া জেলার অন্তর্গত অরেয়া নামক একটি মোকামের সন্ধান পাইয়া কোঁচ মোকামের সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া আমি তথায় গেলাম। গিয়াই বুঝিলাম এখানে খরিদের বেশ সুবিধা আছে সুতরাং ওখানেই কাজের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। তখন ওখানে বাঙালীর মধ্যে কেবল বাবু পার্ব্বতীচরণ আশের খরিদ ছিল। তাঁহার গোমস্তা নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়—ইতিপূর্ব্বে বড়বাজারে আমাদের দোকানে কিছুদিন কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল। সেই অনুগত যুবকটিকে পাইয়া আমি এ-কাজের অনেক সন্ধান পাইলাম। বঙ্কুবাবু কোঁচ মোকা-মের কাজ বন্ধ রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

সে বৎসর ঘৃত খরিদের কাজে সম্ভবত ছয়-সাতশত টাকা লাভ হইয়াছিল। বিক্রয়ের হিসাব কলিকাতায় বঙ্কুবাবুর

নিকট থাকিলেও, আমার নিকট খরিদের হিসাব এবং কলিকাতার আড়দ্দারের পত্রে বিক্রয়ের দর যাহা পাইয়াছিলাম তাহাতে এবং এখানে আড়দ্দারের হিসাবে জমার বৃদ্ধি দৃষ্টে ঐরূপ বুঝিয়াছিলাম।

মোকাম হইতে মাসিক ৩৫৲। ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিয়াও চারশত টাকার কিছু বেশী আমার প্রাপ্য হইয়াছিল। বঙ্কবাবুর সহিত আমার ঠিক সাংসারিকভাবে অর্থের সম্বন্ধ ছিল না। এজন্য দেনা-পাওনা লইয়া আমাদের কোনো গোলযোগ ঘটে নাই।

বৎসরান্তে ১৩০৩ সালের বৈশাখমাসে আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। ইহার আগের আশ্বিনমাসে অরেয়াতেই আমি আমার স্ত্রী-বিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বিনয় চুণীবাবুর নির্দ্দেশমতে একমাস অশৌচ ধারণ করিয়া, গঙ্গাতীরে পিণ্ডদান এবং কয়েকটি ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছিল। চুণীবাবু এ-সম্বন্ধে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

কলিকাতায় আসিয়া দেখি, শিশু-পুত্রটিকে ত্রৈলোক্য কষ্টে-সৃষ্টে প্রতিপালন করিতেছে এবং সে সুস্থ আছে। বিনয়ের পড়া-শুনা চলিতেছে। কিন্তু তখন মনে হইল ইহাদিগকে ফেলিয়া আর পশ্চিম মোকামে যাইব না। তথাপি বড়বাজারের আড়দ্দার এবং বঙ্কুবাবুর আগ্রহ-উৎসাহে—অধিকন্তু চুণীবাবুরও ইচ্ছা জানিয়া পুনরায় আষাঢ় মাসের শেষে মোকামে গেলাম।

সে বৎসর কাজে অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। পৌষ মাসে

খরিদের মুখেই ঘৃতের দর ক্রমাগত কম হইতে হইতে মণ প্রতি ১১৲ টাকা কমিয়া গেল। আমার হাতে অগ্রহায়ণ মাসের খরিদা ২০০৴ মণ ঘৃত আটকাইয়া প্রায় চৌদ্দশত টাকা লোকসানের সম্ভাবনায় দাঁড়াইল। সুতরাং আড়দ্দার অন্তত একহাজার টাকা ডিপজিট চাহিল। তজ্জন্য বঙ্কুবাবুকে সমস্ত লিখিলাম। কিন্তু তিনি তাহার কোনো উপায় করিতে পারিলেন না। তখন সমস্ত দায়ীত্ব আমার স্কন্ধে পতিত হইল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অভাবনীয়রূপে আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম। তাহা পরে বলিতেছি।

প্রথম বৎসরে এক বড় ধনী আড়দ্দারের ঘরে ব্যাপারী হইয়া কাজের সুবিধা হয় নাই, তজ্জন্য দ্বিতীয় বৎসরে নূতন আড়দ্দারের চেষ্টা করি। এক আড়দ্দারের ভাগিনেয় অযোধ্যাপ্রসাদের সহিত আমার প্রথম বৎসরে কিছু বন্ধুতা হয়। সেই সূত্রে এবং অযোধ্যাপ্রসাদের আগ্রহে তাহাদের ঘরেই এ বৎসর আমি ব্যাপারী হইয়ছিলাম। তিনি ঐ কারবারের কিছু অংশীদারও ছিলেন। লাভের আশায় কাজ করিয়া লোকসানের সম্ভাবনা দেখিলে বিষয়ী লোকের মন স্থির থাকা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য করুণা, - যখন আমি ডিপজিটের টাকা আনাইতে পারিলাম না, তখন অযোধ্যাপ্রসাদকে আমার অবস্থার কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলাম এবং শেষে ইহাও স্বীকার করিলাম যে, যতদিন ঘৃতের বাজার না উঠিবে ততদিন আমি এখানে পড়িয়া থাকিব। ইহার কোনো প্রতিবিধান না করিয়া আমি এথান হইতে যাইব না। অযোধ্যাপ্রসাদ কেন-

যে আমার কথায় মাত্র বিশ্বাস করিয়া এত টাকা ক্ষতির আশঙ্কা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, ইহা ভগবানের করুণা ভিন্ন আর কি বলিব। এমন-কি তাঁহার মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় গোপনে কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "বাবু পলাইয়া যাইবে।" তাহার উত্তরে অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি বলিয়াছিলেন, "বাবুর লোকসানের টাকা আমি নিজ হইতে দিয়া ধনীর ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব।" অযোধ্যাপ্রসাদের এই উচ্চান্তঃকরণ এবং বন্ধুতার কথা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

যখন খরিদ বন্ধ করিয়া অতি সামান্যভাবে দিন কাটাইতে লাগিলাম, তখনও অযোধ্যাপ্রসাদ বন্ধুর ন্যায় আমাকে আশ্বস্ত করিয়া আমার সন্তোষ বিধান করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু কাজ বন্ধ থাকায় কলিকাতার বাসা-খরচ পাঠাইবার কোনো উপায় রহিল না, এজন্য বাসায় তাহাদের যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা ভাবিয়া আমার অন্নজল গ্রহণ ক্লেশকর হইল। এইরূপে প্রায় তিনমাস গত হইল। তারপর ঘৃতের দর দেড়মাসের মধ্যে মণকরা দশটাকা বৃদ্ধি পাইল, তখন মজুত ঘৃত মোকামেই আড়দ্দারের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহাতে তাঁহাদের দেনা পরিশোধ হইল। তারপর ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

বন্ধুতার বন্ধন মুক্ত—দ্বিতীয়বারে চুণীবাবুরও সম্পূর্ণ মত ছিল বলিয়াই আমি মোকামে আসি। মোকামে আসিয়া যেরূপ বিপদ-জালে জড়িত হইয়া পড়ি, তাহাও তিনি পর পর আমার পত্রে সমস্ত অবগত ছিলেন।

কিন্তু যখন অর্থাভাবে সংসারে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইল, তখন তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিবার সংবাদ জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলেই আসিতে পারি না—অথবা কোনোরূপে গোপনভাবে আসাও যে কতদূর ঘৃণা তাহা তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেন যে আমাকে ফিরিয়া আসিতে এমন তাগিদ দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

চুণীবাবুর নিকট কখনো অর্থসাহায্যের আশা করা হয় নাই, প্রথমেই সেকথা বলিয়াছি। তবে অনাটনের সময়ে যেরূপেই হউক তাঁহার পরামর্শে বা বল-ভরসায় দিন কাটিয়াছে। আমিও সেইভাবেই তাঁহার উপর নির্ভর করিতাম। কিন্তু এইসময় তিনি যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্তত আমার যতদূর মনে হয়, তাহাতে তিনি এখন যেন সে-ভারটুকুও বহন করিতে অশক্ত। এখন আমি আমার সংসারের ভার গ্রহণ করি—যেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

তারপর তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে এবং আমার সংসারের মধ্যে যতদূর কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমার পক্ষে গুরুতর বোধ হইয়াছিল। তথাপি বন্ধুতা ছেদন করিতে পারি নাই, ইহাতে যে নিজের মধ্যে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতাম না। এমন সময় সহজেই সকল জটিলতা কাটিয়া গেল। বিধাতার ভেল্কী খেলা দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

প্রথমবারে কলিকাতায় আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে চূণীবাবুর বাড়ি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। এবারেও সেইরূপ করিলাম। কিন্তু এবার তিনি প্রথম আলাপের পরই বিরক্তভাবে আমাকে বলিলেন, "আপনি কার হুকুমে মোকামে ঘৃত বিক্রয় করিয়া আসিলেন ? "যান্ আপনার সঙ্গে আমাদের পোষাইবে না, আপনি কাহারো অধীনে (কনট্রোলে) চলিবার লোক নহেন। আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য (ইন্‌ডিভিজুয়ালিটী) আছে; আপনি আপনার পথ দেখুন।" বাস্তবিক ইহা আমার নিকট "দৈববাণী" তুল্য হইল। পরদিনই বাসা বদল করিয়া চূণীবাবুর বন্ধুতার বন্ধনমুক্ত হইলাম।

ইহার দুইদিন পরে চূণীবাবু আমার নূতন বাসার সম্মুখে আসিয়া আবার আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার আর সে-ইচ্ছা হইল না। তিনিও আর চেষ্টা করেন নাই।

দুর্ব্বলতার কথা—পশ্চিম মোকামে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম, তদ্ব্যতীত গুরুতর কথা—আমার দুর্ব্বলতা—পাপ প্রলোভনে পতনের কথা আছে; কিন্তু তাহার মধ্যেও আশ্চর্য্যরূপে সেই কৃপা-হস্ত দ্বারাই এ-জীবন রক্ষা পাইয়াছে। সেই কৃপার কথা যেমন গোপন করিতে পারি না, তেমনই সেই পাপ দুর্ব্বলতার কথাও স্বীকার করিব।

আমি বিশ্বাস করি, দাসের আত্মকথার মধ্যে যদি বিধাতার কোনো আশীর্ব্বাদ থাকে এবং তদ্দ্বারা অন্যের জীবনের কোনো কল্যাণ সাধিত হয়, তবে তাহা সত্যেই সিদ্ধ হইবে।

যদি কোনোরূপে জ্ঞাতসারে সত্য গোপন করি, তবে তজ্জন্য নিশ্চয়ই অপরাধী হইব।

অরেয়া মোকামে কাজ আরম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই--- সাধারণত এখানকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, পরিবার পরিজন ছাড়িয়া অল্পশিক্ষিত ব্যবসায়ী বাঙালীর পক্ষে এ-প্রদেশ কি প্রলোভনের স্থান। এখানে অবস্থান করিয়া চরিত্র ভালো রাখা কঠিন। কেমন একটা নিরঙ্কুশ ভাব জাগিয়া উঠে। ঘটনাক্রমে আমার সম্মুখেও সেইরূপ এক প্রলোভন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রথমে তাহা কুপ্রবৃত্তির আকারে আসে নাই।

পশ্চিম মোকামে আসিবার পূর্ব্বেও আমার মনে সাংসারিক অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাব বোধ জাগিতেছিল। সে অভাবের স্বরূপ এখানে এইভাবে প্রকট হইল যে, বিকলাঙ্গী পত্নীর সেবা এবং সাংসারিক কার্য্যে সাহায্যের জন্য এদেশ হইতে যদি একটি কর্ম্মঠ ভালো শ্রেণীর স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পারি তাহাতে দোষ কি? কারণ এ-দেশে সাধারণত স্ত্রীলোকের অবস্থা যেরূপ শিথিল, বিশেষত দরিদ্র অসহায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অনেক। তাহাতে ইহা অসম্ভব বোধ হয় নাই। ক্রমে অবস্থা এমনই অনুকূল হইল যে, মনের গূঢ় কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল—বাসার 'কাহার'-ভৃত্যগণ এ-পথের সহায়। শেষে ঘটনা এবং অবস্থা এমনই হইল যে, তাহাকে বাসার কাজ কর্ম্মে রাখিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার মধ্যে তাহা হইতে চিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া

পড়িল। মানব-অন্তর যখন প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, তখন বুঝি এমনই হয়, সে যে কোথায় যাইতেছে তাহা আর তাহার মনে থাকে না। এইরূপেই সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ-অবস্থায়ও সৎপ্রসঙ্গ করিবার উৎসাহ এবং শক্তি আমার কিছু মাত্র কমে নাই। এবং লোকের অশ্রদ্ধা ও অপ্রীতিভাজনও হই নাই; ধর্ম্মভাবের সঙ্গে কিরূপে যে এই নীতিহীনতার স্থান হইয়াছিল তাহা ভাবিলে এখনো অবাক্ হইয়া যাই, কিন্তু বিধাতার অপার করুণার কথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে এইকার্য্যে জড়িত হইবার পূর্ব্বেই বুঝিলাম, এই সঙ্কল্প আমার কত অসার ঘৃণিত এবং বিপজ্জনক। তখন এজন্য আমাকে আর বেশী কিছুই করিতে হইল না, অপর পক্ষের একটি ঘটনাতেই এই মোহজাল হইতে মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার শক্তিতে নয়—একমাত্র দয়াময়ের অপার কৃপাতেই! ধন্য তাঁহার করুণা।

বৈরাগী সেবক দয়াশঙ্কর—আমার প্রবাস-কালের শেষভাগে আর একটি উল্লেখযোগ্য সৎসঙ্গলাভের কথা আছে।

শেষ বৎসরে যখন আমি দেনার দায়ে অপ্রসন্নচিত্তে অবস্থান করিতেছিলাম, সেইসময় ঐ-দেশীয় একটি গরীব ব্রাহ্মণ—নাম দয়াশঙ্কর, আমাকে দৈনিক কিঞ্চিৎ দুগ্ধ যোগান দিতে আসিয়া কিছুক্ষণ আমার নিকটে বসিত। এইসূত্রে তাহার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হয়। ওখানে গরীব ব্রাহ্মণরাও চাষকার্য্য এবং দুধ বিক্রয় করে এবং গোরুর-গাড়ী চালায়। দয়াশঙ্করের একখানি গোরুর গাড়ী ছিল।

তাহার মজুরী হইতে তাহার দৈনিক জীবিকা—পরিবারের ভরণপোষণ চলিত। দিনে কর্ম্ম করিয়া গৃহে আহার্য্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিয়া সন্ধ্যার পর বাহির হইত। এবং খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করিয়া গৃহে গিয়া দিনান্তে একবার যাহা-কিছু থাকিত তাহা আহার করিয়া নিদ্রা যাইত। এইভাবে সে দিন-মজুরী করিয়া জীবনযাপন করিত। কিন্তু প্রাণের ভিতর ঈশ্বরপ্রেম এবং বৈরাগ্যের সুন্দর ভাবটুকু ছিল। দয়াশঙ্কর যেন ভগবানের দূতরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার প্রাণের অশান্তি চলিয়া যাইত। দয়াশঙ্কর বিশ্বাসী প্রেমিক লোক, তাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিয়া খুব আরাম পাইতাম।

শেষ সময়ে বঙ্কুবাবু আমাকে কোঁচ মোকামের হিসাব পত্র নিকাশ করিয়া আসিতে লিখিয়া পাঠান। কোঁচে আমি রেলপথে গেলেও পারিতাম, কিন্তু দয়াশঙ্কর বলে, "বাবু চলুন, আমার গাড়ীতে গ্রাম্যপথে লইয়া যাইব, তাহাতে আপনার কোনো কষ্ট বা অধিক খরচ হইবে না, অথচ আমারও একবার কোঁচে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, আপনার সঙ্গে আনন্দেই যাইব।" আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। পথে তাহার সেবার পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম, দয়াশঙ্কর একজন শিক্ষিত সেবক। অর্থাৎ যিনি যথার্থ প্রেমিক ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহাকে সেবাপরায়ণ হইতেই হয়। ভক্ত বিশ্বাসী ভিন্ন প্রকৃতরূপে জীবের সেবা কেহই করিতে পারে না।

পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে দয়াশঙ্করের মুখে ধর্ম্ম বিষয়ে গল্প শুনিতে শুনিতে অল্পে অল্পে গমন, খুবই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। দয়াশঙ্কর অফুরন্ত গল্প জানিত। যথাসময়ে দুইবেলা আহার্য্য প্রস্তুত, গো-সেবা, নিজের স্নানাহার এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করিত যে, পথে চলিয়াছি কি ঘরেই আছি যেন বুঝা যাইত না। সে-সময় আমার সঙ্গে বালকপুত্রসহ একটি আধ-পাগলা বৃদ্ধ ভৃত্যও ছিল। পথে আমাদের অন্ন-জলের কোনো অভাবই ঘটে নাই।

পরে জানিতে পারি যে, দয়াশঙ্করের বালকাবস্থায় তাহার পিতা গৃহত্যাগ করিয়া সাধু হইয়া যান। পরে দয়াশঙ্কর পিতৃ-অন্বেষণে তিনবার বহির্গত হইয়া অনেক দেশভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ করে তাহার ফলে এইরূপ সাধুভাব এবং বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিল। দয়াশঙ্কর গৃহী হইয়াও বৈরাগী ছিল। তাহার সেই ভাব আমার প্রাণে চিরদিন জাগিতেছে।

পৈতৃক অর্থপ্রাপ্তি—যাঁহার কৃপায় আজ বন্ধুতার বন্ধন-জাল কাটিয়া আবার স্বাধীনভাবে স্বপদে দাঁড়াইতে পারিলাম, সর্ব্বাগ্রে সেই করুণাময়ের চরণে মস্তক অবনত হইল। নূতন বাসার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া প্রথম চিন্তা হইল কি উপায়ে অর্থাভাব দূর করা যায়। পশ্চিম মোকাম হইতে বাসা খরচের জন্য তিন-চার মাস পর্য্যন্ত কিছুই পাঠাইতে পারি নাই। যদিও প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিদেশী-পরমবন্ধু অযোধ্যাপ্রসাদের সহৃদয়তায় আমাকে একেবারে রিক্তহস্তে আসিতে হয় নাই, কিন্তু তাঁহার

প্রদত্ত পঁয়ত্রিশটি টাকায় এ-অভাবের কতটুকু পূরণ হইতে পারে ? তাই বুঝি বিধাতা আর একটি ব্যবস্থা করিলেন।

আমার পিতার অগ্রজদ্বয় পিতামহ বর্ত্তমানে অপুত্রক অবস্থায় পর পর মারা যাওয়াতে পিতামহ অন্তে পিতাই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে পিতামহ পিতার প্রতি বিধবা পুত্রবধূদ্বয়ের মাসহারা প্রদানের অনুজ্ঞা-পত্র লিখিয়া যান। তদনুসারে বড় জ্যাঠাইমাতা মাসিক কুড়িটাকা করিয়া পাইতেন। মধ্যম জ্যাঠাইমাতা অল্পদিনের মধ্যে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। কালক্রমে যখন পিতার হস্ত হইতে মূল সম্পত্তি নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়া আসিল, তখন বড়জ্যাঠাইমাতা তাঁহার মাসহারা পাইবার উপযোগী সম্পত্তি ডিপজিট্ রাখিবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। তদনুসারে পিতা পাঁচহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আমানত রাখেন। তাহার স্তদ জ্যাঠাইমাতা পাইয়া আসিতেছিলেন।

আমার প্রথমবৎসর অরেয়া মোকামে অবস্থিতিকালে বড় জ্যাঠাইমাতার মৃত্যু হয়। ভ্রাতা উপেন্দ্র তৎসংবাদ সহ আমাকে শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া টাকাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে পত্র লেখে। আমি যথাসময়ে কলিকাতায় আসিলে তৃতীয় ভ্রাতৃবধূ ও তাঁহার নাবালক পুত্র এবং চতুর্থ ভ্রাতৃবধূ সহ আমাদের মধ্যে চার অংশে ঐ-অর্থের বিভাগ সম্বন্ধে উপেন্দ্র অন্যায় প্রস্তাব করে, তজ্জন্য কোনো মীমাংসা না হওয়ায় আমি দ্বিতীয়বার মোকামে যাই। এক্ষণে সেই অর্থে যেমন আমার, তদ্রূপ ভ্রাতারও প্রয়োজন হওয়ায় উপেন্দ্র অন্যায় প্রস্তাব ছাড়িয়া দিল।

তাহাতে সহজে সমস্ত মীমাংসা হইয়া আমরা দুইভ্রাতা ও তৃতীয় ভ্রাতৃবধূ—তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র ও চতুর্থ বধূ সহ সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া পাঁচহাজার টাকা চারিঅংশে বিভাগ অনুসারে সাড়েবারোশত টাকা আমি প্রাপ্ত হইলাম। এই অর্থ বিভাগ সম্বন্ধে ভ্রাতৃবধূ এবং নাবালক ভ্রাতুস্পুত্রের দিক হইতে যে কোনো গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ঐ উভয়পক্ষে বাবু কালীপ্রসন্ন রক্ষিত অর্থাৎ তৃতীয় বধূর মধ্যমাগ্রজ এবং কনিষ্ঠ বধূর মাতুল মধ্যবর্ত্তী থাকায় কোনোই গোলযোগ ঘটে নাই। এখানে ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন রক্ষিত সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তাহা পরে বলিতেছি। দাসের জীবনে বিধাতার এইসকল অপার কৃপার কথা বলিতে বলিতে কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছে। ধন্য মা আনন্দময়ী, দীন সন্তানের প্রতি তোমার এত কৃপা! তাই বুঝি ভক্ত গাইলেন,—

"কত ভালোবাস গো মা মানব-সন্তানে,
মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দুনয়নে! (গো মা)
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,
লইনু স্মরণ মা গো, তব শ্রীচরণে।"

সোদরপ্রতিম কালীপ্রসন্ন রক্ষিত—ইনি বরাহনগর-নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। বরাহনগরে তাম্বুলীশ্রেণীর মধ্যে রক্ষিত মহাশয় খ্যাতনামা

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। বড়বাজারে তাঁহার চিনির কারবার এবং হাটখোলায় ঘৃতের আড়তের একসময় বেশ উন্নতি হইয়াছিল। বরাহনগরে অট্টালিকা, বাগান, পুষ্করিণী জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি সহ—বহু পুত্র-পরিবার-বেষ্টিত হইয়া তিনি ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষাবস্থায়—বিশেষত তিরোধানের পরে অবস্থান্তর ঘটিল।

কালীপ্রসন্ন ভায়া এই অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত পালিত এবং অবস্থানুযায়ী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি কিশোর বয়স্ক, তখন একদা সহসা তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদনা বা ভাবাবেশ হয়। যদিও সে-ভাব অল্পদিন থাকিয়া ক্রমে প্রশমিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই হইতে একটি স্থায়ী ধর্ম্মভাব তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইতে থাকে। তারপর ক্রমশ সৎসঙ্গ এবং সাধন-ভজন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বিষয়-কর্ম্ম এবং সংসার-ধর্ম্মপথে নানা পরীক্ষা-বিপদ অতিক্রম করিয়া এখন সেই ধর্ম্মবিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের অনুগামী সন্ন্যাসীদিগের নিকট কালীপ্রসন্ন ভায়া বিশেষ পরিচিত এবং প্রিয়পাত্র।

ভ্রাতা কালীপ্রসন্নের ধর্ম্মভাব ব্যতীত স্বজাতি এবং স্বদেশ-প্রীতিও দেখা যায়। বাবু ভূতনাথ পাল মহাশয়ের অভাবে তাঁহার আরব্ধ তাম্বুলীসমাজের কার্য্যে, তাহার উন্নতিকল্পে যে-কয়েক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও কেহ-কেহ পরলোক গমন করিয়াছেন, অবশিষ্ট এখনো যাঁহারা কাজ

করিতেছেন তন্মধ্যে ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন একজন। ঐ-কাজে তাহাকে স্বার্থত্যাগ এবং পরিশ্রম করিতে উৎসাহী দেখা যায়।

ভ্রাতা এখন প্রায় ষষ্ঠীতমবর্ষের সোপানে পদার্পণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি বিয়োগ-বিচ্ছেদে আন্তরিক বৈরাগ্যানল প্রচ্ছন্ন



ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন

রাখিয়া ধীরভাবে প্রসন্নাননে বিশ্বাসী সাধকের মতোই মঙ্গলময়ের বিধি-বিধান পালন করিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহার মধ্যবয়সের ফোটো হইতে একখানি অর্দ্ধাবয়বের চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

শেষকথা

দাসের আত্মকথা যতদূর বলিবার সংকল্প ছিল, তাহা সমস্তই বলা হইল। নিজ জীবনের পাপ-দুর্ব্বলতার কথা সত্যভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সংযোগসূত্রে অন্যের হীনতা প্রকাশ করিতে দাসের অধিকার নাই; সুতরাং তদ্রূপ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জন্ম, এবং প্রধানত গুরুমহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া, বারোবৎসর বয়সে পৈতৃক সম্পত্তির অভাবে জ্যাঠামহাশয়ের দোকানে কর্ম্মশিক্ষা ও চাকরী হিসাবে সাতবৎসর কার্য্য করিয়া তারপর রামকৃষ্ণ রক্ষিত-ফারমের অংশীদার হওয়ায় যখন ধনাগমের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিতেছিল, যৌবনের সেই উদ্যমপূর্ণ চতুর্ব্বিংশতিবৎসর বয়সে কি-সূত্রে কোন্ ভাবের উদয় হইয়া বিষয়-বিরাগ উপস্থিত হইল, এবং কোন্ পথে কি-প্রকার ধর্ম্মাদর্শে বিশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া তাহার সাধন-পথে অনুকূল অবস্থা পাইয়া পর পর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলাম এবং তাহা বলিবার জন্য যে ভাবের প্রেরণা আসিয়াছিল ঠিক সেই ভাবে একে একে সমস্তই বলিয়াছি। তারপর সাধনক্ষেত্র থাঁটুরা-ব্রহ্মমন্দির হইতে কলিকাতায় আসিয়া যে-অবস্থায় আবার নূতন পরীক্ষার মধ্যে পড়িলাম, অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যেখানে ত্রুটি-দুর্ব্বলতা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের হীনতা ঘটিয়াছিল তাহাও বলিলাম। কিন্তু যেরূপ অবস্থায় পড়িলে অন্তরের ধর্ম্মাগ্নি একেবারে

নির্ব্বাপিত হইবার কথা, তেমন অবস্থায় পড়িয়াও কোন্ কৃপা-হস্ত দ্বারা এ-জীবন রক্ষা পাইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আজ কৃতজ্ঞতাতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

দাসের জীবন আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিধাতার কৃপায় পরিপূর্ণ। আমার জন্মভূমি দেশবাসী বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সেই করুণার সাক্ষ্যদান করিতে প্রথম হইতেই দাসের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। এই দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসরাধিক-কাল তাহার জন্য বিবিধ প্রণালীর ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এবং সেই ঘনীভূত শক্তির সাক্ষাৎ প্রেরণাতেই "দাসের আত্মকথা" গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, এই গ্রন্থ দাসের সম্পূর্ণ জীবন-চরিত নহে। ইহা একটি মৌলিকভাবের প্রকাশ মাত্র। পতিতপাবন অধমতারণ কৃপাময় বিধাতা যে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পতিতোদ্ধার-কাহিনী প্রকট করিলেন, তাঁহার সে-ইচ্ছার জয় হইবেই।

অতঃপর এ-গ্রন্থ-আর দীর্ঘ করিতে পারিলাম না। দশবৎসর "কুশদহ" মাসিক পত্র প্রচার, চার-পাঁচ বৎসর "কুশদহ-সমিতি"র কার্য্য, তারপরে পাঁচ বৎসর ভ্রমণান্তে "দাসের পত্র" "দাসের ভ্রমণ-পথের প্রসঙ্গ" "দাসের তীর্থ-পথের প্রসঙ্গ" প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক ঘটনা এবং ভাবের আভাস রহিল। এক্ষণে একটি অবশিষ্ট কথা পরিশিষ্টে বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিলাম।

পরিশিষ্ট

ধর্ম্মপ্রচারকের আদর্শে দাসের জীবন গঠিত হওয়া বিধাতার বিধান। সে-ধর্ম্মবিশ্বাস এবং তাহার নব-আদর্শ প্রদর্শন জন্য তৎপ্রেরণাশক্তি হইতে দাসের আত্মকথা প্রকাশিত হইল। যদিও মহাত্মা বুদ্ধের গৃহত্যাগ দর্শন করিয়া—বৈরাগ্যের পথে সন্ন্যাসীর ন্যায় দাসের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ, তথাপি দাস 'গৃহস্থ-বৈরাগী'।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত আদর্শে উপাসনা-উপদেশের ভিতর হইতে "সুখী পরিবার" গঠনের বাণী, এবং পারিবারিক জীবনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত যেসময় দাসের দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইল, তদনন্তর সেই আদর্শ-পথে আকৃষ্ট হইলাম। এ-আকর্ষণ নিজ অন্তরের মৌলিক ভাবের অনুকূলেই অনুভব করিলাম। কিন্তু সুখী পরিবার সংগঠনের পথে দাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইল। অর্থাৎ যে-আদর্শ গঠনের জন্য আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এরূপ প্রবল, কিন্তু দাসের পারিবারিক অবস্থায় তাহা কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, সুতরাং সেই অভাবের অবস্থায় জীবন-গতি কি-ভাবে কোন্ আকারে পরিণত হইল তাহার প্রথম চিত্র দাসের আত্মকথায় অঙ্কিত হইয়াছে। শেষের অংশ বলিতে প্রথমে সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু আত্মকথার পূর্ণতার জন্য অন্ত বিবরণে তাহা বর্ণিত হইল। অবশিষ্টও পরিশিষ্টে বলিলাম।

ভগিনী ত্রৈলোক্যর জীবনে একদিকে তাহার কর্ম্মমূলক চঞ্চলতা এবং সংসারাশক্তি, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ভাব-ভক্তির অভাব, এ-সমস্ত কথা তাহার অবস্থা বর্ণনার ভিতর হইতে স্বভাবত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমার ধর্ম্মপথে সর্ব্বপ্রথমে এই একমাত্র সহোদরাই আমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া একদিকে যেমন সাংসারিকভাবে মায়া-মমতার দিক দিয়া অনেক কিছু করিয়াছে, কিন্তু ত্রৈলোক্যর দ্বারা আমি কোনোদিন পারিবারিক জীবনে শান্তিলাভ করিতে পারি নাই।

তারপর আমার বিকলাঙ্গী পত্নীর কথা—তিনি বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া দাসের পাপ-দুর্ব্বলতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন দাসের অনুতপ্ত জীবন ঈশ্বরাভিমুখী হইল তখন তিনি আনন্দে নীরবে ধর্ম্মপত্নীর মতোই প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি শক্তিহীনা এবং তাঁহার আয়ুষ্কাল অল্প হওয়ায় দাসের পারিবারিক জীবন গঠনে সহায়তা করিতে পারিলেন না। তাই বুঝি বিদায়ের পূর্ব্বে কি-এক অস্পষ্ট কাতরতা জানাইয়াছিলেন!

চুণীবাবুর সংস্রব ছাড়িয়া আবার সেই প্রাণের মুক্ত গতি পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। মুক্তপ্রাণে ভগবানের মহিমার কথা প্রচার করিতে অদম্য উৎসাহ আসিল। বন্ধুগণের নিকট দিন রাত ঘুরিয়া "তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য্য যাহা সাধিব; শেষ হ'য়ে গেলে, তুলে নিয়ো কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব ?" এইআদর্শ আবার প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

এই সময় বাল্যবন্ধু হরিবিহারী সেনের যোড়াসাঁকোর

টেলার সপে গিয়া বসা একটি নিয়মিত দৈনিক কার্য্য হইল। কিছুদিনের মধ্যে হরিবিহারীর মনের গতি ভালো দিকে চলিতে লাগিল। একদিকে কু-অভ্যাস ত্যাগ, তার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা-প্রার্থনায় যোগ দেওয়া এবং সৎ-সঙ্গের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমার সাংসারিক অভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া আমাকেও তাহার দোকানের কাজে—হিসাব পত্র এবং তহবিল (ক্যাস) রক্ষার ভার দিল। কিন্তু একবৎসর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকিয়া দেখিলাম, বার বার আত্মসংযমের চেষ্টা করিয়াও প্রবৃত্তির সংগ্রামে সে পরাস্ত হইল। অতঃপর তাহার দোকানের কাজ ত্যাগ করিলাম।

এক্ষণে পরিশিষ্টের মধ্যে প্রধান বক্তব্য আমার পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহের কথা। অশান্তচিত্ত একমাত্র ভগ্নীর উপর নির্ভর করিয়া পারিবারিক শান্তিলাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। বিনয় যথাসময়ে ভাত না পাইয়া প্রায়ই অভুক্তাবস্থায় স্কুলে যাইত। অথচ সহসা কোনো উপায়ান্তরের সন্ধান পাইতেছিলাম না। এইরূপ অবস্থায় যখন আন্তরিক একটা বিশেষ অভাব বোধ জাগিতেছিল, ঠিক সেইসময় এখন যিনি আমার গৃহিণী তাঁহাকে আমি সহসা কলিকাতায় প্রাপ্ত হইলাম।

ইনি বিধবা অবস্থায় বারাশাত মহকুমার অন্তর্গত পল্লীগ্রামে অভিভাবক অভাবে আত্ম-রক্ষায় এবং যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান স্বত্ত্বেও অন্নেরব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া একটি প্রবীণা আত্মীয়ার আকর্ষণে কলিকাতায় আসেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে তাহার সংসর্গ আর ইঁহার ভালো লাগিতেছিল না। ঠিক সেই সময়

ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গে ইঁহার দেখা এবং আলাপ হয়। তারপর ইনি আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম রাজলক্ষ্মী। তখন ইঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল।

অভাবের অবস্থায় সহসা শরণাগতরূপে পাইয়া আমি অতর্কিতভাবেই ইঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইঁহার কোলে তখন একটি দুইবৎসরের—আর একটি ৫।৬ বৎসরের কন্যা শ্বশুরবাড়ি ছিল। এখন তাহারা জীবিত নাই।

তারপর অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত জীবনের ভার গ্রহণ করা আবশ্যক হইল, কিন্তু তাহাতে ত্রৈলোক্যর মত না থাকায় আবার এক পরীক্ষায় পাড়িলাম।

এই অবস্থায় আমার সেই পূর্ব্ব হিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণাপন্ন এবং সৎপরামর্শ-প্রার্থী হইয়া সমস্ত বিষয়টি তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। এবং আমি রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া পত্নীর সম্মান দিতে প্রস্তুত আছি জানিয়া, সেবাব্রত মহাশয় এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি প্রথমত রাজলক্ষ্মীকে তাঁহার বিধবা-আশ্রমে কিছুদিন রাখিয়া আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর এই সাধুপুরুষের মধ্যবর্ত্তীতায় কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রাহ্ম-বন্ধুর উপস্থিতিতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়া ব্রাহ্ম-পদ্ধতি এবং ৩ আইন অনুসারে আমরা ১৩০৬ সালের শ্রাবণমাসে বিবাহিত জীবনে পবিত্র সম্বন্ধযুক্ত হইলাম। এজন্য শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা চির ঋণী হইয়াছি।

বিনয়ের পড়া শেষ হইবার পর উপেন্দ্র ও বিধবা ভ্রাতৃ-

বধূদ্বয়ের সহিত গোবরডাঙ্গার বাড়ি বিভাগ করিয়া প্রায় দুই বৎসর আমরা বাটীতে বাস করি। এই সময় সেই ছোট মেয়েটি মারা যায়। বিনয় কলিকাতায় থাকিয়া কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করে। আমরা একাদিক্রমে অধিক দিন দেশে থাকিয়া শেষে ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়ি। তজ্জন্য সরলকে বিনয়ের নিকট রাখিয়া আমরা বালেশ্বরে যাই, এবং তথায় দেড় বৎসর থাকিয়া আবার দেশে আসি।

ইতিমধ্যে বিনয় এবং বালক সরলকুমার যখন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া সামাজিক এবং ধর্ম্মভাবে আমাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইল, তখন শেষ জীবন বালেশ্বরেই কাটাইবার মতো অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তখনও আবার প্রাণে দেশের কথা জাগিল। ফলত সকল অবস্থায় সকল সঙ্কল্প অতিক্রম করিয়া সেই একই আকর্ষণে দাসের জীবন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ এক প্রবল শক্তি সকল বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

জন্মভূমির সেবা দাসের জীবনের নিয়তি তাহা ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার সে-ব্রতরক্ষা হইত না যদি তাহা ঈশ্বর-প্রীতির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হইত।

আমি আমার জন্মভূমি—দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু সে কল্যাণ মঙ্গলের প্রকৃত সফলতা একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাস-ভক্তির উপর নির্ভর করে। দাসের আত্মকথায় সেইকথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার প্রিয় দেশবাসী বন্ধুগণ যেন তাহার সাক্ষ্য দান করেন। এখনো এইটুকু কামনা দাসের প্রাণে জাগিতেছে।

বর্ণানুক্রমিক নামের সূচী

(বিষয় সূচী ও চিত্র সূচীর অতিরিক্ত)